

জাতিভেদ ।

শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার, জলচল ও স্পর্শদোষ বিচার,
চতুর্ধর্গ-বিভাগ, দেবীপূজার জীববলি, প্রেগাবতার
শ্রীগৌরান্দ, বিদেশী বর্জ্জন, বিধবাব নির্জলা
একাদশী, স্বাধীনতার বাণী, কোরবাণি বা
আত্মবলি, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, স্বরাজে
কাবাবাস প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য-বিদ্যাভূষণ

প্রণীত ও প্রকাশিত

সিবাঙ্গগঞ্জ

লেপ্টেণ্ট কর্নেল

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্., ডি, আই, এম্. এম্.
মহোদয় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত ।

(পরিবর্তিত ও পৰিবৰ্দ্ধিত তৃতীয় সংস্কৰণ)

কলিকাতা ।

২নং বেথুন রো, ভারতমিহির বস্ত্রে,
শ্রীমকেশ্বর ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ।

১৩৩১

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য ২\৩ কাপড়ে বাঁধাই ২।০

উৎসর্গ।

বহুশত বৎসরের সামাজিক পেষণের ফলে
যাহারা সামাজিক ও আধ্যাত্মিক
সর্বপ্রকার অধিকার হইতে
চিরবঞ্চিত,

সমাজের সর্বস্ব হইয়াও যাহারা হেয়, অবজ্ঞাত,

নিম্নশ্রেণী বলিয়া অভিহিত,

ভগবানের দীন-প্রতিমূর্তি-স্বরূপ

সেই কোটি কোটি ভ্রাতৃবর্গের

শ্রীকরকমনে

আমার

বহু সাধনার

“জাতিভেদ”

অর্পিত হইল।

প্রস্কার।



ভূমিকা ।

আজ বেশী দিনের কথা নয়, আগাদের দেশের মধ্যে খ্যাতনামা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ একজন ভদ্রলোকের গৃহে গিয়াছিলাম । তথায় সমাজ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল । সমাজে গণ্যমান্য, দেশে আদৃত জনকয়েক বাঙ্গালী ভদ্রলোক তথায় উপস্থিত ছিলেন । প্রসঙ্গে যে সকল হিন্দু সম্প্রদায় সমাজ মধ্যে নানা কারণে পশ্চাৎ পতিত অবস্থায় আছে তাহীদেরই সম্বন্ধে কথা হইতেছিল । কথায় কথায় নবশাখ শ্রেণীর কথা উঠিল । একজন বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “নবশাখ কাহাদের বলে ?” প্রশ্নকারী আগাদের সমাজের একজন অলঙ্কারস্বরূপ । বিদ্যায় অর্থে পদমর্যাদায় বাঙ্গালী সমাজের একজন শ্রদ্ধেয় নেতা । তিনি চিরকালই দেশের কাজ করিয়া আসিতেছেন, আর দেশের লোকের নিকট একজন বিশিষ্ট অগ্রণী বলিয়া পরিগণিত । তিনি প্রশ্ন করিলেন, নবশাখ কাহাদিগকে বলে ?

কথাটা হাসিবার উপযুক্ত নয় । প্রশ্ন শুনিয়া ছঃখিত হইবারও কিছুই নাই । এইরূপ প্রশ্ন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে—বিশেষ যঁাহারা কলিকাতায় থাকেন, কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় । আজ ত্রিশ বৎসর হইতে দেশ-মধ্যে যঁাহারা শিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দেশের কথা ভাবেন, সে বিষয়ে অজ্ঞানতা করেন, বিচার করেন, আন্দোলন করেন । যাহাতে দেশের মঙ্গল হয় নিজে চেষ্টা করেন, পরকে উপদেশ দান করেন, সকলকে লইয়া একত্রে কার্য্য করিবার পরামর্শ দেন । কিসে দেশের অবস্থা ভাল হইবে, কিসে দেশের উন্নতি হইবে, কি করিলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়, এই সব বিষয় লইয়া নিরন্তর চিন্তা করেন । তবে ইহার মধ্যে একটু কথা

আছে, ইঁহারা দেশ দেশ করেন অথচ দেশের লোক চিনেন না। দেশ-
হিতৈষিতা ইঁহাদের জীবনের মন্ত্র অথচ দেশের লোকের সঙ্গে ইঁহাদের
পরিচয় নাই। দেশের লোকদের সম্বন্ধে কথা হইলে ইঁহারা কিছুই বুঝেন না।
কাহারো প্রধানতঃ দেশের লোক, তাঁহারা কি করে, কি ভাবে, তাঁহাদের
বর্তমান অবস্থা, ভবিষ্যতের আশা, তাঁহাদের সুখ, তাঁহাদের দুঃখ, তাঁহাদের
উৎসব, তাঁহাদের বিপদ, তাঁহাদের গৃহ, তাঁহাদের সমাজ, তাঁহাদের ধর্ম,
তাঁহাদের নীতি, তাঁহাদের সংস্কার, তাঁহাদের চরিত্র,—এ সকল প্রশ্ন বর্তমান
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অজ্ঞাত প্রহেলিকা, এ সকল সম্বন্ধে দেশের
শিক্ষিত সম্প্রদায় কখন চিন্তাও করেন না। তদপেক্ষা আক্ষেপের বস্তু
এ সকল বিষয় যে চিন্তা করিবার উপযুক্ত তাহাও তাঁহাদের মনে হয় না।
অথচ দেশ দেশ করিয়া ইঁহারা ব্যাকুল, দেশের জন্ত ইঁহাদের বাস্তবিকই
প্রাণ কাঁদে, যাহাতে দেশের মঙ্গল হয় তাহাই ইঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

অনেক সময় অধ্যাপক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের সহিত দেশ
সম্বন্ধে কথা কহিয়া দেখিয়াছি, সকলেই একবাক্যে একমত প্রকাশ করেন।
সকলেই বলেন, আমাদের সমাজের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। যখন
কথাটা প্রথমে শুনি তখন মনে আশা হইয়াছিল। সমাজদেহে ব্যাধি আছে
এই কথা স্থির হইল। তাহা হইলে রোগের প্রতিকার সম্ভব। হয়ত,
পণ্ডিত মহাশয় নিদান ও লক্ষণ স্থির করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন।
লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁহারা বলেন, সমাজে যে উচ্ছুকতা হইয়াছে তাহাই সর্বাপেক্ষা
সাংঘাতিক লক্ষণ। তাঁহাদের মতে রঘুনন্দনের স্মৃতি হইতে ঘোঁড়িন লোকে
অস্বপথে গিয়াছে, সেই দিন হইতে আমাদের সর্বনাশ আশ্রয় হইয়াছে।
তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, যদি আগরা পুনরায় নব্য স্মৃতিমতে চলিতে পারি
তবেই আমাদের বাঁচিবার আশা আছে, নতুবা আমাদের ‘মরণং প্রবং’।
রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, দেশপর্যটন, বাণিজ্য,

শিল্প, বিজ্ঞান—এ সম্বন্ধে কোন বিষয়ের প্রশংসা তুলিলে তাঁহারা আশ্চর্য্য
 করেন। প্রশংসকারীও নিজেকে অপ্রস্তুত মনে করেন। এ সকল বিষয়
 লইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত আলাপ করা, আর কোনও অজ্ঞাত
 ভাষায় তাঁহাদিগকে প্রশংসা করা একই কথা। দেশের কথা পাড়িলে কিন্তু
 ইহারা নিশ্চিত সম্প্রদায়ের মত চুপ করিয়া থাকেন না। বাঙ্গালা দেশে
 ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বাস। এক শত জন হিন্দু বাঙ্গালীর মধ্যে ৬ জন ব্রাহ্মণ,
 আর বাকী ৯৪ জন শূদ্র। বৈদ্য ও ক্ষত্রিয় মহাশয়গণ বিরক্ত হইলে কি
 করিব? শাস্ত্রে যাহা লেখা আছে তাহাই বলিলাম। আগার কথায় প্রত্যয়
 নীতির একজন অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাঁহার নিকট হইতে
 জানিতে পারিবেন যে, আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত আর কেনি
 বর্ণ নাই। যেখানে এক শত লোকের মধ্যে ৯৪ জন শূদ্র বলিয়া অধ্যাপক
 মহাশয়দের ধারণা, সেখানে দেশের লোক প্রায় সকলকেই শূদ্র বলিয়া
 ধরিতে হইবে। তাহাদের সম্বন্ধে ভাবিবার বা কথা বলিবার কি আছে?
 “সেবা ধর্ম শূদ্রানাং”—এ কথা সকলেই জানেন। ইহারা স্বাভাবিক বৃত্তি
 পরিত্যাগ করিয়া অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে ইহাতেই সমাজে বিশৃঙ্খলা
 ঘটিতেছে, সমাজে বিপ্লব ঘটিয়াছে—ইহাই সকল অনর্থের মূল। এই রোগেই
 আমরা মরিতেছি। এই নিমিত্তই আমরা লোপ পাইব।

কেহ যেন না মন্তব্য করেন, আমি শ্লেষ করিয়া এ কথা লিখিতেছি। যে
 ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের কথা বলিতেছি, সমাজের অবস্থা দেখিয়া তাহাদের
 মনে বাস্তবিকই দুঃখ হইয়াছে। তাহাতে কৃত্রিমতা কপটতা কিছুই নাই।
 যাহাতে সমাজের উপকার হয় তাহার জন্য তাঁহারা প্রকৃতই ব্যাকুল। মূর্খতা
 মনে, অকপট চিত্তে যাহা বিশ্বাস করেন তাহাই বলেন। তাঁহাদের সংস্কার
 শিক্ষা, জ্ঞান এইরূপ। ব্রাহ্মণ ব্যতিরিক্ত বাঙ্গালা দেশবাসী সকল হিন্দুই
 শূদ্র ও তাহাদিগের ধর্ম শূদ্রের ধর্ম। এইরূপ নির্ধারণ কিম্বা এইরূপ

আচরণ যে নীতিবিকদ্ধ, অশ্রায় ও অনুচিত, এইরূপ করিলে যে অধর্ম হয়, তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন না। আমার বিশ্বাস, মনে এই প্রকার ভাব আসিলে তাঁহারা এইরূপ ব্যবহার করিতেন না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত দেশের লোকের পরিচয় নাই, ব্রাহ্মণের সহিত পরিচয় আছে, দেব ও দাসে যে পরিচয় সেই পরিচয়।

আজ পঞ্চাশ বৎসর হইল আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে (United States) যে গৃহযুদ্ধ (Civil war) হয় তাহার কথা সকলেই অবগত আছেন। যুদ্ধটির প্রধান কারণ অনেক জানেন। আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব হইতে ইউরোপীয়গণ আফ্রিকাদেশবাসী কাক্রিদিগকে ধরিয়া লইয়া যাইত। তাহাদিগকে লইয়া ক্ষেত্রে এবং খনিতে কাজ করাইয়া লইত। গরু বাছুর যেমন কেনাবেচা হয়, তাহাদিগকে সেইরূপ কেনাবেচা করিত। দক্ষিণ যুক্তপ্রদেশে—জর্জিয়া, কেরোলিনা, ভার্জিনিয়া এই সকল স্থানে তামাক ও ধাতুক্ষেত্রে এই ক্রীতদাসেরা প্রধানতঃ কাজ করিত। আমেরিকা-বাসীদিগের মনে ক্রমে জ্ঞান হইল যে এই দাস-প্রথা, মানুষকে গরু ঘোড়ার ছায় দাস করিয়া কাজ করান অশ্রায় ও অনুচিত। এইরূপ করিলে অধর্ম হয়। ক্রমে এই ধারণা লোকের মনে এতদূর বদ্ধমূল হইল যে, তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল যুক্তপ্রদেশে আর দাস থাকিবে না। সকলেই—কি কাক্রি, কি শ্বেতাঙ্গ—সমভাবে স্বাধীনতা উপভোগ করিবে। অপর দিকে যাহাদের এই ব্যবসারে লাভ হইত তাহারা যোর আশঙ্কি তুলিল। যুক্তপ্রদেশে এই কথার আন্দোলন করিতে লাগিল, দেশে দুই দল হইল। একদল দাসত্ব উঠাইতে কৃতসঙ্কল্প, অপর দল এই প্রথা রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পরিশেষে দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। চারি বৎসর কাল এই যুদ্ধ চলে। তখন যুক্তপ্রদেশে তিন শত বিশ লক্ষ লোকের বাস। তাহার মধ্যে ৪০ লক্ষ লোক এক বা অপর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে। পরে যে পক্ষ দাসত্ব উঠাইবার

জ্ঞাত সঙ্কল্প করিয়াছিল তাহাদেরই জয় হয়। সেই দিন আমেরিকার সকল দাসই মুক্তি পায়। কথাটা একটু ভাবিবার উপযুক্ত। কতকগুলি কাক্সি ক্রীত-দাসের দাসত্ব বিমোচন করিবার জ্ঞাত ৪০ লক্ষ আমেরিকাবাসী খেতাব পুরুষ চারি বৎসর ধরিয়া অনবরত পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করে। পৃথিবীতে এমন ভীষণ গৃহবিবাদ পূর্বে কখনও হয় নাই। উভয় পক্ষে বহু লোক হত ও আহত হয়। প্রায় এমন গৃহ ছিল না, যাহার একজন বা দুইজন লোক এ যুদ্ধে যোগদান করে নাই। যুদ্ধের কারণ কি, না জনকতক ক্রীত-দাস কাক্সির দ্বংস বিমোচন। তাহার তলে আর এক গূঢ়তর কারণ ছিল। দাসত্ব-প্রথা নীতি-বিগর্হিত, মানুষের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া তাহাকে দাস করা অধর্মের কার্য—পাপের কার্য। প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার—তথাপি এ অধর্ম, এ অত্যাচার, এ পাপ দেশ হইতে দূর করিতেই হইবে। এই কারণে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়।

আমাদিগের নিকট এইরূপ আখ্যান অলীক বলিয়া মনে হয়। যে ভাবে আমরা আরব্য উপন্যাস পড়ি, সে ভাবে এই সব ইতিহাস পাঠ করি। ঘটনাগুলি যে কল্পনা প্রসূত নয় তাহা বুঝি। তবে কেমন করিয়া যে এই সব ঘটনা সম্ভব হয়, গোটা কতক কাক্সির স্বাধীনতার জ্ঞাত যে প্রাণ দিব, তাহা সহজে বুঝিতে পারি না। ইহা বোধ হয়—সাধারণের মত।

এখন আমাদের দেশে লোক কয়েকের মনে উদয় হইতেছে যে, আমাদের মধ্যেও এইরূপ অত্যাচার, অনিচার, অধর্ম আছে। কেন দেশের লোককে দাস বলি, কি কারণে তাহাদিগকে ঘৃণা করি, কি দোষে তাহাদিগকে লাঞ্ছনা করি, অপমান করি, নির্যাতন করি এই সব প্রশ্ন ক্রমে ক্রমে লোকের মনে উদয় হইতেছে। যাহারা এই সব বিষয়ের আলোচনা করেন তাহাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস জন্মিতেছে যে, আমাদের দেশে যে প্রচলিত দাসত্ব-প্রথা আছে, তাহা অত্যাচার ও অনিচিত। মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করা—

পণ্ড অপেক্ষা ঘৃণা করা, অধর্ম ও মহাপাপ। ইহা ধর্ম ও নীতিবিরুদ্ধ। মানুষের প্রতি মানুষের এইরূপ আচরণ হওয়া উচিত নয়।

এই পুস্তকখানির লেখক শ্রীযুক্ত দিগন্তনারায়ণ ভট্টাচার্য্য একজন এই শ্রেণীর লোক। এ দাসপ্রথা কতদিন আমাদের দেশে প্রবর্তিত হইল, কিসে ইহার উৎপত্তি, কেন ইহা স্থায়ী হইয়াছে, কি ইহার ফল—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে তিনি গভীর চিন্তা করিয়াছেন। তাঁহার মনে লাগিয়াছে যে, এই প্রথা অজ্ঞায় ও দুর্নীতিমূলক। ইহা কখনও ধর্ম্মানু-মোদিত হইতে পারে না। ইহার স্থিতি ধর্ম্মবিরুদ্ধ। ইহার পরিণাম হিন্দুজাতির ধ্বংস। গ্রন্থকার কেবলমাত্র মনের আবেগে পুস্তকখানি রচনা করেন নাই। ধীর ও সংযতভাবে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বাহা বলিয়াছেন তাহার জন্ত প্রমাণ দিয়াছেন। ছুই এক স্থানে মনের আবেগ সংবরণ করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহার নিন্দার কথা নয়। পুস্তকখানি লিখিয়া গ্রন্থকার দেশের উপকার করিয়াছেন। এই সময় এইরূপ গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন। ইহাতে পড়িবার, শিখিবার ও ভাবিবার অনেক সামগ্রী আছে। গ্রন্থকারের সহিত সকলে যে একমত হইবেন তাহা বোধ হয় গ্রন্থকারও আশা করেন না ; তাহার প্রয়োজনও নাই। বর্তমান সময়ে সমাজ সংস্কারের অপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন আর নাই। এই প্রশ্নের গীমাংসার দেরি থাকিতে পারে, কিন্তু আজি হউক, কালি হউক, গীমাংসা করিতেই হইবে। যাহাদের এ বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে তাঁহারা এই পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য পাইবেন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।

নিবেদন ।

শ্বেতাটি কোটি শূদ্র-ভাতৃগণের প্রাণের ঐকান্তিক আশীর্বাদ লইয়া জাতিভেদ প্রকাশিত হইল। কেহ বা ইহাকে কুসুম মাল্যে সযত্নে করিবেন, কেহ বা পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিবেন। সাধারণ পাঠক ইহাতে ঋষি নামধেয় কতিপয় পুরুষের প্রতি স্মৃতিও আক্রমণ দেখিয়া নিহরিয়া উঠিবেন—আর যাহারা আপনাদিগকে বর্তমান হিন্দু সমাজের রক্ষক বলিয়া মনে কবেন—তাহারা এই পুস্তকে প্রচলিত সমাজবিধি ও সমাজ-নেতা ব্রাহ্মণের প্রতি ভীষণ আঘাত দর্শনে বিচলিত হইয়া উঠিবেন এবং গ্রন্থকারকে উন্মাদগামী সমাজ-দানব বিংশ শতাব্দীর কালাপাহাড়রূপে অভিহিত করিয়া তৎপ্রতি অজস্র অভিসম্পাত বর্ষণ করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উন্মাদের দ্বারা সমাজে যথেষ্ট পরিবর্তনের তাণ্ডব নৃত্য সৃষ্টি করিবার জন্য এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে কি না সন্দেহ নাই। সহৃদয় বিজ্ঞ পাঠক তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। প্রকৃত ঋষি ও ব্রাহ্মণকে গালি দেওয়া হইয়াছে এরূপ অভিযোগ লেখকের স্বক্ষে কেহই চাপাইতে পারিবেন না। এই পুস্তকে এক পংক্তিও ঋষি এবং ব্রাহ্মণ কলঙ্কে কলঙ্কিত হয় নাই। প্রাথমিক হিন্দু সমাজের শতকরা চুরানব্বই জন সমস্তানকে “শূদ্র” “দাস” আখ্যায় আখ্যাত, মানবের প্রাণপ্রদ চিরন্তন পরম অধিকার ধর্মচর্চা ইহাতে বঞ্চিত, উপেক্ষিত, উপহসিত ও পশুজীবন যাপন করিতে দেখিয়া প্রাণে যে ক্ষোভ এবং বেদনাব দারুণ জ্বালা অনুভব করিয়াছি, কেননা কম্পিত বক্ষে, অক্ষয় অনভ্যস্ত লেখনীতে “হিজি বিজি” ভাষায় উহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। বাল্যকাল হইতে সমাজপতি মহাশয়গণের মুখে এবং শ্লোকমালায় শুনিয়া আসিলেও বিশ্বাস

করিতে পারি নাই—ভারতের কোটি কোটি মানব-সন্তান চিরকালের তরে ভগবান্ কর্তৃক অভিশপ্ত ও পতিত। গুরুজনের বাক্য ও ব্যবহারে সায় দিয়াছি সত্য, কিন্তু অন্তর তাহাতে সাড়া দেয় নাই, প্রাণ তাহা মানিতে চাহে নাই। মানবের পথনির্দেশক মোক্ষদায়ক ধর্মশাস্ত্র অসাম্যের প্রচারক এবং অশ্রুয়াশূলক—তাহা মানবকে সরল ও মুক্তভাবে ধর্মদান না করিয়া বিবিধ উপায়ে পাকে প্রকারে ধর্ম হইতে বঞ্চিত করিতেই তৎপর—বিবেক ইহা কিছুতেই অনুমোদন করে নাই। তাই বিক্ষুব্ধ ও ব্যথিত প্রাণে ‘শূদ্র’ খ্যাত কোটি কোটি মানব সন্তানের কলঙ্কের যথার্থতা নিরূপণ করিবার জন্ত শাস্ত্রালোচনার—শাস্ত্রের মূলদেশ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তহ্মার ফলে আবাল্যের সাধনায় যে সত্যের সন্ধান পাইয়াছি, তাহাই প্রাণপ্রিয় শূদ্র ভ্রাতৃগণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। তিরস্কার পুরস্কারের দিকে দৃকপাত করি নাই।

আমার ঐকান্তিক নিবেদন, হিন্দুজাতির এই শোচনীয় অধঃপতনকালে স্মৃধী সমাজ এই পুস্তক ধীরভাবে আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন। সমাজের এই গুমুসু দশায় একরূপ গ্রন্থের প্রচার উচিত কি না সে বিচারের ভারও পাঠকগণের উপর। এই পুস্তক হিন্দুজাতির এই আসন্নকালে বিষক্রিয়া করিবে, কি মৃতসঞ্জীবনীর ন্যায় জীবনপ্রদ কল্যাণজনক হইবে তাহা শ্রীভগবানই জানেন। কেহ বলিতেছেন, একরূপ অসার জঘন্য পুস্তক অগ্নির মুখে অথবা আবর্জ্ঞনাসূত্রে নিক্ষেপ করা কর্তব্য; আবার অনেকের মত একরূপ গ্রন্থ প্রচারে হিন্দুসমাজ মরণ-মুখ হইতে জীবনলাভের দিকে অগ্রসর হইবে। এই আশা ও নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ইঙ্গুর উৎপত্তি। জানি না ইহার ফল কিরূপ দাঁড়াইবে। তবে সমাজের কল্যাণ কামনা করিয়াই এ পুস্তক লিখিয়াছি; সমাজের মঙ্গলোদ্দেশ্যেই ইহার প্রচার। কর্মে আমাদিগের অধিকার—ফলে নহে। প্রভুর মঙ্গলময় ইচ্ছাই পূর্ণ

হইবে। লোকের প্রশংসা নিন্দা বা গালাগালির মূল্য কতটুকু? কৃতকার্য হই বিলক্ষণ, না হই তাহাতেও ক্ষতি নাই।

কপটতায় হিন্দুসমাজ জর্জরিত। এখন আর লজ্জা করিয়া নীরবে বসিয়া থাকিবার সময় নাই। সত্যের মন্দাকিনী-জলে ইহার আপাদমস্তক বিধৌত করার প্রয়োজন। এরূপ পুস্তক প্রচারে যে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা পলে পলে, লেখক তাহা অবগত আছে। খৃষ্টের ক্রুশ, লুথরের প্রাণাহতি, নিত্যানন্দের নিগ্রহ—তা ছাড়া মহাত্মা রামমোহন, কেশবচন্দ্র, ক্রিষ্ণাসাগর, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দের প্রতি কঠোর অত্যাচারের কথা লেখকের মানসক্ষেত্রে সদা জাগরুক। জানি সংস্কারকের পথ কুসুমসমাকীর্ণ নহে—ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। এ পথে পলে পলে বিিন্ন বিপদ,—নির্যাতন লাঞ্ছনা পদে পদে। তবে এই অবিচার অত্যাচার, অত্যাচার ও যথেষ্টাচারের যুগে কোটি কোটি পতিত উপেক্ষিত অবজ্ঞাত,—শ্রীভগবানের স্নেহের সন্তান—শুদ্ধ ভ্রাতৃগণের প্রতি যে একবিন্দু সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইলাম—তাহাদের পক্ষ হইতে যে আজ ছ'টি কথা বলিতে পারিলাম—ভবিষ্যৎ-নির্যাতন-কল্পনার মধ্যে তাহা মনে করিয়া আমার বুক আশা ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছে। আমার মত অকিঞ্চনের এই সামান্য পুস্তক পাঠ করিয়া আমার বহু ভাই ভগিনীর হৃদয়ে নীরবে অজ্ঞাতে আমার নিমিত্ত যে কল্যাণ-গন্ধ উচ্চানিত হইবে তাহাই আমার সাধনা, তাহাতেই আমার তৃপ্তি।

হিন্দুসমাজের যাহা কিছু গৌরব—ঐশ্বর্য সম্পত্তি ধন রত্ন গণি গণিক্য ছিল, সে সুমুদয়ই নানাপ্রকারে অপহৃত হইয়াছে। অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে তাহাও কপটতা, স্বার্থপরতা, নীচ আর্ঘ্যামী-রূপ তরুর অপহরণে উদ্যত। লেখক চোর তাড়াইতে বা দণ্ড দিতে অক্ষম, তবে কুকুররূপে উচ্চ চীৎকার ধ্বনিতে নিদ্রিত গৃহস্থকে জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র।

ইহা ভিন্ন অন্য কোন নীচ উদ্দেশ্য নাই। তীব্র যাতনার প্রতিকার চেষ্টা আরম্ভ হয়। সামান্য ক্ষতের চিকিৎসার জন্য কেহ চিকিৎসক ডাকে না। পাপে তাপে অত্যাচার অবিচারে বিধাতাপ্রদত্ত শ্রায়দণ্ডে হিন্দুসমাজ-দেহ ক্ষত বিক্ষত; ক্ষত সামান্য বলিয়া কেহ গ্রাহ্য করিতেছেন না। তবে এই ক্ষতে শক্ত আঘাত লাগিলে বা একথণ্ড তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করিলে তখন সকলে ইহার বিষয় একটু চিন্তা করিতে অগ্রসর হইবেন— এই আশা ও ভরসায় বহুস্থল স্মৃতিত্ব বাক্যদণ্ড গ্রহণ করিয়াছি। সামান্য আঘাতে এই জড়পিণ্ডপ্রায় সমাজ-চক্ষু মেলিবে না মনে করিয়া আঘাতের উপর তীব্র আঘাত দিয়াছি। বিশ্বাস, তীব্র যত্নগায় যদি প্রতিকারের জন্য একলে সচেষ্ট হন।

আশা করি এই পুস্তক প্রচার হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজপতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণের মধ্য হইতে ইহার বহু প্রতিবাদ পুস্তক বাহির হইবে এবং হিন্দুসমাজের জুববস্থার প্রতিকারকল্পে বহু আলোচনা ও আন্দোলন অনুষ্ঠিত হইবে। বঙ্গে বহু সমাজতত্ত্বজ্ঞ মনীষী পুরুষ আছেন; এবম্প্রকারের পুস্তক রচনার ভার তাঁহাদিগের হস্তে পড়াই সম্ভব ছিল। * * * অশিক্ষিত শূদ্র ভ্রাতৃগণের হৃদয়ে জাতিভেদ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি স্থূল ধারণা জন্মাইয়া দিবার জন্য যথাসম্ভব সরল ভাষায়, কোন কোন স্থলে কথার ভাষায় এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ এ পুস্তক পাঠ করিবেন বা ধীরভাবে আলোচনা করিবেন, এরূপ আশা করা স্পর্ধার কথা। আমার শ্রায়, অযোগ্যের পক্ষে এরূপ বিস্তৃত গ্রন্থরচনার ও সম্বলানে পদে পদে ভুল ভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নহে—বরং বিশেষ সম্ভব। বিশেষতঃ সমাজতত্ত্বরূপ ছত্র বিষয়ে। আমি স্বাধীন চিন্তা ও আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া পথ বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। যোগ্য ব্যক্তি অগ্রসর হউন। বঙ্গভাষার শোভাবর্দ্ধন উদ্দেশ্যে অথবা বঙ্গীয় সাহিত্য

সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিবার দুরাশা লইয়া এ পুস্তক লিখিত হয় নাই। এই পুস্তক পাঠে একজন পাঠকের মনেও যদি ধ্বংসোন্মুখ সমাজের কল্যাণ-কামনা জাগিয়া উঠে, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এই পুস্তক প্রণয়নে “হিন্দু পত্রিকা”র প্রকাশিত অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, মহোদয় লিখিত “জাতিভেদ” প্রবন্ধ হইতে আমি প্রভূত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। বস্তুতঃ তাঁহার প্রবন্ধই এই পুস্তকের আরম্ভ ও ভিত্তি। এতদ্বিন্ন স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, মহোদয় প্রদত্ত “জাতিভেদ” নামক বক্তৃতা, লর্নেটশ্যান্ট কর্ণেল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত “ধ্বংসোন্মুখ জাতি”—“হিন্দু পত্রিকা” প্রভৃতি এবং অত্যাশ্চর্য্য বহুতর পত্রিকা, পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতেও যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি। “সংহিতাদির” অনুবাদ অংশ, পণ্ডিত-প্রবর পূজনীয় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত “বঙ্গবাসী কার্যালয়” হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী হইতে গ্রহণ করিয়াছি। তজ্জন্তু আমি ইহাদের সকলের নিকট চির কৃতজ্ঞ এবং বলিতে কি, এই সমস্ত পুস্তকের সাহায্য না পাইলে “জাতিভেদ” প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ। অনমিতি * * * * *

পোঃ সিরাজগঞ্জ
কাওয়াকোপা শ্রীশ্রীবংশীবদন
কালচাঁদের শ্রীঅঙ্গন।
জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন ।

মুদ্রণ ব্যয় বহনে অসমর্থতা হেতু প্রায় এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত ‘জাতিভেদ’ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও উহা পুনর্মুদ্রিত করিতে পারি নাই। পরম করুণাময় শ্রীহরির ভূপার করুণায় পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত কলেবরে সম্প্রতি উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই নাটক নভেল ও উপন্যাস প্লাবিত দেশে জাতিভেদেব গ্রাম সমাজতন্ত্র বিষয়ক নীতিমূলক যে দ্বিতীয়বার মুদ্রণের প্রয়োজন হইবে, ইহা কখনও মনে করিতে পারি নাই। ভগবৎ রূপায়, জাতিভেদ সাহিত্যে ও সমাজে আশ্রীত আদৃত হইয়াছে। ইহার প্রচারে সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে,— ভুবজাত শ্রেণীর মর্ম্মস্থল হইতে বিপুল আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। এত অধিক আবেগভরা ও হৃদয়োচ্ছাসপূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি যাহা একত্র করিলে ছোটখাট একখানা মহাভারত হইতে পারে।

বলা বাহুল্য ঐ সঙ্গে জনকয়েক স্বয়ং নির্বাচিত, জাতিকুল বিদ্যাভিমানী সমাজপতি—‘ও (গ্রন্থকার) মুখ, উন্মাদ, ব্রাহ্ম,—ছোট লোকদের নিকট প্রচুর টাকা খাইয়া বই লিখিতেছে, প্রভৃতি তিরস্কার বাক্য পুরস্কৃত ও গাঞ্জদাহ নিবারণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের এই কটুক্তি, তিরস্কার ও ভৎসনা আমি “গুরুগণজন, চন্দন, অঙ্গভুষা” করিয়া—আশীষকুসুমজ্ঞানে সাদরে শিরে বহন করিয়াই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছি।

মক্ষিকার গ্রাম যাহারা সত্যত পরদোষানুসন্ধানে তৎপর এবং যাহারা আলাচ্য বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ভাষার দোষ অনুসন্ধান, শ্লোকের অনুস্বর বিসর্গের শুদ্ধাশুদ্ধি বিচারে, কুটার্ণ নিরূপণে শক্তি ক্ষয় করিয়া মরিতেছেন—তাঁহাদিগকে আমার কিছুই বলিবার নাই,—আমির গ্রন্থাবলী তাঁহাদের ন্যায় হৃদয়হীন, স্বজাতি ও স্বদেশদ্রোহী, সবজাতী, ‘অহং সর্ব্বস্ব’, ‘হাস্বেড়াদের জন্ত লিখিত হয় নাই। ইতি বৈশাখ ১৩২৫

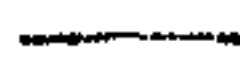
তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন ।

বৎসরাধিক কাল ‘জাতিভেদ’ দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও অর্থাভাবে তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিতে পারি নাই । সম্প্রতি ১৬০০ ঘোল শত টাকা ঋণ করিয়া জাতিভেদাদি (শূদ্রেব বেদাধিকার, জলচল ও চতুর্কর্ণ বিভাগ প্রভৃতি) গ্রন্থ চতুষ্ঠয় পরিবর্দ্ধিত আকারে তৃতীয় ও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল ।

পাঠকগণের প্রতি আমার নিবেদন—আমার গ্রন্থাবলী যাহাদের প্রাণে লাগিবে এবং পাঠে যাহাদিগেব হৃদয়ে নব আশা উদ্দীপনা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সুরতরঙ্গিণী প্রবাহিত করিবে, তাঁহারা শুধু মিথ্যা স্তুতি, বাহ্যিক ভক্তি ও মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া যাহাতে আপন আপন সমাজে, আত্মীয় স্বজনে ও বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার হইয়া গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও ঋণমুক্তির সহায়তা হয় তৎপক্ষে যত্নবান্ হইবেন ।

এই সংস্করণে পূর্ব পূর্ব সংস্করণের ‘সৃষ্টিতত্ত্বে বিভিন্ন মত’ বিষয়ক ষষ্ঠ অধ্যায় অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত এবং দশম ও ত্রয়োদশ অধ্যায় নব সংযোজিত হইল । দশম অধ্যায়টী সুবিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বি, এ, কবিভূষণ প্রণীত ‘পৃথ্বীরাজ মহাকাব্য’ হইতে সংকলিত হইয়াছে । এজন্য গ্রন্থকারের নিকট হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি ।

● অগ্রের উদ্ধৃত অংশের—শাস্ত্র ও শ্লোক নির্দেশে, দ্রুত সম্পাদন ও প্রফ পরিদর্শনের ত্রুটি বশতঃ এবারও অনেক ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গেল । সুধীগণ এসব অনিবার্য ত্রুটি নিজগুণে গার্জনা করিয়া লইবেন । পববর্তী সংস্করণে সমুদয় দোষ ঐথা সাধ্য সংশোধন করা হইবে । ইতি ২৫শে কার্তিক ১৩৩১ ।



সূচীপত্র ।

বিষয়	পত্রাঙ্ক
অবতরণিকা ...	১—১২
প্রথম অধ্যায়—আর্য্যজাতি ও জন্মগত জাতিভেদ	১৩—৩০
দ্বিতীয় অধ্যায়—গুণকর্ম্মগত জাতিভেদ	৩১—৫৫
তৃতীয় অধ্যায়—গুণকর্ম্মগত জাতিভেদের কতিপয় উদাহরণ	৫৬—৬৭
চতুর্থ অধ্যায়—বিবাহ ...	৬৮—৭৮
পঞ্চম অধ্যায়—আহার ...	৭৯—৮৮
ষষ্ঠ অধ্যায়—জাতিভেদ উৎপত্তির কারণ ...	৮৯—১১২
সপ্তম অধ্যায়—সঙ্কর বর্ণ ...	১১৩—১৩৪
অষ্টম অধ্যায়—শূদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার ...	১৩৫—১৬৫
নবম অধ্যায়—নিম্নশ্রেণী ...	১৬৬—২০০
দশম অধ্যায়—জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা ...	২০১—২৩৫
একাদশ অধ্যায়—নিপীড়িতের নিদ্রাভঙ্গ ...	২৩৬—২৫১
দ্বাদশ অধ্যায়—পরিণাম ও প্রতিকার ...	২৫২—২৬২
ত্রয়োদশ অধ্যায়—জলচল ও অস্পৃশ্যতা বর্জন ...	২৬৩—২৮৫
চতুর্দশ অধ্যায়—সমাজপতি ব্রাহ্মণের প্রতি সিবেদন	২৮৬—৩৫৯

অবতরণিকা ।

এই সেই পবিত্রভূমি, যথায় সহস্র সহস্র ঋষি তটিনীতট মুখবিত্ত করিয়া
সামবেদের প্রাণস্পর্শী সঙ্গীতপ্রবাহে হিংস্র পশুপক্ষী পর্য্যন্ত আকুল করিয়া
তুলিতেন ; এই সেই প্রাচীন ভূমি, যে স্থানে হিমালয়-তুষার-শুভ্র-কিবিট-
প্রবাহিনী জাহ্নবী-যমুনা, গোদাবরী-সব্বস্বতী, ব্রহ্মপুত্র-সিন্ধু, কাবেরী-নর্মদা
প্রভৃতি পুণ্যসলিলা স্রোতস্বিনীকুল, কুলকুলনাদে পূর্বপুরুষগণের
কীর্তিগাথা গাইয়া গাইয়া এখনও অবিবাম গতিতে সমুদ্রাভিমুখে গমন
করিতেছে ; এই সেই দেশ, যেখানে মাক্কাতা-হরিচন্দ্র, দিলীপ-রঘু,
নিমি-শিবি, শ্রীরাম-যুধিষ্ঠির প্রভৃতি প্রজাবংশল নরপতিগণ পুত্রনির্কীর্শে
প্রকৃতিপুজকে জালনপালন ও শাসনসংরক্ষণ করিয়া ধরা হইতে অপসৃত
হইয়াছেন ; যেখানে কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন-জামদগ্ন্য, পৃথু-ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণ
অজেয় বাহুবল ধরাতলে বিশ্বয় উৎপাদন করিয়াছিলেন ; যেখানে ভ্রাতৃ-
স্নেহে অনুরোধিত হইয়া কনিষ্ঠ সহোদব বিষয়সুখ পবিত্যাগ এবং জটাবন্ধল
পরিধানপূর্বক দণ্ডীবশে চতুর্দশ বৎসর নিবিড় অরণ্যে জীবন যাপন
করাই জীবনের সর্বার্থ মনে করিতেন ; ভ্রাতৃস্নেহে বক্ষে শেখাঘাত পর্য্যন্ত
স্মিতমুখে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না ; যে স্থানে পিতৃদত্যপালনের
নিমিত্ত জ্যেষ্ঠপুত্র যৌবরাজ্যে অভিষেকের পরিবর্তে গহনারণ্যে গমন
করিয়াছিলেন, যেখানে রাজনন্দিনী রাজবধূগণ রাজ্যপবিত্রষ্ট স্বামীসহিত
অনাগিনী কুঁড়ালিনী বেশে কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর অরণ্যপথে ক্ষতবিক্ষতদৈতে
রক্তাক্তচরণে পরিভ্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না ; যে দেশের নরপতি
সমাগরা ধরিয়া দান করিয়া দুঃখিণীর জন্ত স্ত্রীপুত্র বিক্রয় ও এমন কি
নিজকে চণ্ডালকরে, বিক্রীত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই ; যে দেশের

নরপতি এবং অধিবাসিগণ অতিথি সৎকারের, শরণাগতের জীবনরক্ষার নিমিত্ত নিজের মাংস প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সম্ভানের মাংস দান করিয়াছেন, যে দেশের নারীগণ পতিনিন্দায় সতীত্ব রক্ষার জন্য অবলীলাক্রমে দেহত্যাগ ও জলস্ত অগ্নিকুণ্ডে জীবন আহুতি দান করিয়াছেন, যে দেশের ঋষিগণ কাঞ্চনে কাচে, মণিতে লোষ্ট্রে, বিষধরে হারে, বিষ্ঠায় চন্দনে সমজ্ঞান করিতেন, সেই সব ধর্মবীর কর্মবীর সত্যবীর দানবীর সমদর্শী বিশ্বপ্রাণ আর্য্যজ্ঞপতির চির আদরের মাতৃভূমি, সমাগরা ধরিত্রীর বরেণ্য ভারতবর্ষের কি শাচনীয় পরিণাম ! যে দেশে সর্বপ্রথম সামগান উচ্চারিত হইয়াছিল, যে দেশে সর্বপ্রথম মহাসাম্যবাদের বিজয়-দ্বন্দ্বুভি-ধ্বনি উত্থিত হইয়া দিগ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব যে দেশের মনীষি-বৃন্দের মস্তিষ্কে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল, “সর্বং ব্রহ্মময়ং” ধ্বনি যে দেশে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, যে দেশের ঋষিগণ “সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন” করিয়া ভগবানের অনন্ত জগৎ সমক্ষে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, জীব ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে, ব্রহ্ম ব্যতীত এ জগতে অন্য কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র আকাশ পাতাল পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম সর্বস্থানে সর্বজীবে ব্রহ্মদর্শন ব্যতীত মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই,—যে দেশের তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ এই মহাসত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই দেশ—সেই মহাসাম্যবাদের উৎপত্তিস্থান পুণ্যভূমি আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষে, বর্তমান সময়ে, “ভেদের” ভীষণ বৈষম্যবাদ আলোচনার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে । যে ঋষিগণ জীবমাত্রকে সচ্চিদানন্দ-সাগরের তরঙ্গরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, প্রাণীমাত্রকে সূর্য্য স্বরূপ পরম ব্রহ্মের রশ্মিরূপে প্রচার করিয়াছেন—সেই দেশে আজকাল মহাভেদ বুদ্ধির রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । যে আর্য্যগণের ভক্তিপ্রবণহৃদয় জলস্থলে, অনল-অনিলে সর্বত্রই বিশ্বময় প্রভু ভগবান্

শ্রীহরির মঙ্গলময় মূর্তি সন্দর্শন করিতেন ; ব্যাঘ্র ভল্লুক সিংহ শাদ্দুগকে
 যাঁহারা পদাপলাশনেত্র নারায়ণের বিভূতিজ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া
 যাইতেন, যাঁহারা বিশ্বের প্রতি বস্তুতে, বিশ্বনাথ ভগবানের চিৎ শক্তির
 অপূর্ব মাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া তন্ময়ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন ; যে
 আর্য্যঋষিগণের বিশ্বপ্রেমিকতার মনোমোহিনী শক্তিতে পবিত্র মূনি-কাননে
 ব্যাঘ্র হরিণ, ভেক সর্প, মুষিক মার্জ্জার পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ ভুলিয়া আনন্দে
 বিহার করিত, যাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রাণী-হিতরত-বিশাল হৃদয় মানবজাতির
 যাবতীয় দুঃখ দৈন্ত শোকতাপ যুচাইবার জন্য সর্ব্বদা প্রতিকার কল্পে
 নিয়োজিত থাকিত, সেই পবিত্র হৃদয়-রক্তে পরিবদ্ধিত আমরা, কি পাপ
 সন্ধীর্ণতা লইয়াই না লিপ্ত রহিয়াছি ? যে দেশে এমন সব মহান্ ভাব প্রচারিত
 হইয়াছিল, সেই দেশে কিনা জাতিভেদতর্ক উপস্থিত । বেদান্তকেশরী গভীর
 গর্জ্জনে বলিতেছেন “এক মহান্ গুণাতীত পরমেশ্বর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড
 পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন । তিনিই একমাত্র অনন্ত । মহাসমুদ্রে জলচর
 জীবের ছায় অথবা মহাকাশে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির ছায় এ জগৎ
 তাঁহাতে মগ্ন হইয়া আছে । ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব
 নাই । সমস্তই ব্রহ্মময় । জড়বুদ্ধি মানব ভ্রমবশতঃ তাঁহাতে উপাধি
 আরোপ করিয়া স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করিতেছেন । অজ্ঞানতাবশতঃই জীবকে
 ব্রহ্ম হইতে পৃথক করিতেছে । এমন প্রাণপ্রদ মৃত সঞ্জীবন-মন্ত্র ত্যাগ
 করিয়া কেন আমরা এদিকে, ওদিক ছুটাছুটি করিয়া থাকি । প্রাণি
 বিগর্হিত মতবাদে কেন আমরা আত্মহারা হইয়া অক্ষয়ের ছায় কুপথে বিপথে
 পদচালনা করিতেছি । জাতি আবার কি ? জাতি বলিতে আমরা বুঝি
 একমাত্র মানবজাতি । এই মানবজাতির জন্য সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালে
 অবতারকুল, ঋষিগণ ও ঋষিপ্রতিম মহাপুরুষগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ
 হইয়া নামাবিধ তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন । সেইগুলিই

মানবজাতির চিন্তনীয় বিষয়—আলোচনার যোগ্য এবং ভাবিবার সামগ্রী । নেশন (Nation) বলিতে যেরূপ জাতি বুঝায়, তাহা এ হতভাগ্য দেশ হইতে বহুদিন লুপ্ত হইয়াছে, আর কাষ্ট (Caste) বলিতে যে জাতি বুঝায়, তাহাই এ হতভাগ্যদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে । নেশন (Nation) বলিতে আমাদের একটাও নাই; কিন্তু কাষ্ট (Caste) বলিতে আছে ছত্রিশটি বা ততোধিক । হায় ভারতের কৰ্মভোগ ! হিন্দুজাতি বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা আর আমরা নহি । হিন্দু বা আর্য্যজাতি অনেকদিন লোকসত্তর গমন করিয়াছেন, এখন যাহা আছে তাহা তাঁহাদের কঙ্কালবশেষ মাত্র । হিন্দুজাতি অপেক্ষা হিন্দু সম্প্রদায় বলাই বর্তমানে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় । স্মরণ্য যে জাতির একটা জাতীয়ত্বই নাই, তাহার আবার ভেদাভেদ কি ? হিন্দু-সম্প্রদায়ের জাতিভেদকে বর্ণবিভাগ বা সম্প্রদায়-বিভাগ আখ্যা দেওয়াই যেন সঙ্গত বলিয়া মনে হয় । জাতিভেদ বলিতে যাহা বুঝা যায়, সাম্প্রদায়িক বা বর্ণবিভাগ বলিতে ঠিক তাহাই বুঝা যায় না । এই সম্প্রদায়বিভাগ ভূমণ্ডলের সর্বদেশে সর্ব সময়ে বিদ্যমান ছিল, আছে ও থাকিবে । যেমন অভিজাত সম্প্রদায়, শ্রমজীবী সম্প্রদায়, ধনী সম্প্রদায় প্রভৃতি সভ্যদেশে আজকাল নানা সম্প্রদায়ের কথা আলোচিত হইয়া থাকে । এক্ষেত্রে অভিজাতজাতি শ্রমজীবী জাতি বা ধনিজাতি বলা ঠিক নহে । কেননা আজ যে শ্রমজীবী—চেঁচা ও সাধনা দ্বারা কাল সে অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু আমাদের দেশেও কি সেইরূপ জাতিভেদ বিদ্যমান ? আজ যে শূদ্র কালি সে ব্রাহ্মণ হইয়া যাইতে পারে ? না, তাহা নহে, এ জাতিভেদের গ্রন্থি সেরূপ নিখিল নহে । প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতিভেদের ইহাই রহস্য, ইহাই পার্থক্য । অনেকে ভ্রমবশতঃ উভয় দেশের জাতিভেদকে একই স্থানে আসন প্রদান করিয়া থাকেন ।

বিশ্বপতির রাজ্যে ভেদবুদ্ধি নাই—ভেদবুদ্ধি অজ্ঞানের নরক-স্থদয়ে । সেই পরম পিতার রাজ্যে সকলেই সমান, সকলেই এক মানব-পরিবারভূক্ত । তিনি কাহাকেও ছোট, কাহাকেও বড় করিয়া সৃষ্টি করেন নাই—তিনি ধনীর জন্য এক চন্দ্র, আর দীনহীন পদদলিত গরিবের জন্য আর এক চন্দ্র প্রদান করেন নাই । ব্রাহ্মণের জন্য এক সূর্য্য আর চণ্ডালের জন্য অন্য সূর্য্য পাঠাইয়া দেন নাই । এক নীল বিরাট চন্দ্রাতপতলে এক বিরাট মানবপরিবার, একই সূর্য্যের উত্তাপ ও একই পবনের নিশ্বাস গ্রহণ করিতেছে, এক চন্দ্রের শীতলকরস্পর্শে সকলেই সমভাবে চিত্তবিনোদন করিতেছে । তাঁহার রাজ্যে কোন বৈষম্য নাই—কোনও ভেদাভেদ নাই । ছোট বড় অভিমান তাঁহার পবিত্র রাজ্যে স্থান পায় না । সমস্ত পুত্র কন্যা তাঁহার সমান স্নেহের অধিকারী । ব্রাহ্মণকে তিনি ভালবাসেন আর চণ্ডালকে তিনি দূর দূর করিয়া তাঁহার স্নেহের ক্রোড় হইতে তাড়াইয়া দেন অথবা ধনবানের অতুল ঐশ্বর্য্য আছে বলিয়া ভগবান তাঁহারই কথা শুনিয়া থাকেন, আর সহায়সম্পদবিহীন গরীবের পাষাণভেদী আর্তনাদেও একটু আশ্বাসের অমৃতধারা ঢালিয়া দিতে কৃপণতা করিয়া থাকেন, ইহা হইতে পারে না । তবে অনেকে এস্থলে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন, তিনি কাহাকেও পশু কাহাকেও পক্ষী, কাহাকেও কীট, কাহাকেও পতঙ্গ এবং কাহাকেও নরনারী অথবা খজা স্ত্রী ছঃখী করিয়া কেন এ সংসারে পাঠাইলেন । তিনি না সমদর্শী । ইহার উত্তরে শাস্ত্রকার বলেন—শ্রীভগবান লীলাচ্ছলে বিভিন্ন আকারের জীবদেহ সৃষ্টিপূর্ব্বক তন্মধ্যে পরমাত্মরূপে অংশ কল্যায় অবস্থানকরতঃ তৎ তৎ দেহ দ্বারা স্বকীয় লীলারস ও এই “বৈচিত্র্যময়ী ধরিত্রীর মাধুর্য্য সম্ভোগ করিতেছেন । কেবলমাত্র রাজা রাজ্জড়া, মুনি ঋষি বা ইন্দ্রচন্দ্র দ্বারা যেমন কোন নাটক অভিনয় হইতে পারে না ; অভিনয়ের জন্য রাজা প্রজা, দেবতা মানব,

পুরুষ নারী, পাপী পুণ্যবান, ভক্ত ভগবান, অন্ধ খঞ্জ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সাজিবার প্রয়োজন হয়, এই বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের বিরাট অভিনয় ব্যাপারেও সেইরূপ বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন জাতির মানব এবং বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিবিশিষ্ট জীব জন্তু সৃষ্টির প্রয়োজন । শুধু একই জাতীয়,— একই সাজসজ্জায় সজ্জিত, একই আকার ও প্রকৃতিবিশিষ্ট মানবগণের দ্বারা কখন অভিনয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না । অভিনয়ে বৈচিত্র্যের একান্ত প্রয়োজন । তাই শ্রীবিশ্বেশ্বর ভগবানের বিরাট বিশ্বে রাজা প্রজা, ধনী দুরিদ্, নরনারী, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পশু পক্ষীর সমাবেশ প্রয়োজন । এখানে বশ ছোট, উচ্চ নীচ, উত্তম অধমের কোন প্রশ্ন নাই । ইহা অভিনয় মাত্র ।

বিধাতার রাজ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, কিন্তু বৈষম্য থাকা অসম্ভব । তিনি মানবকে বিভিন্ন বংশে পাঠাইয়া দিলেও স্বক্স দৃষ্টিতে আমরা ইহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি যে, তিনি সকলকেই সমান শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই । শিল্পীর হৃদয়ে যে শিল্পনৈপুণ্য আছে, ধনীর তাহা নাই, আবার ধনবানের যাহা আছে, শিল্পীর তাহা নাই । শ্রমজীবির শরীরে যে শ্রমশক্তি আছে তাহা হয়ত একজন শিক্ষকের নাই ; আবার শিক্ষকের যে বীশক্তি আছে শ্রমজীবির তাহা নাই । একজন বিশ্ববিখ্যাত বলিষ্ঠ পালোয়ানের যে শারীরিক শক্তি আছে একজন বিচারপতির তাহা নাই এবং বিচারপতির যে সূক্ষ্মদর্শিতা আছে ঐ বলীর তাহা নাই । একজন চর্মকারের বা একজন চিত্রকের যে কর্মশক্তি আছে সে শক্তি কি কোনও বড় বৈজ্ঞানিকের কি বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আছে ? তাহা নাই—আবার অন্য পক্ষেও ঐরূপ । “একজন কৃষক বা একজন মুটে রবিকর-উত্তপ্ত মধ্যাহ্ন-সময়ে যেরূপ কৃষিকার্য্য করিতে পারিবে বা ছুই মণ আড়াই মণের যে মোট বহিতে পারিবে, একজন

রসায়ন-তত্ত্ববিদ বা একজন দার্শনিক কি তাহা কখন পারিবে না ? না কখনই পারিবে না । সুতরাং আমরা বেশ দেখিতে পারিলাম সাংসারিক স্থূল দৃষ্টিতে আমরা বহু বিষমতা বা পার্থক্য দেখিলেও বিচারসিদ্ধ স্বজ্ঞা দৃষ্টিতে এক মহান সমতা বিদ্যমান । কাজেই বলিতে হইতেছে, ঈশ্বর সমান শক্তি দিয়া সকলকে এ সংসারে পাঠাইয়াছেন । ছোট বড় ভেদ করিবার আমাদের কি শক্তি বা অধিকার আছে ? ভগবান কি কোনও ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন “হে কলির ব্রাহ্মণগণ ! তোমাদিগকে শূজাপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ করিয়া, সমাজের সমাট করিয়া সংসারে পাঠাইলাম ; তোমরা যথা ইচ্ছা ছলে বলে কৌশলে, শাস্ত্রের বচন দিয়া, বেদের দোহাই দিয়া, শূত্রদের ধনরত্ন আত্মসাৎ কর, তাহাদের হৃদয়শোণিত মহাস্বখে মনের আনন্দে পান কর, তাহাদিগকে কোনও প্রকার জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইবে না, তাহারা অবিদ্যার অন্ধকারে ডুবিয়া মরুক—তাহারাই সমতান স্বরূপ নিত্য ঘূণাই । উহাদের দ্বারা জগতের কোন উপকার নাই—উহারা ধরিত্রীর ভারস্বরূপ । ‘যেন তেন প্রকারেন’ উহাদিগকে পদদণ্ডিত করিয়া ধরা হইতে অপসৃত কর । উহাদিগকে দাবাইয়া মার, উহাতে ছায়ের মর্যাদা কিছুমাত্র লভিত হইবে না । জগতের যাবতীয় অত্যাচার লাঞ্ছনা নির্যাতন উহাদিগের মস্তকোপরি বর্ষণ কর । যে পর্যন্ত একটা মাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরন্তর হইও না ।”

বাস্তবিক সমদর্শী পরমমঙ্গলময় শ্রীভগবান মানবজাতিকে ব্রাহ্মণ করিয়া বৈশ্ব শূত্ররূপে সংসার রঙ্গশালায় পাঠাইয়া দিয়াছেন কিনা সে বিচার আমরা পরে করিব ও হিন্দুশাস্ত্রকারগণ চতুর্কর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিরূপ কি লিখিয়াছেন তাহাও যথাক্রমে পরে লিপিবদ্ধ করিব । সংস্কৃত শ্লোক দেখিলেই দশাধরা আমাদের এ দুর্কল প্রাণহীন জাতির একটা যোগের অধো গণ্য হইয়াছে । আর তাহাদের দোহাই বা কি—বহুদিন ব্রাহ্মণগণের

কুপার অপেক্ষায় থাকিয়া, জ্ঞান বিদ্যায় জলাঞ্জলি দিয়া, তাহারা একরূপ মনুষ্যাকার পশুবৎ হইয়া গিয়াছিল। শুভক্ষণে ইংরেজ গবর্ণমেন্টের কুপায় অবাধ বিদ্যা প্রচারে দেশের নরনারীর তথাকথিত শূদ্রজাতির বিশুদ্ধ বদনমণ্ডলে হাসিরেখা দেখা গিয়াছে, মনুষ্যত্বের পুনরধিকার পাইবার আশা, তাহাদের বেদনা-বিক্ত হৃদয়কে সরস করিয়া তুলিয়াছে।

সাম্যবাদ সম্বন্ধে বহুলোকের বহুভ্রান্ত ধারণা আছে, আমরা এসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে চাই। শুধু বর্তমান যুগের দুই দশজন সমাজ বিপ্লবকারী নহে, যাবতীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ ও সর্বদেশের সর্বকালের অবতরিকুল দুই বাহু উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া জগৎ সমক্ষে পুনঃ পুনঃ এই সাম্যবাদ ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। এই মহাসাম্যবাদের প্রেম-মন্দাকিনী নীবে স্নান করিয়া জগতে কতজন স্ত্রী পুত্র পরিজন পরিত্যাগপূর্বক বৈরাগ্যাবলি স্কন্ধে লইয়া জগতের দ্বারে দ্বারে এই স্বর্গীয় বাণী অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে ঘোষণা করিয়াছেন, “আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব এক পিতার সন্তান”। এই স্বর্গীয় সুধা পান করিয়া এক সময়ে বৈদিক ঋষিগণ এই পৃথিবীতে সত্য যুগ আনয়ন করিয়াছিলেন। এই মহাসাম্যবাদের অমৃত আশ্বাদ পাইয়া একদিন ঈশা মুসা শঙ্কর বুদ্ধ মহাবীর রামানুজ প্রভৃতি যুগাচার্যগণ পৃথিবীতে কি এক স্বর্গের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। “ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ভীষণ বৈষম্যকে যখন ভারত দগ্ধ হইতেছিল—যখন নীচ জাতি সকল কুকুর শৃগালের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের পরিত্যক্ত হইয়াছিল, যখন সমাজের কঠিন শাসনে সমাজবন্ধন কেবল যজ্ঞগার কারণিস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, যখন শুষ্ক তार्কিকতায় স্নেহ প্রেম ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের কোমলতমবৃত্তি সকল বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময় মহাপ্রাণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেব স্বয়ং অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্য নীরস, সাম্যভাব-

বিহীন ও হৃদয়ের পরিপুষ্টিবিরহিত ছিল না। স্বদেশের শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল—তিনি সন্ন্যাসী হইলেন। তাঁহার প্রেম-সংকীর্ণনে জগৎ মুগ্ধ হইল। নিদাঘের রবিকিরণপ্রতাপ যুগ্মিকায় ঘেন বারিধারা পতিত হইল। সেই আচ্ছাদনে সেই প্রেমসংকীর্ণনে হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্মণ শূদ্র একই সাম্যক্ষেত্রে আগিয়া দণ্ডায়মান হইল। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সংকীর্ণন হইতে লাগিল—“আমরা সব এক পিতার সন্তান, আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব ‘ভাই বোন।’” ভারতে যত যত মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন সকলেই সাম্যবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কেহই জাতিভেদ মানিতেন না—অথবা ভগবান্ কর্তৃক—জাতিভেদ হইয়াছে ইহাও বিশ্বাস করিতেন না। কি ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক, কি আর্য্যসমাজ, কি খৃষ্টসমাজ, কি মুসলমান সমাজ, সর্ব সমাজের প্রচারকগণই জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন। দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদেও ঐ একই সাম্যভাব বিদ্যমান। অদ্বৈতবাদে সবই ব্রহ্ম স্মরণ্যং সকলেই সমান, ছোট ব্রহ্ম বা বড় ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ বা শূদ্রব্রহ্ম একপ শব্দ কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না।

ব্রহ্মে ছোট বড় লিঙ্গ বয়ঃ ভেদ নাই। সবই তিনি। এ মতের প্রধান প্রচারক ও আচার্য্য শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য। আর দ্বৈতবাদ বলিতেছেন আমরা সকলেই তাঁহার দাস, তাঁহার সন্তান, তাঁহার রূপাংশী, তাঁহার সেবক, তাঁহার অন্তর—স্মরণ্যং জাতিভেদ বা বড় ছোট ভাব কোথায়? এ মতের পরিপোষক কলিকলুষনাশন—শ্রীভগবানের প্রোণবতার শ্রীমৎ গৌরানন্দ দেব। রাজা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিগণ সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছেন ও জাতিভেদরূপ মহাবৈষম্যবাদ শাস্ত্র ও নীতিবিগর্হিত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামী, তৈলদ স্বামী

রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বারদীর যোগী লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকলেই বর্তমান জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন ।

ঐ যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বলিতেছেন—

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদ

পিতানৈব মে মাতা চ জন্ম

নবন্ধুর্ন মিত্রং গুরুনৈব শিষ্যং

শিচদানন্দ রূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ।

যদি বল ‘আমরা কলির দুর্বল জীব আমাদের পক্ষে অদ্বৈতানুভূতি অসম্ভব, দ্বৈতবাদই আমাদের পক্ষে প্রশস্ততর পথ । তাহাতেই বা আসে ‘যায় কি ? দ্বৈতবাদ বল, অদ্বৈতবাদ বল, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বল, বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ বল, সর্বত্রই সমদর্শন, খুঁজিয়া কোথাও ভেদবুদ্ধি পাইবেনা । দ্বৈতবাদেও একই ভাব, ভাষা পৃথক্গাত্র । আত্মপরিচয়দানচ্ছলে শঙ্কর বলিতেছেন :—

“মাতামে পার্শ্বতী দেবী পিতাদেবোমহেশ্বরঃ

বান্ধবাঃ শিবভক্ত্যামে ভবনং ভুবনত্রয়ম্ ॥”

দেবাদিদেব পরমেশ্বর আমার পিতা, “জগজ্জননী ভগবতী” ঐশীশক্তিই আমার মাতা, জীব মাত্রেই আমার পরিবার, ত্রিভুবন আমার গৃহ । “বসুধৈব কুটুম্বকম্” চরাচর বিশ্বই আমার পরিবার,—এই উদার উক্তি হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি ছত্রে দেদীপ্যমান । শ্বেতাস্বতরোপনিষৎ বলিতেছেন :—

“একো বশী সর্বভূতান্তরাঙ্গা

একং রূপং বহুধা যঃ কৰোতি ।

তমাস্থং যেহনুপশ্চন্তি ধীরাঃ

তেযাং সুখং শাস্বতং নেতরেষাম্ ॥

“একো বশী নিজ্জিন্নাণাং বহুনাং

এবং বীজং বহুধা যঃ করোতি ।

তমাত্মস্থং যেহনু পশ্যন্তি ধীরাঃ

তেষাংসুখং শাস্বতং নেতরেষাম্ ॥

ঐ যে ধ্যান-স্তুমিত-নেত্র মহাপ্রাণ প্রেমিক পুরুষের পবিত্র কণ্ঠ হইতে
বাহির হইতেছে :—

“ব্রহ্মৈকমেবাস্তি চ বেদ একো

ন জীব ভেদোহখিল বিশ্বমেকম্ ।

ধরাতলে তেন বিধোযিতেয়ং

প্রেমো মহাগীতিরনর্থানীতিঃ ।”

“এক ব্রহ্ম, এক বেদ,

জীবে জীবে নাহি ভেদ

নাহি উচ্চ নাহি নীচ, সবি একাকার ;

এ অমূল্য মহা নীতি

বিশ্ব প্রেম-মহা গীতি,

চৈতন্য প্রভাবে ভবে হইল প্রচার ।” (১)

সাঁহারা বলিতেন :—

“ব্রহ্ম হ’তে কীটপরাণ, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,

মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায় ।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথায় খুঁজিছ চৈতন্য

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে চৈতন্য ।” (২)

সেই দেশে এমন জঘন্য ভেদবুদ্ধির কি ভয়াবহ রাজত্ব !

জগতের ঐমন কোনও মহাপুরুষের নাম শুনি নাই যিনি মানব-জগতে
জাতিভেদ স্বীকার করিতেন বা জাতিভেদ বিধাতার সৃষ্টি একপ মত প্রকাশ

(১) শ্রী চারুকুমার কবিরত্ন প্রণীত “সুমঙ্গল সংস্কার” ।

(২) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত “বীরবাণী” ।

করিয়াছেন । সুতরাং আমাদের ধীরভাবে বিবেচনা করা উচিত, আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করিব । প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অপৌরুষেয় গ্রন্থ বেদ-বেদান্ত—বৈদিক জ্ঞানময় বপুঃ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ খাষি, শঙ্করস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়া তদীয় মতবাদ ও শিক্ষা দোহাই গ্রহণ করিব, অথবা ঋতিবিগর্হিত তন্নয় স্থানাভিযুক্ত ভীষণ বৈষম্যবাদপরিপূর্ণ পৌবহিত্যশক্তি সংরক্ষণে প্রাণপণে দোহাই সর্ব্বস্ব, ব্রাহ্মণ প্রাধাত্য স্থাপনে বন্ধপরিকর, পরন্তু শূদ্রশোণিত পিপাসু পরবর্ত্তী যুগের স্মৃতি ও সংহিতা এবং বর্ত্তমানকালের কতিপয় যজ্ঞশূত্র সম্বল, ব্রাহ্মণ্য-শক্তিবহীন বৈদিকক্রিয়াকলাপবর্জিত স্লেচ্ছান ও শূদ্রানপবিপুষ্ট উপাধিব্যাধিমণ্ডিত নামমাত্র ব্রাহ্মণ কতিপয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যুক্তিহীন অসার মতবাদই গ্রহণ করিব ইহাই হইতেছে বুঝিবার বিষয় । তত্ত্বজ্ঞ অনায়াসেই, স্মায কর্তব্য নিরূপণ কবিত্তে সমর্থ হইবেন । অন্ধ যে সেই ভ্রান্ত মতে মজিবে । দ্বাবিংশতি কোটী নরনারী-সমন্বিত বিরাট হিন্দু জাতির জীবন মরণ সমস্তা প্রত্যেক হিন্দু সম্ভানের সমক্ষে উপস্থিত । এ সময় জাতি হিংসা, জাতি গর্বে মগ্ন থাকিলে চলিবে না । ভারতের বড় দুর্দিন । সপ্ত শত বৎসরের পরাধীনতায় ভারতের প্রাণশক্তি বিগত প্রায় । এ সময় কাহারও আর নিশ্চিত্ত বসিয়া থাকা কর্তব্য নহে । ভাবতীয় হিন্দু মহাজাতি সংগঠনে— প্রত্যেক হিন্দু সম্ভানের হৃদয়-রুধির দান প্রয়োজন । কোন বড় কার্য্যই বড় ত্যাগ ব্যতীত সম্পন্ন হইবার নহে । আমরা ভারত জননীর স্মৃতি সম্ভান বর্গের উপর ধ্বংসোন্মুখ ভারতের গুরুভার অর্পণ করিয়া গ্রন্থ প্রতি পাদ্য পরবর্ত্তী বিষয়ের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইলাম । কুল-দেবতা বংশীবদন কালাটাদ এই অকৃতি অধম দাসের লেখনীকে সার্থক ও জয় মণ্ডিত করুন ।



জাতিভেদ ।

প্রথম অধ্যায় ।

আর্য্য হিন্দুজাতি ও জনগত জাতিভেদ ।

—ঃঃ—

আর্য্য হিন্দুজাতি ।

আর্য্য হিন্দুজাতির আদিম বাসস্থান কোথায় ছিল, তাহা যথার্থভাবে নির্ণয় করা ছুঁরাহ ব্যাপার, এ বিষয়ে বহু আণোচনা, বহু যুক্তিতর্ক বহু গবেষণামূলক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য ইউরোপীয় পণ্ডিত গণ্ডগোল মধ্যে কেহ কেহ, বাণ্টিক সাগরের তীরবর্তী দেশকেই আর্য্যজাতির আদিম নিবাস বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতদিগেরই এইরূপ অভিমত যে, মধ্য এশিয়াই আর্য্যজাতির আদিম নিবাস ভূমি। আর্য্যগণ মধ্য এশিয়া হইতেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভট্ট মোক্ষমূলর প্রমুখ পণ্ডিতগণী যে সকল যুক্তি সহায়ে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

“প্রথমতঃ, আর্য্যজাতির ছইটী প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি ভারতবর্ষাভিমুখে, অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্বদিকে এবং আর একটি

ইউরোপের অভিমুখে অর্থাৎ উত্তরপশ্চিম দিকে । এই দুইটী প্রবাহের সংযোগস্থল এসিয়া মহাদেশ ।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনতমকালের সভ্যদেশসমূহ এসিয়া খণ্ডেই অবস্থিত । আর্য্যভাষাসমূহের মধ্যে ঋগ্বেদের ভাষাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম । সুতরাং এসিয়া খণ্ডের মধ্যে এবং ঋগ্বেদের জন্মস্থান পাঞ্জাব প্রদেশ হইতে অনতিদূরে কোনও প্রদেশে আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান হওয়াই সম্ভব ।

তৃতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মধ্য এশিয়া হইতে বারবার অনেক পরাক্রান্তজাতি উদ্ভূত হইয়া ইউরোপ মহাদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে । খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর হুনজাতি ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোঙ্গল-জাতি তাহার উদাহরণস্থল । অতএব, প্রাচীনকালেও আর্য্যগণ মধ্য এশিয়া হইতে উদ্ভূত হইয়া ইউরোপ বিজয় করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় ।”

চতুর্থতঃ, যদি ইউরোপ বিশেষতঃ স্কাণ্ডেনেভিয়া হইতে আর্য্যজাতির উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে আর্য্যভাষা সমূহে সমুদ্র সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক সাধারণ শব্দ পাওয়া যাইত । এই সকল ভাষায় পণ্ডবিশেষের সাধারণ নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল ভাষায় সমুদ্র বা জলচর জীবের সাধারণ নাম পাওয়া যায় না ।” (১)

এই ত গেল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অস্তিমত । হিন্দু প্রাক্ততত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের কিন্তু অন্য মত । তাহারা বলেন, ভারতবর্ষেই কোন স্থানে আদিম আর্য্যগণ বাস করিতেন ।

তৎকালের সেই আদিম যুগে প্রাচীন ভাবতবর্ষে যাহারা অধিবাস করিত, তাহারা কুষ্যবর্ণ, অধর্ম্মশীল, নীচ, স্বেচ্ছভাষী, ছাগনাসাবিশিষ্ট এবং আমমাংসভোজী ছিল ।

(১) পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই ।

“They (the Aiyans) called their adversaries (the aboriginal tribes) “Dasyus” “Rakshas” &c. They are described as irreligious, impious, and lowest of the low ; they are also in some texts contemptuously called black-skinned. Thus, during the Rigvedic period, there were, if we may so express ourselves, two ‘colours’—the fair (Aryan) and the black (Dasyu or Dasa.)” (1)

অর্থাৎ আর্য্যগণ তাহাদিগের শত্রুদিগকে (আদিম অধিবাসীদিগকে) “দস্যু”, “রাক্ষস” প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করিত । তাহারা নীচ হইতে নীচ, ধর্ম্মবিহীন ও অধার্ম্মিক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । তাহারা কোন কোন স্থলে অবজ্ঞাতরে কৃষকায় বলিয়াও কথিত হইয়াছে । এইরূপে দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের সময়ে দুই জাতি ছিল—শ্বেতকায় বা (আর্য্য), এবং কৃষ্ণকায় (দস্যু অথবা দাস) ।

“The Dasyus sre contrasted with the Aryans and are represented as people of dark complexion who were unbelievers, i.e did not worship the gods of the Aryas and perform the sacrifices, but followed another law. The Aryan gods Indra and Agni are frequently praised for having driven away the black people, destroyed their strongholds and given their possessions to the Aryas.” (2)

অর্থাৎ দস্যুদিগকে আর্য্যজাতির সহিত তুলনা করিয়া তাহাদিগকে

(1) “Hindu Civilization under British Rule.” By Mr. P. N. Bose, B. Sc., F. G. S, M. R. A. S. &c., &c.

(2) “Social History of India,”—By Ramkrishna Gopal Bhandarkar, M. A., PH. D. C. I. E.

কৃষকায় জাতি বলা হইয়াছে । তাহাদিগের ধর্মো বিশ্বাস নাই অর্থাৎ আর্য্যগণের দেবতাগণকে তাহারা পূজা করিত না এবং তাহারা অন্য শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বলিদানক্রিয়া সম্পাদন করিত এইরূপভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে । কৃষকায়দিগকে বিতাড়িত করা, তাহাদের ছুর্গ সকল ধ্বংস করিয়া দিয়া আর্য্যদিগকে উহা অধিকার করিয়া দেওয়ার জন্য আর্য্যগণের দেবতা ইন্দ্র এবং অগ্নিকে বহুস্থলে প্রশংসা করা হইয়াছে ।

ঋগ্বেদের মন্ত্র পাঠ করিলে দক্ষ্য ও আর্য্য এই দুই শ্রেণীর লোকের সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । আর্য্যগণ গৌরবর্ণ সূন্দর নাসিকায়ুক্ত ও পিক্কাংসভোজী ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । এই সমুদয় আদিম আর্য্যগণ প্রথম প্রথম প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য দ্বারাই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন । কৃষিকার্য্য ইহাতেই কর্তব্য ধাত্তব্যমূলক আর্য্য নাম হইয়া থাকিবে । লাঙ্গল শকট প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের উপকরণ সমূহের নাম তাঁহাদিগের ভাষায় পাওয়া যায় । (১) শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, বলেন :—

“প্রকৃতির লীলাভূমি ভারতবর্ষের নগ্ন সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহারা মোহিত হইতেন । সেই সকল অভিনব প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ তাঁহাদিগের সরল কোমল হৃদয়মধ্যে এমন সূন্দর সুশোভন চিত্রগুলি অঙ্কিত করিত এবং এমন স্বাভাবিক ভাবের সঞ্চার করিত যে, তাহাতেই তাঁহাদিগের ‘কবিত্ব শক্তির উন্মেষ’ এবং ধর্ম্মপ্রণালী গঠিত হইয়াছিল । চন্দ্র, সূর্য্য

(১) কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয় এক মন্ত্রের বাক্যংশ এমন হইল :—“লাঙ্গলশাল যোজন কর ; যুগগুলি বিস্তারিত কর ; এই স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে বীজ বপন কর ; আর্য্যদিগের স্তবের সহিত আর্য্যদিগের অন্ত পরিপূর্ণ হউক ও শূনিগুলি মিকটবর্তী পক্ষ শস্ত্রে পতিত হউক ।”

পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গানুবাদ ঋগ্বেদ সংহিতা ।

মেঘ, বজ্র, উষা, সন্ধ্যা প্রভৃতি এ সকলেরই তাঁহরা উপাসনা করিতেন । তখন ধর্ম্মভাব নিতান্ত সরল ও অকপট ছিল—তখন পর্য্যন্ত যাগ যজ্ঞাদির আড়ম্বর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল না ।

“পূর্বেই বলিয়াছি সেই আদিম আর্য্যজাতির একদল দক্ষিণ এসিয়া অভিযুখে যাত্রা করিয়াছিলেন । সেই এসিয়া-যাত্রিক-আর্য্যেরা ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন । পাঞ্জাবকে তখন সপ্তসিন্ধু বলিত । সপ্তসিন্ধুদেশে আসিয়াও, সেই হিন্দু ও ইরানীজাতি এক সঙ্গেই ছিল । কিন্তু কালক্রমে ধর্ম্মাদি বিষয়ে বিবাদ হওয়ায় সেই একই জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল । “দেবোপাসক” হিন্দুরা পাঞ্জাবে রহিলেন । আর “অশ্বরোপাসক” ইরানীরা পারস্যে গমন করিলেন । এই দেবোপাসক হিন্দু আর্য্যই বেদে স্রষ্টা ।

ঔপনিবেশিক আর্য্য হিন্দুগণ সপ্তসিন্ধু দেশে উপনিবেশ স্থাপনের প্রথম যুগে ধর প্রবাহিত সিন্ধু তীরে বাস করিতেন । ক্রমে যতই ঔপনিবেশিক-গণের সংখ্যা অধিক হইতে লাগিল, তাঁহারা ততই নূতন নূতন স্থান অধিকার করতে লাগিলেন । এইরূপে সিন্ধু এবং তাহার পঞ্চশাখা তীরবর্তী প্রদেশ সমূহ আর্য্য হিন্দু কর্তৃক অধিকৃত হইয়া গেল । নবীন উৎসাহ, অসীম বিক্রম, অদম্য সাহস, অজেয় বাহুবল ও জাতীয় মুক্ত জীবনের অমূল্যপ মুক্ত স্বাধীনচিত্ত হইয়া আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ যুদ্ধে মনযোগী হইলেন । হিন্দুর দুর্জয় বাহুবলের নিকট অনার্য্য দস্যুদিগের বিক্রম টিকিতে পারিল না । আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের সকল দেশ জয় করিয়া গেলেন । অত্যাচার দস্যুগণ কেহ পলায়ন করিল কেহ বা দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল । (১)

(1) “Those who submitted were reduced to slavery and the rest were driven to the fastnesses of mountain ”

“Social History of India”—By R. G. Bhandarkar, M. A.

আর্য্যদিগের বিজয়পতাকা দেশ হইতে দেশান্তরে উড়ীন হইতে লাগিল । অনার্য্যগণ পদে পদে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল । যাহারা এই নূতন শত্রুর সম্মুখ হইতে কাননে, প্রান্তরে, দুর্গম গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিল, তাহারা স্বাধীনতা বিস্মৃত হইতে পারিল না । দলে দলে আসিয়া আর্য্যদের অধিকৃত গ্রাম, জনপদ প্রভৃতি আক্রমণ করিতে লাগিল । তাঁহাদিগের লাঞ্ছল, গো, গোবৎস প্রভৃতি অপহরণ করিতে লাগিল—আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন । হতঃ কখনও অন্ধতমসাচ্ছন্ন গভীররজনীতে একদল অনার্য্য দস্যু আসিয়া নিশ্চিন্ত, সুপ্ত আর্য্যদিগের গৃহাদি লুণ্ঠন করিয়া খাদ্যাদি যাহা পাইত লইয়া পলায়ন করিত ।

যে সকল বীরগণ পঞ্চনদস্থ সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সরস্বতী শতদ্রুর শ্রাঘলতীরে শান্তভাবে বসিয়া থাকিবার লোক নহেন । ভারতভূমির আদিম নিবাসীদিগের সহিত নিরন্তর অবিশ্রান্ত যুদ্ধ কলহ করিয়াও আর্য্যগণ ত্রিহৃত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মর্ষি (গাঙ্গ্য) প্রদেশ অধিকার করিয়া ফেলিলেন । যখন গাঙ্গ্য প্রদেশে অধিনিবেশের সূত্রপাত দেখা গেল, তখনই নানাস্থান হইতে দলে দলে আর্য্যগণ আসিয়া দোয়ার প্রদেশে বসতি করিতে লাগিলেন ।

আর্য্যদিগের মধ্যে তখন পর্য্যন্ত কোন প্রকার জাতিবিচার ছিল না । কিন্তু ‘আর্য্য’ ও ‘অনার্য্যের’ মধ্যে যে প্রভেদ, ‘আর্য্য’র ও ‘দস্যু’র মধ্যে যে পার্থক্য তাহা তখন ছিল—‘কুষা’ এবং ‘গৌরের’ ভিতর যে প্রভেদ তাহাও তখন ছিল ।” (১)

“In the very early times the system of castes did

(১) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি. এ, লিখিত “জাতিভেদ” প্রথম ভিন্দ পত্রিকা—২য় বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩০৯

not prevail, and it seems to have developed about the end of the Vedic period.” (1)

অতি প্রাচীনকালে জাতিভেদ প্রথা ছিল না এবং এইরূপ অনুমান হয় যে, বৈদিক যুগের শেষ সময়ে ইয়া গড়িয়া উঠিয়া প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয় ।

শ্রীযুক্ত আচার্য্য মহাশয় পুনরায় বলিতেছেন :—“কৃষি, যাজন, যুদ্ধাদি জীবিকাভেদজনক বর্ণ বিচার বংশানুক্রমে পুরোহিত বা রাজার প্রথা তখন ছিল না । শ্রামলগ্নস্তভরা প্রভূত ক্ষেত্রের অধিপতীগণ যেমন অসংখ্য ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন, আবার তেমনি বাহুবলে স্বগ্রাম আত্মজীবন ও অর্থ প্রভৃতি রক্ষাও করিতেন । যুদ্ধান্তে গৃহে ফিরিয়া তাহাই আবার সুন্দর ভাষায় মন্ত্র রচনা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিতেন । তখন দেবমূর্তিও ছিল না, দেবগৃহও ছিল না, পূজা বিধির নানাবিধ আড়ম্বরও ছিল না ।”

ঋগ্বেদ ও জাতিভেদ ।—“জগতের সমুদয় গ্রন্থের মধ্যে আদি গ্রন্থ বেদ—ঋগ্বেদ তন্মধ্যে আদিতম । এই ঋগ্বেদ সম্বন্ধে এই দুইটি কথা বলা আবশ্যক । এই ঋগ্বেদ কতকগুলি মন্ত্রের সমষ্টি । এই সকল মন্ত্রের অধিকাংশ এমন এমন সময়ে রচিত হইয়াছিল, যখন বর্ণ মালার সৃষ্টি হয় নাই এবং লিখিবার প্রথা প্রবর্তিত হয় নাই । তখন ঐ সকল মন্ত্র মুখে মুখে রচিত হইয়া মুখে মুখে শেখা হইত এবং মুখে মুখে বিচরণ করিত । লোকে ইহার মুখে, উহার মুখে, তাহার মুখে মন্ত্র গুলি সর্বদা শুনিত, কিন্তু কেহ কখনও তাহা লিখিত দেখে নাই । এই অল্প ঐ সকলের নাম ঋতি হইয়াছিল । তৎপরে বর্ণমালার সৃষ্টির পরে সময়ে

(1) Dr. R. G. Bhandarkar, Ph. D, on “Social Reform and the Programme of the Madras Hindu Social Reform Association.”

সময়ে এক একজন পণ্ডিত উদ্যোগী হইয়া স্মৃতি হইতে ও লোক মুখ হইতে সংগ্রহ পূর্বক বর্ণিত বিষয়ানুসারে তাহাদিগকে মণ্ডল, অধ্যায়, সূক্ত প্রভৃতিতে বিভাগ করিয়া গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিত বেদবাস নামে উক্ত হইয়াছেন। এই ঋগ্বেদের কোন একটী সূক্ত পাঠ করিতে গেলেই দেখিতে পাইবেন যে, সৰ্ব্বাণ্যেই অমুক দেবতা, অমুক ঋষি, অমুক ছন্দ প্রভৃতি নির্দেশ করা হইয়াছে ইহার তাৎপর্য্য এই, সংগ্রহ কর্তা সংগ্রহ করিবার সময় যে ঋষিকে যে মন্ত্রের রচয়িতা বলিয়া শুনিয়াছেন সেই মন্ত্রের অগ্রে সেই নাম নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

ঋগ্বেদের সূক্ত সংখ্যা মোট ১০২৮। “যে সূক্তের’ মধ্যে জাতিভেদের উৎপত্তির কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম পুরুষ সূক্ত। এই সূক্তটীতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবগণ এক আশ্চর্য্য প্রকৃতি-সম্পন্নপুরুষকে যজ্ঞে বলি দিয়াছিলেন। সেই পুরুষের দেহ হইতে সৃষ্টির তাবৎ পদার্থ উৎপন্ন হইল। নানা প্রকার পদার্থের সৃষ্টি বর্ণনা করিয়া অবশেষে বলিতেছেন—

তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সৰ্ব্বভূতঃ ঋচঃ সাগানি জজিরে। ছন্দাংসি জজিরে
তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত। তস্মাদক্ষা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদাতঃ।
গাবোহজজিরে তস্মাজ্জাতা অজাবয়। * * * * * “ব্রাহ্মণোশ্চ
মথমাসীৎ বাহু রাজন্তঃ কৃতঃ। উরু তদশ্চ যদৈশ্চঃ পদ্যোঃশৃঙ্গো অজায়ত।

অর্থ—“সেই সৰ্ব্বভূত যজ্ঞ হইতে ঋক সকল ও সাম সকল জন্ম গ্রহণ করিল। তাহা হইতে ছন্দ অর্থাৎ বেদ সকল ও যজুর্বেদ উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে অশ্ব সকল ও ছইপাটী দন্ত বিশিষ্ট অপর সকল প্রাণী এবং গো মেষ অজা প্রভৃতি উৎপন্ন হইল। * * * * *

* * * ইহার মুখই ব্রাহ্মণ হইল, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয় রূপে পরিণত



হইল ; বৈশ্ব যাহা দেখিতেছ, ইহাই তাহার উরু এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল ।” (১)

৩রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন,—“ঋগ্বেদের রচনা কালের অনেক পরে এই অংশ রচিত হইয়া ঋগ্বেদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই । ঋগ্বেদের অন্য কোন অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই । ব্যাকরণবিদ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ঋকের ভাষাও আধুনিক সংস্কৃত । উক্ত সূক্তটির ভাষা দেখিলেই মনে হয়, উহা আধুনিক সংস্কৃতের মত । ঋগ্বেদের অন্যান্য মন্ত্রগুলির ভাষা আধুনিক সংস্কৃতের মত নহে । তাহা অতিশয় কঠোর এবং তাহার ব্যাকরণও স্বতন্ত্র ; শুধু ব্যাকরণ বিভিন্ন নহে, ছন্দও আবার অন্তরূপ ।” এল্‌ফিনষ্টোন সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনার স্থানে লিখিত হইয়াছে,—“There can be little doubt, for instance, that the 90th hymn of the 10th Book is modern both in its character and its diction.” অন্তর্জও দেখিতে পাওয়া যায় “European critics are able to show that even this verse is of latter origin than the great mass of the hymns and that it contains modern words such as Sudra and Rajany”, which are not found again in the other hymns of the Rig-Veda. (Vide chips from a German workshop Vol. II) ফলতঃ মন্বাদিসংহিতাকারদিগের অভ্যুত্থানের এবং মহাভারতাদি লিখিত হইবার বহুপূর্বে এই সূক্তে রচিত হইয়াছিল, মহাভারত প্রভৃতিতে এবং মন্বাদি গ্রন্থে এই সূক্তের ছায়া পরিলক্ষিত হয় ।

লোকানাস্ত বিবৃদ্ধার্থং মুখবাহুরুপাদতঃ ।

ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্বং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ । মনু ১।১৩

(১) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ, এডমন্ট বক্তৃতা “প্রাকৃতিক” ।

অর্থাৎ “পৃথিব্যাদি লোক সকলের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর আপনার মুখ বাহু উরু ও পদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণ সৃষ্টি করিলেন । মহাভারতের শান্তিপর্বে ইহার ছায়া এইরূপ ভাবে পড়িয়াছে ।

পুরুরবা উবাচ । কুতশ্চিৎ ব্রাহ্মণো জাতো, বর্ণাশ্চাপি কুতজয়ঃ ।

কস্মাচ্চ ভবতি শ্রেষ্ঠস্তগ্নে ব্যাখ্যাতু মর্হসি ।

মাতরিশ্চোবাচ । ব্রাহ্মণোমুখতঃ সৃষ্টো ব্রাহ্মণো রাজসত্তম ।

বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্ট উরুভ্যাং বৈশ্য এব চ ।

বর্ণানাং পরিচর্যার্থং ত্রয়াণাং ভরতর্ষভ,

বর্ণচতুর্থঃ সমুতঃ পদ্ম্যাং শূদ্রো বিনির্মিতঃ ।

অতঃপর আমরা জনাগত জাতিভেদেব সমর্থনকৃতক তাবদীয় শ্লোক প্রদর্শন করিয়া পরে তাহার যথাযথ বিচারে প্রবৃত্ত হইব । জাতিভেদ জনাগত সন্দেহে, শ্রীমদ্ভাগবতেব দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ে আছে,— বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বমূর্ত্তি সহস্রশিরা পুরাণের মুখ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় তাঁহার ভুজ, বৈশ্য তাঁহার উরু এবং কৃষ্যবর্ণ শূদ্র তাঁহার পদ । পুনশ্চ একাদশ স্কন্ধে—সপ্তদশ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকেও আছে,—

বিপ্র ক্ষত্রিয়-বিটশূদ্র মুখবাহুরূপাদজাঃ ।

বৈরাজাৎ পুরুষজ্জাতা য আত্মচার লক্ষণাঃ ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।১১)

বিষ্ণুপুরাণে প্রথম অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ;—

ব্রাহ্মণা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রাশ্চ বিজসত্তম ।

পাদোরু বক্ষঃস্থলতো মুখতশ্চ সমুদ্গতা ॥

যজ্ঞনিষ্পত্তয়ে সূর্যমেতদ্ভ্রূয়া চকার বৈ ।

চতুর্কণ্যং মহাভাগং যজ্ঞসামনসুত্তমম্ ; (বিষ্ণুপুরাণ ১।৬)

পুরাণান্তরেও আছে,—সুখতো ব্রাহ্মণো যজ্ঞে বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ো বিরাট্ ।

উরুভ্যামুদ্বতে বৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদ্রোব্যজ্ঞায়ত ॥

মন্বাদি-সংহিতা শাক্ত ও পুরাণাদিতে যে বহুবিধ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় সে সমস্তই জগৎ রূপে সমাজের উচ্চ-নীচ স্তরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । এই ত গেল জাতিভেদ সম্বন্ধে শাক্তের দোহাই বা অনুকূল মত । এখন আমরা ইহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব । ঋগ্বেদে বর্ণ বিচার সম্বন্ধে স্থলতঃ কিছু বলা হইয়াছে ; কিন্তু বর্তমান বিষয়টির বিশদ আলোচনা আবশ্যিক । আমরা ইতঃপূর্বেই একবার বলিয়াছি যে, ঋগ্বেদের কেবলমাত্র একটী স্তোত্রের একটী ঋকে জাতিভেদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে, আলোচ্য স্তোত্রে বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে পুরুষ কল্পনায় যজ্ঞীয় পশুর স্বরূপ যজ্ঞীয় বহিতে পূজা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয় ।

যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞয়তমত ।

বসন্তো অশ্বাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধাঃ শরদ্ধবিঃ ।

তৎ যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন পুরুষং জাতমদ্রতঃ ।

তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা শচ ধায়শচযে ।

অর্থাৎ যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল, শরৎ হব্য হইল ।

যিনি সকলের আগে জানিয়াছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুরূপে সেই বহিতে পূজা দেওয়া হইল । দেবতারা, সাধ্যবর্গ এবং ঋগিগণ উহা দ্বারা যজ্ঞ করিলেন । এইরূপে সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশু কল্পনা করিয়া যে বলি দেওয়ার কথা আছে, সেই স্তোত্রে ঋগ্বেদের পুরুষ স্তোত্রের বর্ণ-ভেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । আমরা অনুবাদ সহ সেই স্থানটি উদ্ধৃত করিতেছি ।

যৎপুরুষঃ বদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্

মুখং কিমশ্চ কো বাহু কা উরু পাদা উচ্যেতে ।

অর্থাৎ পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল, কয়েক খণ্ড করা হইয়াছিল ।

উহার মুখ কি হইল, দুই হস্ত দুই উরু দুই চরণ কি হইল ।

উত্তরস্বরূপ বলা হইতেছে,—

ব্রাহ্মণোহশ্চ মুখমাসীদ্বাহু রাজশ্চ কৃতঃ ।

উরু তদশ্চ যদৈশ্চ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়ত ॥

(ঋগ্বেদ ১২।১০।১৯)

ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজশ্চ হইল, যাহা উরু ছিল, তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল ।

ইহাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বা জাতিভেদের মূল ভিত্তি । এই কথার উপরই প্রাচীন সমাজের জাতিভেদ নির্ভর করে । এখন এই সূক্তের আলোচনা করা যাউক । বলা বাহুল্য এই একটীমাত্র সূক্ত অবলম্বন করিয়া পরবর্তী সংহিতা ও পুরাণকারগণ তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে শ্লোক রচনা ও জাতিভেদ সমর্থন করিয়াছেন । এই বিরাট পুরুষের বলি সম্বন্ধে রমেশ বাবু বলেন,—“বিশ্বনিয়ন্তাকে বলিস্বরূপ অর্পণ করা অমুভবটী ঋগ্বেদের আর কোথাও ইহা পাওয়া যায় না । ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের অমুভব ।” মুয়ার সাহেবও বলেন—It was evidently produced at a period when the ceremonial of sacrifice was largely developed.....penetrated with a sense of the sanctity and efficacy of the rites, the priestly poet to whom we owe this hymn has thought it no profanity to represent the supreme Purush himself as forming the Victim.” (Muir's Sanskrit Texts—Vol—V.)

অর্থাৎ বলিপ্রথা অতিশয় বিস্তৃতি লাভ করিলেই বর্জমান কল্পনা সম্ভব

হয়, নতুবা নহে । এই বলি প্রথার আনুসঙ্গিক জিহ্বা-বলাপ সম্বন্ধে যাহার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আছে, যিনি এই প্রথার পবিত্রতা এবং সফলতা বিশ্বাস করিয়া থাকেন, শুধু সেইরূপ পুরোহিত কবিই কল্পনা করিতে পারেন যে, পরমপুরুষ পরমেশ্বরকেও বলি দেওয়া যাইতে পারে । অতঃপর পক্ষে এরূপ কল্পনা ধর্মবিগর্হিত ।

ঋগ্বেদ আর্য্য-জাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ ও সমগ্র জগতের আদি পুস্তক । এই আদি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই পরবর্তী লেখকগণ অশ্রান্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; সুতরাং আমাদের আলোচ্য বিষয় “জাতিভেদ” সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে সর্বপ্রথম এই ঋগ্বেদ অনুসন্ধান করাই বিধেয় । ৮রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন,—কি প্রকারে মানব-হৃদয়ে প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির নিরস্তা ঈশ্বরের জ্ঞান জন্মে ঋগ্বেদ তাহার প্রমাণ স্বরূপ । আর্য্যেরা পৃথিবীর নানাস্থানে যে সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহা প্রাচীনতম ঋগ্বেদে তাহার নিদর্শন রহিয়াছে । ঋগ্বেদে আধুনিক হিন্দু ধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা রহিয়াছে, অতি প্রাচীনকাল হইতে অধুনাতন সময় পর্য্যন্ত হিন্দু জাতির মানসিক ভাবের বৃত্তান্ত ঋগ্বেদ না পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় না । কেবল আধ্যাত্মিক কেন ঋগ্বেদ পাঠে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়ও অনেক জানিতে পারা যায় ।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সেই প্রাচীনতম আর্য্য হিন্দু-সমাজের অবস্থা জানিবার জন্য ঋগ্বেদই একমাত্র পথ । জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ের অস্তিত্ব ঋগ্বেদ হইতেই প্রামাণ্য । ঋগ্বেদে তৎকালিক সমাজের সকল কথাই বিশেষ ভাবে লিখিত রহিয়াছে । কেমন করিয়া ক্ষেত্রে লাঙ্গল দেওয়া হইত, কেমন করিয়া সোমরস প্রস্তুত হইত, কি উপায়ে যবাদি পেয়ণ কার্য্য সম্পন্ন হইত প্রভৃতি প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিছুটি পর্য্যন্ত যে ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়—জাতিভেদের কথাও নিশ্চয়ই সেই স্থানে থাকিবে কিন্তু ঋগ্বেদের

১০২ এবং শ্লোকসংখ্যা ১০৪০২ অথবা ১০৪২২ সেই ঋগ্বেদে জাতিভেদ সম্বন্ধে মাত্র একটি শ্লোকে অতি সামান্য কয়েকটি কথা লিখিত রহিয়াছে ।” (১)

“পাঁচ কি ছয় শত বৎসর ব্যাপিয়া এই মহাঋষি ঋগ্বেদের প্রণয়ন কার্য চলিয়াছিল । আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ইহাতে আর্যদিগের আচার, নীতি, ব্যবহার বিশ্বাস প্রভৃতির ভুরি ভুরি বর্ণনা আছে । আর্যদিগের গার্হস্থ্য নীতি, জীলোকদিগের অবস্থা, বিবাহ পদ্ধতি যজ্ঞাদি ধর্ম্মাচার, জ্যোতিষ, আর্যদিগের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, দাস্যদিগের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি সমস্তই বিশেষরূপে বর্ণিত রহিয়াছে । কিন্তু এই জাতিভেদের কথাই তেমন ভাবে লিখিত হয় নাই । ইহাও কি সম্ভব ? এই স্থলে শ্রীযুক্ত বমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে । তিনি বলিতেছেন,— “পরবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায় যে বর্ণ শব্দ জন্মগত জাতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদে আর্য ও অনার্যেব (গৌর ও কৃষ্ণেব) বিভিন্ন শারীরিক বর্ণ (রং) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ।” (২)

ভাষা ও শব্দ শাস্ত্রদ্বারা বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । এই ভাষাব সাহায্যেই ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণের সহিত আর্য জাতির সম্বন্ধ অনুমিত হইতেছে । ঋগ্বেদেব অন্যান্য শ্লোকের ভাষা ও প্রকৃতির সহিত তুলনা করিলে এই সাধাবণ ছন্দেই শ্লোকটীকে অনায়াসেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয় । প্রাচীন যুগে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ শব্দই এখন অপ্রচলিত । নিয়ে ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র উদ্ধৃত হইল । যাহারা শুধু আধুনিক সংস্কৃতে অভিজ্ঞ, তাহারা যে

(১) ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্ত দ্রষ্টব্য ।

(২) শ্রীরাধেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ লিখিত “জাতিভেদ” প্রবন্ধ ।

টীকাকারের সাহায্য ব্যতীত উক্ত মন্ত্রটির অর্থ গ্রহণে সম্যক্ কৃতকার্য হইবেন, একদা মনে হয় না ।

মন্ত্রটি এই,—

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্ত দেবমুদ্ভিজং ।

হোতারং রজ্জধাতমম্” । (ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তের সর্বপ্রথম ঋক)

বিশেষতঃ ঋগ্বেদ প্রণেতা যে একজন নহেন, তাহাব আর সন্দেহ নাই । ‘আমবা মৎস্ত পুরাণেও ৯১ জন বৈদিক ঋষির নামোল্লেখ দেখিতে পাই । ইহারাই ঋকসমূহ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ।’ (মৎস্তপুরাণ ১৩২ অধ্যায়)

ঋগ্বেদের মন্ত্র দশমণ্ডলে বিভক্ত । প্রথম ও দশম মণ্ডল ভিন্ন অপর আট মণ্ডল ৮ জন ঋষির রচিত । একজন ঋষি বলিতে বোধ হয় সেই ঋষিব বংশীয় ব্যক্তি অথবা তদনুসারী শিষ্য পরম্পরা বুঝিতে হইবে । দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রণেতা সৃৎসমিৎ । এই সৃৎসমিৎ ও শৌনক একই ব্যক্তি বলিয়া প্রবাদ আছে । তৃতীয় মণ্ডলের প্রণেতা বিশ্বামিত্র, চতুর্থ মণ্ডলের প্রণেতা বামদেব, পঞ্চম মণ্ডলের প্রণেতা অত্রি, ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রণেতা ভবদ্বাজ, সপ্তম মণ্ডলের প্রণেতা বশিষ্ঠ, অষ্টম মণ্ডলের প্রণেতা অঙ্গিরা । প্রথম মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত, দশম মণ্ডলেও ১৯১ সূক্ত । ‘তাহা নানা ঋষির প্রণীত বলিয়া কথিত আছে (১) । যাহারাই ঋগ্বেদ পাঠ করিয়াছেন, তাহারাই দেখিয়া থাকিবেন যে, ইহার দশম মণ্ডল অস্বাভাবিক মণ্ডল হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । ইহা যেন সেই মহাঋষের পরিশিষ্ট মাত্র । এই দশম মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্তই অপ্রাচীন । এই সূক্ত হইতে তাৎকালিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা শক্তির বিকাশ সমাজিক উন্নতি, সমাজান্তর্গত নানাবিধ জটিল অবস্থা প্রভৃতির সমূহ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া

(১) পরলোকগত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই ।

যায় । বিবাহ প্রভৃতির বর্ণনা ও মন্ত্র এবং পরলোকের বর্ণনা এই দশম মণ্ডলের অন্ত্যতম অংশ ।” (১) । ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সম্বন্ধে ঔরমেশ বাবু বলিয়াছেন,—“আবার দশম মণ্ডলের অনেক মন্ত্রের প্রণেতা স্ব স্ব নাম গুপ্ত রাখিয়া মন্ত্রগুলি দেবতার নামে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন । দেবতাদিগের রচিত বলিলে এই সকল মন্ত্র প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে, বোধ হয় এইরূপ অভিপ্রায় । অন্য এক স্থানে তিনি বলিতেছেন,—“যে সময় মন্ত্রগুলি, মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হয়, সেই সময় দশম মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে । সেই সময়ট তাহা দৃষ্টান্ত ও ঋগ্বেদের শেষভাগে সংযুক্ত হইয়া যায় ।”

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বলেন,—“বর্তমান যুগের গ্রায় বৈদিক যুগে সাহিত্য-চর্চা এত বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিয়াছিল না । ঋষিদের সময়ে বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই । তাই লিখন প্রণালী তখন ছিল না । আর্য্যগণ লীলাময়ী প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর বিচিত্র দৃশ্য সকল দর্শন করিয়া আপন আপন সরল হৃদয়ের সাময়িক ভাবানুযায়ী গীত রচনা করিতেন, মন্ত্র রচনা করিতেন কখনও বা সামাজিক অভাব অভিযোগ, রীতিনীতি সম্বন্ধেও শ্লোকাবলী রচিত হইত, আর সেই সকল গীত বা মন্ত্র বা শ্লোক আবহমান কাল পর্য্যন্ত শ্রবণ মাত্রেই আবদ্ধ ছিল, পিতার নিকট পুত্র তাহা শিক্ষা করিত, গুরুর নিকট শিষ্য তাহা শিক্ষা করিত । এই সকল হইতে বেশ অনুমিত হইতে পারে যে, ঋগ্বেদের মত একখানি অতিশয় প্রাচীন গ্রন্থ—যে গ্রন্থের রচয়িতা ভিন্ন ভিন্ন এবং সংগ্রহকর্ত্তাও তাহাই, যে গ্রন্থ প্রণয়নে প্রায় ছয় শতাব্দী কাল ব্যয়িত হইয়া থাকিবে, ‘যে গ্রন্থের শ্লোকগুলি সর্বপ্রথমে কেবল মাত্র গুনিয়াই শিখিয়া রাখিতে হইত, কারণ লিখিত ভাষা বা অক্ষরের সৃষ্টি তখনও হইয়াছিল না, সেই প্রাচীন গ্রন্থ

(১) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, লিখিত “জাতিভেদ” ।

ঋগ্বেদের অনেক শ্লোক সংগ্রহকারক কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে ।
 এক্ষণে হওয়া সম্ভব নহে । সুতরাং প্রথম যুগের পরবর্ত্তী যুগ সমূহে অনেকে
 হয়ত একেবারে মৌলিক শ্লোকগুলি শিক্ষা করিবার আদৌ সুযোগ পান নাই ।
 তাহার পর যিনি যখন যে শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন (এখনও আমরা অনেক
 পুস্তকের পাঠান্তর গ্রহণ করিয়া থাকি) এবং যিনি যখন যে নূতন শ্লোক রচনা
 করিয়া, তাহা সেই ঋগ্বেদেরযুগের প্রাচীন আৰ্য্যদিগের রচিত শ্লোক বলিয়া
 ঋগ্বেদের কলেবরে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, সেই নব রচিত শ্লোক সমূহে
 নিশ্চয়ই তাৎকালিক অভাব অভিযোগ এবং সামাজিক চিত্রের ছায়া থাকিবেই
 থাকিবে । কারণ সমাজ মানব-হৃদয় গঠন করে, আর ভাষা ও ভাব সেই
 হৃদয়ের অধিকৃত চিত্র । আর এক কথা, ঋগ্বেদ প্রণয়নের যুগে আৰ্য্যভূমে
 ব্রাহ্মণ প্রাধাত্য বিস্তার করিবার একটা বিশাল তরঙ্গ রঙ্গে-ভঙ্গে উত্তোলিত
 হইয়া গ্রামে গ্রামে, জনপদে জনপদে বাতাসংস্কৃত সমুদ্রের স্থায় ছুটিয়া
 বেড়াইতেছিল । ব্রাহ্মণ প্রাধাত্য স্থাপয়িতৃগণের যত্নে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের
 অনেকগুলি সূক্ত প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল । ভট্টমোক্ষমূলের, মিঃ ওয়েবর, মিঃ
 কোলক্রক, ১মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে তির্য্যগাত্তও
 সন্দেহ করেন না । রমেশ বাবু ও ম্যার সাহেবের মত তত্পূর্বেই প্রদর্শিত
 হইয়াছে । শুধু ঋগ্বেদ বলিয়া নহে, হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অভাব
 নাই । অধুনা রাগায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থেও প্রক্ষিপ্ত শ্লোক দৃষ্ট হইয়া থাকে ।
 হিন্দু শাস্ত্রে এত ভ্রূরি ভ্রূরি শ্লোক স্থান পাইয়াছে, যাহা আলোচনা বা লিপিবদ্ধ
 করিতে গেলে একখানা পুস্তক রচিত হইতে পারে । এবং বহু শ্লোক বহু
 শাস্ত্র গ্রন্থে আছে, যাহার মধ্যে পরস্পর ঐক্য নাই এবং ভীষণ সামঞ্জস্য
 বিরহিত । এ সম্বন্ধে আমরা গ্রন্থান্তরে আমাদের বক্তব্য আলোচনা করিতে
 ইচ্ছুক রহিলাম ।

উল্লিখিত আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, বর্ণভেদের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে

যাঁহারা ঋগ্বেদের দোহাই দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সে নজীরের মূল্য কিছুই নাই। আমরা অনায়াসে সে নজীর অবহেলা করিতে পারি। এলফিনষ্টোন সাহেব তাঁহার ভারত ইতিহাসে বলেন,—“In the Rigveda the caste system of latter times is wholly unknown” (Appendix VIII page 286), অর্থাৎ আধুনিক কালের জাতিভেদ প্রথা ঋগ্বেদের সময় সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল।

ফলতঃ “সৃষ্টির আদিম কালে বা সত্যযুগে লোকের রূপ গুণ পরমায়ু ও চেষ্টা এক ছিল কেহই বুদ্ধি খাটাইয়া কিছু করিতে পারিতেন না। সকলেই যদৃচ্ছা লব্ধ ফল মূল ও আম মাংসাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। পাপ পুণ্য কার্য্য কাহাকে বলে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তখন বর্ণ বা জাতি বা বর্ণ সঙ্করের কথাও অজ্ঞাত ছিল। কেহ ইচ্ছা বা সঙ্কল্প করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষও ছিল না। সকলেরই রূপও ভেদাভেদ ছিল না। পরে ত্রেতাযুগে বা পরবর্ত্তী সময়ে গুণ বর্ণের বিভেদ বশতঃ চাতুর্বর্ণ্য প্রতিষ্ঠাপিত হয়।” * শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—“সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রথমে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত, ক্রতু, প্রচেতা, ভৃগু, বশিষ্ঠ, নারদ এই দশ প্রজাপতি সৃষ্টি করেন। এই দশ প্রজাপতি হইতেই পরে ক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের উৎপত্তি। ফলকথা জন্মতঃ কেহই বড় ছোট হয় নাই। গুণ ও কন্ম দ্বারাই বড় ছোট বলিয়া মনে করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

* বায়ু পুরাণ, ৮ম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

—♦ মনন ♦—

প্রাচীন আৰ্য্যদিগের গুণকর্মগত জাতিভেদ ।

এক্ষণে আমরা প্রাচীন আৰ্য্যদিগের যে জাতিগত কোন পার্থক্য ছিল না—তাহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব । শাস্ত্রকারগণ এবিষয়ে আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারেন—সর্বপ্রথমে তাহাই প্রদর্শন করিব । বর্তমান বিষয়ে আমরা দেখাইব—আৰ্য্যগণ কত উদার ভাব পোষণ করিয়া গিয়াছেন—তাহাদের অন্তঃকরণে ভ্রমেও বৈষম্য স্থান প্রাপ্ত হয় নাই । যাহার যাহাতে অধিকার, তাহাকে তাহা হইতে বিন্দুমাত্র বঞ্চিত করা হয় নাই । পঞ্চমবেদ মহাভারতের শান্তিপর্বে ১৮৮ অধ্যায়ে ভৃগু ভরদ্বাজ সংবাদে বর্ণভেদের আলোচনা আছে—আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভৃগুরুবাচ—

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রহ্মসিদ্ধং জগৎ
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভিবর্ণতাং গতম্ ॥
কাম ভোগ প্রিয়াস্তীক্ষাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ ।
তাক্ত স্বধর্মারক্তাঙ্গান্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥
গোভ্যোবৃতিঃ সর্গাস্থায়ী গীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ ।
স্বধর্মাস্থতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্বাতাং গতাঃ ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুকা সর্বকর্মোপজীবিনঃ ।
কৃষাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টান্তে দ্বিজাঃ শূত্রতাং গতাঃ ॥
ইত্যেতৈঃ কর্মভিবর্ত্তা দ্বিজাবর্ণস্তরং গতাঃ
ধর্মো যজ্ঞঃ ক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে ॥

ইহার অর্থ এই যে,—ভৃগু কহিলেন, তপোধন ! ইহলোকে বস্তুতঃ বর্ণের ইतर বিশেষ নাই। সমুদয় জগতই ব্রাহ্মণ, মনুষ্যগণ পূর্বে ব্রাহ্ম হইতে সৃষ্ট হইয়া—ক্রমে ক্রমে কার্য দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে পরিগণিত হইয়াছেন অথবা সমস্ত জগতে এক ব্রাহ্মণ মাত্র ব্রাহ্মা কর্তৃক পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপরে কর্মের বিভিন্নতা বশতঃ বর্ণের বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যে ব্রাহ্মণগণ রজোগুণ প্রভাবে কামভোগে প্রিয় ক্রোধপরতন্ত্র, রক্তবর্ণ সাহসী ও হঠকারী হইয়া স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্ব ও যে ব্রাহ্মণগণ গোপালন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব এবং যাহারা তমোগুণ-প্রভাবে হিংসাপরতন্ত্র, লুন্ঠ, সর্বকল্যাণজীবী কৃষ্ণবর্ণ মিথ্যাবাদী ও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহারাশুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।” ব্রাহ্মণগণ এইরূপ কার্যের দ্বারাই পৃথক পৃথক বর্ণলাভ করিয়াছেন।”

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন,—“জাতিভেদ সমস্তার একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা ভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে, সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেন। ইহাই জাতিভেদ সমস্তার সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা।” (১)

সুতরাং ইহার দ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে পূর্বে এক বর্ণ ছিল কিন্তু কার্যের বিভিন্নতা হেতু ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ সৃষ্টি হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলিয়াছেন : ...

“ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আদীৎ একমেব, তদেকং সৎ নব্যভবৎ।

তচ্ছৈয়ো রূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং”।

অর্থাৎ “অগ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল । ঐ জাতি একাকী বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল না, সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠবর্ণ (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রকে সৃষ্টি করিলেন ।” এস্থলে একটা কথা বলা আবশ্যিক—ব্রহ্ম শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ হইতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক বেদ ও স্মৃতি পাঠকই জানেন যে, ব্রাহ্মণ অর্থে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ অনেক স্থলেই আছে । যিনি ব্রহ্মকে জানেন বা ধারণ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ—ইহাই ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ । প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ব্রহ্ম শব্দের অনেক অর্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যথা—ঈশ্বর, ব্রাহ্মণ জাতি, বেদমন্ত্র, দেব, তপঃ, ব্রহ্মতেজ, বেদমন্ত্র যাহারা ধারণ করেন তাহারা । ‘ভূমণ্ডলে মানব সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রথমে ব্রাহ্মণগণ সৃষ্ট হইরাছিলেন । পরে কার্য্য প্রভাবে সেই ব্রাহ্মণগণই অগ্র বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন ।’

যথা,—

বাক্য সংঘমকালে হি তস্মৈ বরপ্রদস্ত্র দেবদেবস্ত্র ব্রাহ্মণাঃ ।

প্রথমং প্রোত্বভূতা ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ শেষবর্ণাঃ প্রোত্বভূতাঃ ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৩৪২ অধ্যায় ২১ শ্লোক)

“সর্ব্বকর্ত্তা লোকের হিতকারী বরপ্রদ ব্রাহ্মণগণ, নানাগণের বাক্য সংঘমকালে, মুখ হইতে প্রোত্বভূত হইয়াছেন । ব্রাহ্মণ হইতে অগ্রাচ্য সমুদয় বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে ।”

সমজ্জ ব্রাহ্মণানগ্রে সৃষ্ট্যান্দৌ চ চতুর্শ্লুগঃ ।

সর্ব্ববর্ণাঃ পৃথক পশ্চাৎ তেষাং বংশেষু জজ্ঞিরে ॥

(উৎকলখণ্ড, ৩৮ অ, ৪৪ শ্লোক)

“ব্রহ্মা, সৃষ্টির প্রারম্ভে অগ্রে ব্রাহ্মণগণকেই সৃজন করিয়াছিলেন । তৎপরে পৃথক পৃথক সমস্ত বর্ণ তাহাদিগেরই বংশে উৎপন্ন হইয়াছে ।”

অপিচ—

তস্মাৎ বর্ণাধাজবো জ্ঞাতিবর্ণাঃ সংসৃজ্যতে তস্ম বিকার এব ।

এবং সাম যজুরেকমৃগেকা বিপ্রৈশ্চকো নিশ্চয়ে তেষু সৃষ্টঃ ॥

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৬০ অধ্যায়, ৪৭ শ্লোক)

“যখন ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন ঐ তিন বর্ণ, ব্রাহ্মণের জ্ঞাতিস্বরূপ । তত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে ঋক্, যজু ও সামবেদের প্রচার নিমিত্ত, প্রথমে ব্রাহ্মণেরই সৃষ্টি হইয়াছে ।”

গুণকর্ম্মগত জাতিভেদ সম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরঙ্গ মহাশয় তাঁহার “সমাজ সংস্কার” নামক পুস্তকে যাহা লিখিয়াছেন—সাধারণের অবগতির জন্ত নিম্নে উহা অবিকল উদ্ধৃত হইল ।

তিনি বলিতেছেন :—

“* * * * * এ সময়ে মানবের প্রকৃত জাতিত্ব বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক ও অসাময়িক নহে । এ বিষয়ে ভারতের সর্বপ্রধান ও সর্বজনোপজীৱ্য শাস্ত্রকার ভগবান্ মনু ও মহর্ষি বেদব্যাসের উক্তি আলোচিত হইলেই যথেষ্ট হইবে । মহাভারতের ও মন্বাদি শাস্ত্রের নানা স্থানে এ বিষয় সংক্ষেপে এবং বিস্তারে কথিত হইয়াছে । মূল কথা—প্রকৃত জাতিত্ব জন্মাধীন নহে, উহা সংস্কারাধীন ।—“সংস্কারৈর্দিজউচ্যতে” । সংস্কার অর্থাৎ সদ্গুণসম্মতজনিত, লোকপাবন সদাচার লাভ করিয়াই মানব দ্বিজত্ব লাভ করে । যেমন মলিন অঙ্গার অগ্নিসংযোগে অগ্নি হইয়া যায় । পতিতপাবনী ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে উচ্চ পদবী লাভ করা বিচিত্র নহে । এই ব্রহ্মবিদ্যাজনিত শ্রেষ্ঠজাতিত্বই অজর ও অমর । * * *

এই জাতিত্বের মীমাংসা সর্বোপজীৱ্য মহাভারতাদি গ্রন্থের নানাস্থানে

প্রসঙ্গক্রমে নিরূপিত হইয়াছে । সে মীমাংসা সর্বত্রই অভিন্ন । মহা-
ভারতের বনপর্ব, অজগর পর্ব হইতে সংক্ষেপে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে ;
—পঞ্চপাণ্ডবের বনবাসকালে, একদা ভীমসেন একাকী ফণাদি সংগ্রহে
বহির্গত হইয়া এক মহাকায়া ভূজঙ্গ দর্শন করিলেন । ভূজঙ্গ ভীমকে
ভোগবেষ্টনে বদ্ধ করায়, ভীম, নাগায়ুতবলশালী হইয়াও স্পন্দনহীন
হইলেন । তখন সেই মহানাগ ভীমকে কহিলেন,—“আমি সামান্ত নাগ
নহি । আমি পূর্বজন্মে মহারাজ নহুষ ছিলাম । পুণ্যবলে স্বর্গের অধীশ্বর
হইয়াছিলাম । তথায় ঐশ্বর্য্যমদে ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্যের অপমান করায়, তদীয়
শাপে এই বিকৃত নাগযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি । ব্রহ্মর্ষি কহিয়াছেন,—যিনি
তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন, তিনি তোমার গ্রাম হইতে অদ্বারক্ষা
ও তোমাকে এ পাপ হইতে মুক্ত করিবেন । নহিলে, তোমারও উদ্ধার নাই,
এবং তোমার কবলে পতিত ব্যক্তিরও উদ্ধার নাই ।” ভীম তদীয় প্রশ্নের
উত্তরদানে অক্ষম হওয়ায় তৎকর্তৃক কবলিত হইতে লাগিলেন । ইত্যবসরে
ভীমের আগমনবিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণাধিক
ভ্রাতাকে তদবস্থায় দর্শন করিলেন । অনন্তর ভীমের মুখে সকল ব্রহ্মাস্ত্র
শুনিয়া, সেই নাগের নিকট ভ্রাতার প্রাণভিক্ষা চাহিলেন । নাগ
কহিলেন,—“তুমি আমার প্রশ্নোত্তর দিলেই তোমার ভ্রাতাকে মুক্ত করিব,
নহিলে আমার কবল হইতে রক্ষা নাই” । যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রশ্ন শুনিতে চাহিলে
নাগ কহিলেন ।

নাগ ।—“ব্রাহ্মণঃ কো ভবেজাজন্ । বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির ।’

হে যুধিষ্ঠির ! ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে ? এ জগতে বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞেয়
বস্তু কি ?

যুধিষ্ঠির । বেদ্য বস্তু—সেই স্মৃৎসংখ্যাতীত, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, যাহাকে
লাভ করিলে, জীব শোক মোহের অতীত হয় । আর আপনি যে ব্রাহ্মণের

কথা জিজ্ঞাসিলেন, সে বিষয়ে আমি সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই প্রমাণ করিয়া বলিতেছি ;—

“ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ।

যত্রৈতৎ লক্ষ্যতে সৰ্প ! বৃত্তং স ব্রাহ্মণো স্মৃতঃ ॥

যত্রৈতন্ন ভবেৎ সৰ্প ! তং শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ ॥”

—শূদ্র হইয়াও শূদ্র হয় না, ব্রাহ্মণ হইয়াও ব্রাহ্মণ হয় না, অর্থাৎ শূদ্র বংশ বা ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম, শূদ্র বা ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে । ‘বৃত্ত’ অর্থাৎ সদাচার যাহাতে লক্ষ্য করিবে, তাহাকেই ব্রাহ্মণ জানিও ।

এই কথা শুনিয়া নাগ কহিলেন, যদি—একমাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বের কারণ হয়, তবে সেই চরিত্রের অভাবে, তাহার জন্মাধীন জাতিত্ব বৃথা হয় ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন ;—

“জাতিরত্ন মহাসৰ্প ! মনুষ্যত্বে মহামতে !

সঙ্করাৎ সৰ্ব্ববর্ণানাং ছুস্পরীক্ষ্যতি মে মতিঃ ॥

সৰ্বে সৰ্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ ।

বাঙ্ মৈথুনমথো জন্ম মরণং চ সমং নৃণাম্ ॥

ইদমার্যং প্রমাণং চ যে যজামহ ইত্যপি ।

তস্মাচ্ছীলং প্রধানেষ্টং বিদূৰ্ঘে তজ্জদর্শিনঃ ॥”

—হে মহানাগ ! হে মহামতে ! সৰ্ব্ববর্ণমধ্যে সঙ্করতা জন্ম মানবের জন্মাধীন জাতিত্ব সূক্ষ্মজ্ঞের । উদাম ইচ্ছার পরতন্ত্র হইয়া, মানবগণ সকল যোনিতেই অপত্যোৎপাদন করিতেছে । যেমন মহাসমুদ্রে অসংখ্য জলচরের গতিবিধি নির্ণয় হয় না, তেমনি মানবের বাবু, মৈথুন, জন্ম ও মরণ, এই কয়টি নির্ণয় হয় না । অতএব যাহারা যজ্ঞশীল অর্থাৎ যজ্ঞ-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি জ্ঞান-পুণ্যের অধিষ্ঠানেই সদা নিযুক্ত, তাহারা

—“ভেঁ! ভেঁ! করে ভোমরা নয়, গলায় পৈতা বাসুণ নয়।” কপদিক মূল্যের কয়েকগাছি শূত্র স্বল্পে ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। এ জগতে একমাত্র পুরুষকারেই লোকের আত্মপরিচয়।

একটা কৌতুকবহু পৌরাণিক কথা মনে হইল, তাহা এস্থলে বলা অপ্ৰাসঙ্গিক নহে। কথিত আছে, একদা লোমশমুনি সর্বদা রাশি রাশি লোমভারে বড়ই অসুখী হইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করায়, ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন। লোমশ করযোড়ে কহিলেন,—“ভগবন্! আমি আর কিছুই চাহি না, কাশ্মীরী ভেড়ার ছায় এ লোমভার হইতে আমাকে মুক্ত করুন।” ব্রহ্মা কহিলেন—“বৎস! তুমি ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেই এ লোমসঙ্কট হইতে মুক্ত হইবে।” লোমশও তদবধি নানাস্থানে বহু ব্রাহ্মণের প্রসাদ ভোজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার গাত্রে একগাছি লোমও স্থলিত হইল না। তখন তিনি হতাশ হইয়া; পুনরায় বিরিকির শরণাপন্ন হইলেন, কহিলেন,—“ভগবন্! আমার অদৃষ্টে ব্রহ্মবাক্যও বিফল হইল। আমি আপনার আদেশে বহু ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন করিলাম; কৈ? আমার ত একটা লোমও পতিত হইল না।” ব্রহ্মা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—“বৎস! তুমি বংশ ও উপবীত দেখিয়াই প্রতারিত হইয়াছ। প্রকৃত পক্ষে উহারা কেহই ব্রাহ্মণ নহে। তোমার আশ্রমের দূরে যে চণ্ডালপল্লী আছে, সেই স্থানে হরিদাস নামে এক চণ্ডাল সপরিবার বাস করে, তুমি তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেই সফল মনোরথ হইবে। তখন মুনিবর সেই চণ্ডালের ভবনে গিয়া হরিদাসের নিকট অন্ন চাহিলে, সপরিবার হরিদাস ধরাবলুপ্তিত হইয়া কাতরস্বরে কহিল,—“ঠাকুর! আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব, আপনি আমাদের প্রত্যক্ষ নারায়ণ।—এ অস্পৃশ্য, নীচাধম, পাতকী চণ্ডাল আপনাকে কিরূপে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইবে? ক্ষমা করুন, অতিথি সেবায় আমরা সপরিবার আমাদের ধনপ্রাণ দিতে বিন্দুমাত্র কাতর নহি। কিন্তু

চণ্ডাল হইয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে কিরূপে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইব ?” মহর্ষিকে তখন অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল । তিনি মনে মনে উপায় উদ্ভাবন করিলেন । একদা ঐ চণ্ডাল ভোজনে বসিয়াছে, ইত্যবসরে লামশ অেলক্ষ্যভাবে গিয়া তদীয় পাত্রেস্থ অন্ন গ্রহণপূর্বক দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর পরমানন্দে সেই উচ্ছিষ্ট ভোজন ও সর্কাজে ভোজন করিলেন । তৎক্ষণাৎ তাঁহার দেহ নিলোম ও নিশ্চল হইল ।

• চণ্ডালোহপি ভবেদ্ বিপ্রো হরিভক্তিপরায়ণঃ ।

‘হরিভক্তিবিশীনস্ত দ্বিজোহপি স্বপচাধমঃ ॥

—“মুচি হ’লেও, হয় শুচি যদি কৃষ্ণ ভজে ;

শুচি হ’লেও হয় মুচি, যদি কৃষ্ণ ত্যজে ॥”

যদি কেহ কঠোর সাধনাবলে উচ্চ জ্ঞান ধর্মাদি অধিকার করে, তবে সে স্বতঃই শ্রেষ্ঠ পূজা লাভ করিবে । মনুষ্যত্বই মনুষ্যের জাতি ।”

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

এক এব পুরা বেদ প্রণব সর্ববাস্তবঃ ।

দেবনারায়ণোনাথ একাগ্নিবর্ণ এব চ ।

অর্থাৎ পূর্বে একবেদ, সর্ববাস্তব এক প্রণব, এক নারায়ণ দেবতা, এক অগ্নি ও একমাত্র বর্ণ ছিল ।

অন্যত্র—পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ২৫ অধ্যায়ে আছে,—

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ ।

‘ব্রহ্মণা পূর্কসৃষ্টং হি কৰ্মণা বর্ণতাং গতম্ ।

পুনশ্চ মহাভারতে,—

একবর্ণমিদং পূর্ণং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভার্জুনকে বলিতেছেন,—

ব্রাহ্মণ কত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরস্তপ ।

কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈশু নৈঃ ॥ ১৮শ অঃ ।

অর্থাৎ স্বভাবসম্মত গুণানুসারে ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম বিভাগ হইয়াছে । যে ব্যক্তি যেরূপ গুণসম্পন্ন, তাহার পক্ষে তদুপযোগী কর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে বলিতেছেন,—

“চাতুর্কর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।”

অর্থাৎ গুণকর্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ আমি সৃষ্টি করিয়াছি । “গুণকর্মবিভাগশঃ” এই অংশই সমুদয় সংশয় বিনষ্ট করিতেছে ।

অত্রি-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে ;—

দেবো মুনির্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ ।

পশুয়েচ্ছোহপি চাণ্ডালো বিপ্রো দশবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬৪

সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনম্ ।

অতিথিং বৈশ্বদেযঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ৩৬৫

শাকৈ পত্রৈ ফলৈমূলৈ বনবাসৈ সদা রতঃ ।

নিরতোহহরহঃ শ্রীক্ষে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে ॥ ৩৬৬

বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্কসঙ্গং পরিত্যজেৎ ।

সাজ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো বিজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৩৬৭

অজ্ঞাহতাশ্চ ধনানঃ সংগ্রামে সর্কসগুণে

আরম্ভে নির্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে ॥ ৩৬৮

কৃষিকৰ্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতাপালকঃ ।

বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে ॥ ৩৬৯

লাক্ষালবণসম্মিশ্র কুসুমুজ্জ্বলীৰ সর্পিষাম্ ।

বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে ॥ ৩৭০

চৌরশ্চ তক্ষরশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা ।

মৎস্যমাংসে সদা লুক্কো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে ॥ ৩৭১

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্বিতঃ ।

তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরদাহতঃ ॥ ৩৭২

বাপীকুপতড়াগানামারামশ্চ সরঃসু চ ।

নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো শ্লেচ্ছ উচ্যতে ॥ ৩৭৩

ক্রিয়াহীনশ্চ মুখশ্চ সর্বধর্ম্মবিবর্জিতঃ ।

নির্দয়ঃ সর্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে ॥ ৩৭৪

বেদৈবিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং, শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণ পাঠাঃ ।

পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি, ভ্রষ্টান্ততো ভাগবতা ভবন্তি ॥ ৩৭৫

জ্যোতির্বিদো হৃথর্ষণঃ কীরপৌরাণ পাঠকাঃ ।

শ্রাদ্ধে যজ্ঞে মহাদানে বরণীয়াঃ কদাচ ন ॥ ৩৭৬

“দেব, মুনি, দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, পশু, শ্লেচ্ছ এবং চণ্ডাল এই দশবিধ (দশ লক্ষণাক্রান্ত) ব্রাহ্মণ শাস্ত্রনির্দিষ্ট । যিনি প্রতিদিন সন্ধ্যা, জপ, হোম, দেবপূজা, অতিথিসেবা এবং বৈশ্বদেব করেন, তাঁহাকে “দেব” ব্রাহ্মণ কহে (এই সকল ধর্ম্ম-কর্ত্তা ব্রাহ্মণ, দেবসংজ্ঞক) । শাক-পত্র-ফল-মূল-ভোজী বনবাসী এবং নিত্য-শ্রাদ্ধরত ব্রাহ্মণ “মুনি” বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন । যিনি প্রত্যহ বেদান্ত . পাঠী, সর্বসম্প্রদায়ী, সাংখ্য এবং যোগের তাৎপর্য্য জানে তৎপর সেই ব্রাহ্মণ “দ্বিজ” নামে অভিহিত হন । যিনি সমরস্থলে সর্বসমক্ষে আরম্ভ সময়েই ধর্ম্মদিগকে . অস্ত্রদ্বারা আহত ও

পরাজিত করেন, সেই ব্রাহ্মণের “ক্ষত্র” সংজ্ঞা । কৃষিকার্যের গো-প্রতিপালক এবং বাণিজ্য-তৎপর ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বলিয়া উক্ত হন । যে লাফা, লবণ, কুসুম, ছন্ধ, ঘৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় করে, সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া নির্দিষ্ট । চোর, তরুর (বলপূর্বক পরধনাপহারী), সূচক (কুপরামর্শদাতা), দংশক (কটুভাষী) এবং সর্বদা মৎস্য-মাংস লোভী ব্রাহ্মণ “নিষাদ” বলিয়া কথিত । যে ব্রাহ্মণ (বেদ এবং পরমাত্মা) তত্ত্ব কিছুই জানে না অথচ কেবল যজ্ঞোপবীতের বলে অতিশয় গর্ব প্রকাশ করে, এই পাপে সেই ব্রাহ্মণ “পশু” বলিয়া খ্যাত । ৩৬৪—৩৭১ । যে নিঃশঙ্কভাবে (পাপের ভয় না করিয়া) কুপ, তড়াগ, সরোবর এবং আরাম (সাধারণ ভোগ্য উপবন) রুদ্ধ করে, (তত্তৎ স্থলে ব্যবহার বন্ধ করে), সেই ব্রাহ্মণ স্বেচ্ছ বলিয়া কথিত হয় । ক্রিয়াহীন (সম্বাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মহীন), মূর্থ, সর্বধর্ম (সত্যবাদিতা প্রভৃতি) রহিত, সকল প্রাণীর প্রতি নির্দিয় ব্রাহ্মণ “চণ্ডাল” বলিয়া গণ্য । বেদ অধ্যয়নে কিছু জ্ঞান না জন্মিলে, ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে ; তাহা নিষ্ফল হইলে পুরাণপাঠ্য এবং পূর্ববৎ তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, কৃষিকর্মে রত হয় ; তাহাতেও বিফল মনোরথ হইলে, ভাগবত (ভগবৈষ্ণব) ধর্ম অবলম্বন করে । জ্যোতির্বিদ (ধন গ্রহণ করিয়া গ্রহ নক্ষত্রের ফলাফল নির্ণয়কারী), অথর্ববেদী, শুকবৎ পুরাণ পাঠক (অর্থ বোধ না করিয়া, যাহারা পুরাণ আবৃত্তি করে), ইহাদিগকে শ্রদ্ধা, যজ্ঞ এবং মহাদানে কদাপি বরণ করিবে না ।”

অত্রি আরও বলিতেছেন,—

আবিকশ্চিৎকরশ্চ বৈদ্যো নক্ষত্র পাঠকঃ ।

চতুর্বিপ্রো ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥ ৩৭৮

মাগধো মাধুরশ্চৈব কাপটঃ কোটকামলো ।

পঞ্চবিপ্রো ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥ ৩৭৯

“অজাজীবী, চিত্রকর, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, নক্ষত্র-পাঠক (নক্ষত্রজীবী), এই চতুর্বিধ বিপ্র বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহে । মগধ (মগধদেশীয়), মাধুর (তোষামোদকারী), কপটাচারী, কটুব্যবহারী, কামল (লোভী), এই পঞ্চবিধ ব্রাহ্মণ, বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিত হইলেও পূজনীয় নহে ।”

বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,—

শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবং ।

জ্ঞানং দয়াদ্যুতাত্ত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণং ॥

শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা

ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণং ॥

দেবগুরুচ্যুতে ভক্তিত্রিবর্গ পরিপেষণং ।

আস্তিক্যমুদ্যমোনিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্লক্ষণং ॥

শূদ্রশ্চ সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিষ্ঠায়য়া ।

অমন্ত্র যজ্ঞোহুস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণং ।

(শ্রীমদ্ভাগবত)

আমরা যতই আলোচনা করিতেছি, ততই স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রাহ্মণ হইয়াই, কি ক্ষত্রিয় হইয়াই, কি বৈশ্য হইয়াই, অথবা কি শূদ্র হইয়াই জন্মগ্রহণ করে নাই । জন্ম সকলের একরূপেই হইয়াছিল । কিন্তু কার্য্য দ্বারা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নিম্নস্তরে উপনীত হইয়াছে । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যথাক্রমে সত্যগুণ, সত্যরজঃ উভয়বিধ মিশ্রিত গুণ, রজঃ ও তমঃ ভাবাপন্ন এবং তমঃ ভাবাপন্ন মানব ভিন্ন অন্য কিছু নহে । এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবদগীতার উক্ত হইয়াছে—

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।

জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্ ॥

মনুও বলিতেছেন,—

অধ্যাপনমধ্যক্ষনং যজনং যাজনং তথা ।

দানং প্রতীগ্রহকৈব ব্রাহ্মণানামকল্পমং ॥

ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে ভগবদগীতা বলিতেছেন,—

শৌর্য্যং তেজোযুতির্দক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।

দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ॥

মনু বলিতেছেন,—

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাদ্যয়নমেব চ ॥

বিষয়েষু প্রসক্তি চ ক্ষত্রিয়শ্চ সমাসতঃ ॥

কৃষিজীবী, গো-পালক ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী আর্য্য-সম্প্রদায় বৈশ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; যথা—ভগবদগীতা :—

কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকর্মস্বভাবজম্ ।

অন্যত্র—

পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাদ্যয়নমেব চ ।

বণিকপথং কুশীদঞ্চ বৈশ্যশ্চ কৃষিমেব চ ॥

আর শূদ্র হইতেছে তমোগুণ প্রধান ; অলস, নিরুৎসাহ এবং অজ্ঞান ব্যক্তির কেবল দাসত্ব-বৃত্তিই স্বাভাবিক কর্ম ।

এই জন্ত,—

পরিচর্যাশ্রকং কর্মশূদ্রশ্চাপি স্বভাবজম্ । (ভগবদগীতা)

অপিচ,—

একমেব তু শূদ্রশ্চ প্রভুকর্মসমাদিশম্ ।

এতেযামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামুহুয়মা ॥

বাস্তবিক পক্ষে প্রাচীন আর্য্যগণ এইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন কার্য্যে ব্রতা হওয়ার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এইরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া

পড়িয়াছিলেন । ফলতঃ গুণ ও কর্মগত জাতিভেদ প্রথা তৎকালে এরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছিল যে, সত্যগুণ প্রধান ব্রাহ্মণের পুত্রে যদি রজোগুণ প্রধান ক্ষত্রিয় লক্ষণ অথবা রজো ও তমোগুণ প্রধান বৈশ্য লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত, কিম্বা তমোগুণ প্রধান শূদ্র-গুণ যদি তাহাতে প্রকাশ পাইত, তবে সে ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়াও ক্ষত্রিয় বৈশ্য অথবা শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হইয়া যাইত । এইরূপে চারি সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই গুণ ও কর্ম অনুসারে সমাজে উচ্চ বা নিম্নস্তরে গমন করিত ।

শাস্ত্রকারগণ এরূপ প্রথা অনুমোদন এবং দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন । সমুদয় বর্ণের লক্ষণ বলিয়া, যাহা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার পরে ভগবতকার বলিতেছেন,—

যশ্র যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসোবর্ণাভিব্যঞ্জকং ।

যদশ্রত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত—৭ম স্কন্ধ)

“যে বর্ণের যে লক্ষণ বলা গেল, তাহা অশ্রুত দৃষ্ট হইলেও তাহাকে তদ্বারা নির্দেশ করা যাইবে ।” অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বংশজ ব্যক্তিতে যদি ক্ষত্রিয় কর্ম বা ক্ষত্রিয়গুণ, বৈশ্যকর্ম বা বৈশ্যগুণ, শূদ্রকর্ম বা শূদ্রগুণ দেখা যায়, তাহা হইলে তিনি ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইবেন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয় পুত্রে যদি ব্রাহ্মণ গুণ এবং ব্রাহ্মণ কর্ম, বৈশ্যগুণ ও বৈশ্যকর্ম অথবা শূদ্রগুণ ও শূদ্রকর্ম দেখা যায়, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা শূদ্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইবেন । বৈশ্য শূদ্রের সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপই নিয়ম ।

সৎকার্য্য দ্বারা উচ্চ বর্ণত্ব ও অসৎ কার্য্য দ্বারা হীনবর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়া সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ বহুবিধ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন ।

ভগবান্ গোতম বলিতেছেন—

বর্ণাস্তর গমনমুৎকর্ষাপকর্ষাভ্যাং ।

“অর্থাৎ সংশুণ ও সংক্রিয়া এবং অসং শুণ ও অসং ক্রিয়া দ্বারা বর্ণান্তর গমন হয় ।”

বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজম্ ।

আর্য্যরূপমিবানার্য্যং কর্মভিঃ সৈববিভাবয়েৎ ॥ ৫৭

মনুসংহিতা,—দশম অধ্যায় ।

“বর্ণ-বহির্ভূত সবিশেষ অবিদিত সঙ্করজাতি-সমুত্ত, আপাততঃ আর্য্যবৎ প্রতীয়মান কিন্তু অনার্য্য—এবদুত ব্যক্তির কর্মদর্শনে জাতি-নির্ণয় করিবে ।”

“অনার্য্যতা নির্ধূরতা কুরতা নিক্রিয়াত্মতা ।

পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোক কলুষযোনিজম্ । ৫৮

মনুসংহিতা,—দশম অধ্যায় ।

“অনার্য্যতা, নির্ধূরতা এবং বধকর্মের অনুর্ত্তান—এই সকল মনুষ্যের নীচজাতিত্ব প্রকাশ করে ।”

অত্রি বলিতেছেন,—

“সদ্যঃ পতিতমাংসেন লাক্ষ্য্য লবণে ন চ ।

ত্ৰ্যাহেনশূদ্রো ভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়্যৎ ॥ ২১

“ব্রাহ্মণ মাংস, লাক্ষ্য (গালা), লবণ বিক্রয় করিলে সদ্য পতিত হয় এবং দুগ্ধ বিক্রয় করিলে, তিন দিনে শূদ্রবৎ হয় ।”

“পরনিপানেষপঃ পীত্বা তৎসাগ্যমুপগচ্ছতীতি ॥ ৩৮

বিষ্ণুসংহিতা,—চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ।

“পরকীয় জলাশয়ে জলপান করিলে, জলাশয় স্বামীর সমতা প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ পানকর্তা যদি ব্রাহ্মণ, আর জলাশয়স্বামী ক্ষত্রিয় হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সন্ধান হইয়া যাইবে ইত্যাদি ।”

“যন্ত্ৰ কায়গতং ব্রহ্মমদ্যোনান্নাব্যতে সৰুৎ ।

তন্ত্ৰ ব্যপৈতি ব্রাহ্মণ্যং শূদ্রত্বঞ্চ স গচ্ছতি ॥ ৯৮

মনুসংহিতা, — একাদশঃ অধ্যায়ঃ ।

“যাঁহার কায়গত ব্রহ্ম একবারও মদ্য দ্বারা আধাবিত্ত হয়, তাঁহার ব্রহ্মণ্য দূরীভূত হয় এবং তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন ।”

“ভুঞ্জতে যে তু শূদ্রানং মাসমেকং নিরন্তরং ।

ইহজন্মানি শূদ্রত্বং জায়ন্তে তে মৃত্যুঃ শুনি ॥ ৭

শূদ্রানং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রে নৈব সহাসনম্ ।

শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমঃ কঞ্চিজ্জলন্তমপি পাতয়েৎ ॥ ৮

আপস্তম্বসংহিতা, — অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

“যে সকল ব্রাহ্মণ একমাস নিরন্তর শূদ্রান্নভোজন করে, সে এই জন্মেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, জন্মান্তরে কুকুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । শূদ্রান্নভোজন, শূদ্রের সম্পর্ক এবং শূদ্রের সহিত একাসনে উপবেশন, শূদ্রের নিকট জ্ঞান লাভ করা এ সকল কার্য্য তেজস্বী পুরুষকেও পতিত করে ।” ফলতঃ কৰ্ম্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণ পূজ্য ও হেয়, — জন্ম দ্বারা নহে ।

মনু বলিতেছেন, —

চণ্ডালাস্ত্যজিয়ো গহ্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ ।

পতন্ত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাত্ সামান্ত গচ্ছতি ॥ ১৭৬

মনুসংহিতা, — একাদশঃ অধ্যায়ঃ ।

“অজ্ঞানতঃ চণ্ডালাদি অস্ত্যজ জাতীয় স্ত্রীগমন করিলে, উহাদিগের অন্ন ভক্ষণ এবং উহাদিগের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিলে, ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন এবং জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ সকল আচরণ করিলে, সমানতা অর্থাৎ তত্তজ্জাতীয়তা প্রাপ্ত হইবেন ।

শাস্ত্র বলিতেছেন,—

“ব্রাহ্মণস্ত সদাকালং শূদ্রপ্ৰেযণকারিণঃ ।

ভূমাবদ্বং প্রদাতব্যং যথৈব শ্বা তথৈব সঃ ॥ ৩৩

আপস্তম্বসংহিতা, —নবমোহধ্যায়ঃ ।

“সৰ্বদা শূদ্রের আজ্ঞা প্রতিপালনকারী ব্রাহ্মণকে ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে, কুকুর যেমন অস্পৃশ্য, সেই ব্রাহ্মণও তদ্রূপ জানিবে ।”

মহাভারতে কথিত হইয়াছে,—

শূদ্রো রাজন্ ভবতি ব্রহ্মবদ্ভূচাৰিত্রো যশ্চ ধৰ্মদপেতঃ ।

বৃষলীপতিঃ পিণ্ডনো নৰ্ত্তনশ্চ রাজপ্ৰেযো যশ্চ ভবেদ্বিকৰ্মা ॥

জপন্ বেদাজপশ্চাপি রাজন্ সগঃ শূদ্রেদাসবচ্চাপি ভোজ্যঃ ।

এতে সৰ্ব্বে শূদ্রসমাভবন্তি রাজস্নেতান্ বৰ্জয়েদেবকৃত্যে ॥

(মহাভারত, শান্তিপৰ্ব, ৫৩ অঃ, ৪৫ শ্লোক)

“যে সকল ব্রাহ্মণ ছশ্চরিত্র ও স্বধৰ্মত্যাগী হইয়া শূদ্রাগমন, নৃত্য ও গ্রাম্যদৌত্য প্রভৃতি পাপ কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা বেদ অধ্যয়ন করুন বা না করুন, তাঁহাদিগকে শূদ্রতুল্য জ্ঞান করিয়া, শূদ্রপংক্তির মধ্যে ভোজন প্রদান ও দেবকার্য্যানুষ্ঠান সময়ে ত্যাগ করা কর্তব্য ।” এইরূপ গেল কৰ্মগুণে ব্রাহ্মণের শূদ্রে অপনয়নের কথা । এখনে শূদ্র যে ব্রাহ্মণ হইতে পারে, তাহা দেখান যাইতেছে ।

ঐ মহাভারতে আছে,—

যস্ত শূদ্রো দমে সত্যে ধৰ্মে চ সত্যতোষিতঃ ।

তং ব্রাহ্মণমহং মন্ত্রে বৃশ্বেন হি ভবেদ্বিজঃ ॥

(মহাভারত, বনপৰ্ব, ১২৫ অধ্যায়)

“যে শূদ্র, দম (বাহেল্লিয় নিগ্রহ), সত্য ও ধৰ্ম সত্যত অমুরক্ত, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি, কারণ ব্যবহারেই দ্বিজ হয় ।”

সত্যং দমস্তপোদানমহিংসা ধর্মনিত্যতা ।

সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতি ন কুলং নৃপ ॥

শূদ্রেচৈতত্ত্ববেদ্যং দ্বিজৈ তচ্চ ন বিদ্যতে ।

ন বৈ শূদ্রোভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥

(মহাভারত, বনপর্ব)

“সত্য, দম, তপ, দান, অহিংসা ও ধর্মনিত্যতাই পুরুষার্থ সাধক । জাতি ও কুল কোন কার্যকারক নহে । যদি কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া শূদ্রবৎ আচরণ করে, তাহাকে শূদ্র এবং যদি কোন ব্যক্তি শূদ্রকুলে জন্ম লইয়া আচারনিষ্ঠ হয়, তবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় ।”

এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে এত অল্পকূল শ্লোক নিবদ্ধ আছে, যাহা লিপিবদ্ধ করিতে গেলে এই অধ্যায়টিই স্বতন্ত্র একখানা গ্রন্থ হইয়া পড়ে । আবার শাস্ত্র না দেখাইতে চেষ্টা পাইলেও সমাজপতি পণ্ডিতমণ্ডলী, আমাদের কথায় মোটেই কর্ণপাত করিবেন না বা তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিবেন না । কাজেই বাধ্য হইয়া, আমরাদিগকে অনর্থক কতকগুলি পত্রাঙ্ক অপব্যয় করিতে ও অযথা লেখনী সঞ্চালন করিয়া বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইতেছে মাত্র ।

মহাভারতের অনুশাসন পার্কের ১৪ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে,—

কর্মভিঃ শুচিভিদেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

শূদ্রোহপি দ্বিজবৎসেব্য ইতি ব্রহ্মানুশাসনম্ ॥ ৪৮

স্বভাব কর্ম চ শুভং যত্র শূদ্রোহপি তিষ্ঠতি ।

বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্বৈবিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ ॥ ৪৯

ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন স্মৃতং ন চ সন্ততিঃ ।

কারণানি দ্বিজদ্বন্দ্ব বৃন্তমেব তু কারণম্ ॥ ৫০

পর্কোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃন্তেন চ বিধীয়তে ।

বৃন্তেস্থিতস্ত শূদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি ॥ ৫১

“ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, শূদ্রও যদি পবিত্র কার্যানুষ্ঠান দ্বারা বিণ্ডুদ্বাভ্যা ও জ্বিতেন্দ্রিয় হয়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণের স্থায় সমাদর করা কর্তব্য । ফলতঃ আমার (শিবের) মতে শূদ্র গচ্ছরিত্র ও সংকর্মাধিত হইলে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা প্রশংসনীয় হয় । কেবল জন্ম, সংস্কার, শাস্ত্রজ্ঞান ও কুল ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে । সদাচার দ্বারা, সকলেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে । সদাচারী শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে ।” মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রও এই কথাই বলিতেছেন,—

শ্বপচোহপি কুলজ্ঞানী ব্রাহ্মণাদতিরিচ্যতে ।

কুলাচারবিহীনস্ত ব্রাহ্মণ শ্বপচাধমঃ ॥

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৪ উ, ৪২ শ্লোক)

“অর্থাৎ আচারনিষ্ঠ চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং আচারবিহীন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল অপেক্ষা নিকৃষ্ট ।”

মনুও বলিতেছেন,—তপোবীজপ্রভাবৈস্ত তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে ।

উৎকর্ষযোগকর্ষকঃ মনুযোঽপিহ জগত্যঃ ॥

(মনুসংহিতা—দশম অধ্যায়ঃ ৪২ শ্লোক)

“অর্থাৎ উক্ত কয়েক প্রকার জাতি যুগে যুগে তপস্তা প্রভাবে ও বীজোৎকর্ষে মনুষ্য মধ্যে যেমন জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তদৈপরীত্যে তাহাদের জাত্যপকর্ষও ঘটিয়া থাকে ।” এ বিষয়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ পরে উদাহরণ দ্বারা বিশদরূপে প্রদর্শন করিব । আমরা দেখাইব, কত জাতি ও কত পুরুষ সংকর্ম প্রভাবে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ-স্তরে সম্মানিত হইয়াছে ও অসং কস্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণেরাও কিরূপ অধোগতি লাভ করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ।

ব্রাহ্মণাদির শ্রেষ্ঠতা যে গুণকর্ম্মানুসারিণী এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেখান
যাইতে পারে ।

“সর্বশ্রু প্রভবো বিপ্রাঃ শ্রুতাধ্যয়নশালিনঃ ।

তেভ্যঃ ক্রিয়াপরাঃ শ্রেষ্ঠান্তেভ্যোঃ প্যাধ্যবিত্তমাঃ ॥ ১৯৯

ন বিদ্যা কেবলয়া তপসা বাপি পাত্রতা ।

যত্র বৃত্তমিমে চোভে তদ্ধি পাত্রং প্রকীর্তিতম্ ॥ ২০০

(যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা)

“কর্ম্ম এবং জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণগণ সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।
ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ উৎকৃষ্ট, তাহার মধ্যে কর্ম্মগণ
প্রধান এবং তাহাদিগের মধ্যেও উত্তম আত্মতত্ত্বজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ । কেবল
বিদ্যা, কেবল তপশ্চা, (কেবল কর্ম্ম, অথবা কেবল জাতি) দ্বারা সম্পূর্ণ
পাত্র হয় না । কিন্তু যাহার কর্ম্ম এবং বিদ্যা-তপশ্চা এই উভয় আছে, পূর্বে
ঋষিগণ তাহাকেই সম্পূর্ণ পাত্র বলিয়াছেন ।”

পুনশ্চ মহাভারতে—ভরদ্বাজঃ উবাচ—

ব্রাহ্মণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিয়োবা দ্বিজোত্তম ।

বৈশ্বঃ শূদ্রশ্চ বিপ্রার্শে তদ্ব্রহ্মি বদতাম্বরং ॥ ২১ ॥

ভৃগুরুবাচ—

জাত কর্ম্মাদিভির্যস্ব সংস্কারৈঃ সংস্কৃত শুচিঃ

বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ যট্শুকর্ম্মস্ববস্থিতঃ ॥ ২২ ॥

শৌচাচারস্থিতঃ সমাগ্ বিবসানী গুরুপ্রিয়ঃ ॥

নিত্যব্রতো সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ২৩ ॥

সত্যং দানমথাজ্জোহ অনৃশংস্ত্রপ ঘৃণা ।

তপশ্চ দৃশতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৪ ॥

ক্ষত্রজং সেবতে কৰ্ম বেদাধ্যয়ন সম্ভতঃ ।
 দানাদানরতিৰ্যজ্ঞ স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে ॥ ২৫ ॥
 বিশত্যাগু পশুভ্যাশ্চ কৃষাদান রতিঃ শুচিঃ ।
 বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সঙ্গিতঃ ॥ ২৬ ॥
 সৰ্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সৰ্বকৰ্মকরোহশুচিঃ ।
 ত্যক্তবেদস্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥ ২৭ ॥

শাস্তিপৰ্ক, ভৃগুভরদ্বাজ সংবাদ ।

ভরদ্বাজ ঋষি ভৃগুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ কিরূপে হয়, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রই বা কিরূপে হয় আমাকে বলুন—ভৃগু কহিলেন, জাতকর্ম প্রভৃতি সংস্কার দ্বারা যে ব্যক্তি সংস্কৃত ও শুচি, বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ষট্ কর্মশালী (সন্ধ্যাবন্দনা জপ হোম দেবপূজা অতিথি সংকার এই ছয়টি অথবা যাজন-যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন সংপাত্রে দান ও সংপ্রতিগ্রহ এই ছয়টি ষট্ কর্ম) যে শৌচাচারস্থ, দেবপ্রসাদভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্য ব্রতপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ এই সকল গুণ থাকিলে ব্রাহ্মণ হয় । সত্য, দান অর্দ্রোহ, অনুশংসতা লজ্জা (কুর্বার্য্য করিতে লজ্জা), ঘৃণা (নিন্দনীয় কর্মে ঘৃণা) ও তপস্তা যাহাতে দেখিবে, সেই ব্রাহ্মণ জানিবে । যিনি বেদাধ্যয়ন করেন এবং ক্ষত্রোচিত বিপন্ন রক্ষায় দীক্ষিত হইবেন, সংপাত্রে দান ও প্রজার নিকট হইতে যোগ্যকর গ্রহণ করেন, তিনি ক্ষত্রিয় । বৈশ্যও বেদাধ্যায়ী হইবে । পশুরক্ষা, কৃষি, ধনোপার্জন, প্রিয় ও শুচি হওয়া বৈশ্যের লক্ষণ । যে ব্যক্তির সকল খাদ্য গ্রাহ্য অর্থাৎ খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, যাহার ভাল মন্দ কর্মের বিচার নাই এবং যে বেদত্যাগী আচার-রহিত, সে শূদ্র বলিয়া কথিত হয় ।

যোহধীত্যবিধিবদেদং বেদান্তং ন বিচারয়েৎ ।

স সান্বয়ঃ শূদ্রকল্পঃ স পাদ্যং ন প্রপদ্যতে ॥ ২৮ ॥ উশনঃ সংহিতা

“যে ব্যক্তি যথাবিধি বেদাধ্যয়ন করিয়া পশ্চাৎ বেদান্ত (উপনিষদ্) আলোচনা না করে, সে সবংশে শূদ্রবৎ হইবে এবং পাদ প্রক্ষালন জল বা প্রাপ্য পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে না । (ঐ)

“এবং বেদং বেদৌ বেদান্ বা স্বীকুর্য্যাৎ ॥ ৩৪ ॥

ততো বেদাঙ্গানি ॥ ৩৫ ॥

যজ্ঞনধীতবেদোহন্যত্র শ্রমং কুর্যাদসৌ সসন্তানঃ শূদ্রত্বমেতি ॥ ৩৬

মাতুরগ্রে বিজননং দ্বিতীয়ং গোঞ্জীবন্ধনম্ ॥ ৩৭ ॥

তত্রাশ্র মাতা সাবিত্রী ভবতি পিতাহাচার্য্যঃ ॥ ৩৮ ॥

এতেনৈব তেষাং দ্বিজত্বম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রাচ্যোঞ্জীবন্ধনাদ্ধিজঃ শূদ্রসমো ভবতি ॥ ৪০ ॥

এইরূপে একবেদ দুইবেদ বা তিনবেদ আশ্রিত করিবে। অনন্তর বেদাঙ্গ সকল (আশ্রিত করিবে)। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয় পরিশ্রম করে, সে সসন্তানে শূদ্রতা প্রাপ্ত হয়। অগ্রে মাতার নিকট হইতে জন্ম, গোঞ্জীবন্ধন অর্থাৎ উপনয়ন দ্বিতীয় জন্ম; এই জন্মে, গায়ত্রী মাতা, এবং আচার্য্য পিতা হন। এই জন্মই তাহাদিগের দ্বিজত্ব। গোঞ্জীবন্ধনের পূর্বে দ্বিজ শূদ্রতুল্য থাকে।

এই সমস্ত শ্লোকে সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইল যে কর্মভেদেই ব্রাহ্মণাদির ভেদ। জন্মগত ভেদের কোনও কথা এ সকল স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গেল না। যদি ঔণকশ্মই বর্ণভেদের কারণ হয়, জন্মের সহিত উহার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে সমাজের আদিম অবস্থায় বর্ণভেদের কারণ পাওয়া কঠিন এবং বর্তমান জাতিভেদ বুঝা। মানব স্ব স্ব কর্ম অনুসারেই যদি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি হইল, তবে এ সকল কর্ম করিবার পূর্বে সে কি ছিল? সৃষ্টির আদি অন্ত নাই, সুতরাং বলিতে হইতেছে, প্রথমে সকলেই সমান ছিল, বর্ণভেদ ছিল না; স্বীয় কর্মানুসারে মনুষ্য ব্রাহ্মণাদি

লাভ করিয়াছে এবং তাহা পরবর্তী সময়ের সামাজিক নির্দেশ মাত্র । সমাজে সম্মান, স্নাতন্ত্র্য রক্ষা, উচ্চনীচতার পরিমাণ অনুসারে যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা ও অধিকার লাভ, দোষের প্রশ্রয় না দিয়া বরং দোষীকে অবনত করিয়া শাসন করা ইত্যাদি কতকগুলি যুক্তি দ্বারাই জাতি বা বর্ণভেদ সমাজে সমর্থিত হইয়াছিল । বস্তুতঃ জাতিভেদ প্রথমে ছিল না ।

পূর্বেই বলিয়াছি, —

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ ।

ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥ ১০

(মহাভারত, শান্তিপর্ব)

বর্ণ বা জাতির কোনও বিশেষ অর্থার্থ পার্থক্য নাই—সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়, তৎকর্তৃক পূর্বে সৃষ্ট । কর্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে ।

বাস্তবিকও একপ্রকারের বহু ব্যক্তি বহু কার্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা লাভ করিলে উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের জন্ত সমাজ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হয় । নচেৎ সমাজে উৎশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইতে পারে । সমাজের মজ্জাগত দোষ দূর করিতে হইলে উত্তম অধম বিভাগ আবশ্যক হয় । মহাভারত ও ভাগবতের মতে, বর্ণভেদ সমাজ শাসন বা সম্বন্ধনের জন্ত আবশ্যক বলিয়াই হইয়াছিল, এমন মনে হয় । ক্রমে এই গুণ ও কর্মগত জাতিভেদ, জাতিগত বা বংশানুক্রমিক হইয়া সমাজের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে ।

গুণগত জাতিভেদ সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুবিধ শ্লোক নিবদ্ধ আছে । এবিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র ।

বনপর্বের মহাত্মা যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে, সকল মনুষ্যেরই জন্ম মৃত্যু ও সন্তানোৎপত্তি একইরূপ । আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, যাহার চরিত্র পবিত্র তিনিই ব্রাহ্মণ ।

যুধিষ্ঠিরের মত বুদ্ধদেবও বলিয়াছেন যে, জন্ম বংশ বা জটাজুট দ্বারা কেহই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না । যাহাতে সততা ও ধর্ম বিরাজমান তিনিই ব্রাহ্মণ ।

যে মনু শূদ্রের উপর একেবারে খড়্গহস্ত ছিলেন, যিনি শূদ্রদিগকে সর্বপ্রকার সামাজিক সুখাস্বাদন হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, যিনি ধর্মের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বেপার্জিত ধনের অধিকার প্রভৃতি সকল প্রকার অধিকার হইতেই তাহাদিগকে দূরে রাখিয়াছিলেন, তিনিও বলিতেছেন,—

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং ।

ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবস্ত বিদ্যাঐশ্চাৎ তথৈব চ ॥

(মনু দশম অধ্যায়, ৬৫ শ্লোক)

“এই ক্রমে যেক্রমে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়, তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়,—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ জনিবে ।”

শুক্লাচার্য্য বলিয়াছেন,—

ন জাতা ব্রাহ্মণাশ্চাত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য এব বা ।

ন শূদ্রো ন চ বা স্নেচেছা ভেদিতা গুণকর্ম্মভিঃ । (শুক্লনীতি)

সর্বৈ চোত্তরোত্তরং পরিচরয়ুরার্য্যানার্য্যায়ো-

র্কতিক্ষেপে কর্ম্মণঃ সাম্যং সাম্যম্ ।

(দশম অধ্যায়ঃ, গৌতম-সংহিতা ।)

“বর্ণগণ আপনার আপনার উর্দ্ধতন বর্ণের পরিচর্যা করিবে, কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য ছাড়িয়া দিলে সমুদয় আর্য্য ও অনার্য্য জাতির সর্বতোভাবে সাম্য হয় ।

অন্যত্রও উক্ত আছে—

জ্ঞানকর্ম্মোপাসনার্ভিদেবতারাদানে রতঃ ।

শান্তো দান্তো দয়ালুশ্চ ব্রাহ্মণশ্চ গুণৈঃ কৃতঃ । (শুক্লনীতি)

পূর্বে উক্ত হইয়াছে—

চাতুর্কণ্যং ময়া সৃষ্টং শুণকর্মভিগমঃ ।

(শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় ভাবদ্ব্যাক্য)

ভট্টমোক্ষমূলর—ধৃত ধর্মমূত্র বচনে আমরা দেখিতে পাই,—

ধর্মচর্য্যা জঘন্ত্যোবর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ ।

অধর্মচর্য্যা পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্ত্যং বর্ণমাপদ্যতে জাতি পরিবৃত্তৌ ॥

মহর্ষি আপস্তম্ব শূদ্রের প্রতি নির্ভর বিধি প্রণয়ন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন নাই, তথাপি তিনিও বলিতেছেন,—“ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অধর্মাচরণ দ্বারা পর পর বা একেবারে অধম জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সেইরূপ শূদ্র বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় ক্রিয়াবান হইলে পর পর বা একেবারে উচ্চ-জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।”

মনু অত্র এক স্থলে বলিতেছেন,—

জাতোনার্য্যামনার্য্যায়ানার্য্যাদার্য্যো ভবেদুত্তরৈঃ ।

“আর্য্য পিতা অনার্য্য মাতার পুত্রও শুণের দ্বারা আর্য্যই হইতে পারে ।” বস্তুতঃ ব্রাহ্মণকূলে জন্মিলেই যে ব্রাহ্মণ হইবে তাহার কোন অর্থ নাই ।

“অব্রতানামমজ্জাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্ ।

সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষদ্বং ন বিদ্যতে ॥ ১১৪ ॥

(দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ, মনুসংহিতা)

“যাহাদের কোন ব্রত নাই,—যাহাদের বেদাধ্যয়ন নাই, যাহারা জাতি-মাত্রে ব্রাহ্মণ এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি সমবেত হইলেও তাহাতে পরিষদ্ব নাই জানিবে । সেই পরিষদের উপদেশ গ্রাহ্য হইতে পারে না ।”

তৃতীয় অধ্যায় ।

শুণকর্মাগত জাতিভেদের কতিপয় উদাহরণ ।

শুণকর্ম সম্বন্ধে বিখ্যাতনাগা ব্যবস্থা-শাস্ত্রকার অত্রি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে “যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নযুক্ত ও অনিত্য সংসার-গোহ্মুক্ত সেই ব্রাহ্মণ । যে বীরধর্মী ও সর্ববিধ ক্ষত্রিয় কর্মী সেই ক্ষত্রিয় । যে কৃষি বাণিজ্য-গোরক্ষাকারী বিহিত বৈশ্যচারী, সেই বৈশ্য । যে মধু-মাংস-লবণ-বিক্রয়ী, অস্ত্র, অনয়ী সেই শূদ্র । আর যে সর্বধর্মবিবর্জিত, মহামূখ ও সর্বপ্রাণী হিংসাপরায়ণ, সেই চণ্ডাল । অপিচ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ একবাক্যে বলিতেছেন যে, স্বয়ংসমদের পৌত্র, শুনকের পুত্র শৌনক আপন পুত্রগণকে স্ব স্ব কর্মভেদে বিভক্ত করিলেন ।

যথা—বায়ুপুরাণঃ—

“পুত্রো স্বয়ংসমদস্ত শুনকে যস্ত শৌনকাঃ ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়ানৈচ বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ ॥

এতস্ত বংশসমুত্তা বিচিট্টৈঃ কর্মভির্বিজাঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণ,—

“স্বয়ংসমদস্ত শৌনকস্তাতুর্কর্গ্যং প্রবর্তয়িতাভুৎ ।”

হরিবংশ বায়ুপুরাণের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন । যথা,—

পুত্রস্বয়ংসমদস্তাপি শুনকো যস্ত শৌনকাঃ ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়ানৈচ বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈব চ ॥

(হরিবংশ ২৯ অধ্যায়)

স্বৎসমদের পুত্র পুত্রক, শুনকের পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিল। এক পিতার পুত্রগণ শুণকৰ্ম্মানুসারে বিভিন্ন বর্ণের প্রাপ্ত হইয়াছে। এই স্বৎসমদ বা গৃৎসমিত একজন সাধারণ ব্যক্তি নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ বায়ুপুরাণ ও হরিবংশে ইহার বিষয় বিখ্যাত হইয়াছে। ইনি বংশগৌরবে পুরাকালে সর্বাধিক খ্যাত ছিলেন। ইহার পিতৃপুত্রগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ; বিতথের পঞ্চপুত্র—সুহোত্র, সুহোত্র, গয়, গর্গ ও মহাত্মা কপিল। সুহোত্রের দুই পুত্র, কাশক ও রাজা গৃৎসমিত। ফলতঃ একই পিতার পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবার প্রমাণ ভুরি ভুরি প্রদর্শিত হইতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে;—ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব ঋষভের একশত পুত্রের মধ্যে একাশীতি জন কর্মতন্ত্র প্রণেতা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এবং কবি হবিঃ প্রভৃতি নয় জন পরমার্থ নিরাপক মুনি হইয়াছিলেন।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২)

“ঋগ্বেদে সরলভাবে একজন ঋষি বলিতেছেন,—দেখ আমি স্তোত্রকার, আমার পিতা চিকিৎসক, আমার মাতা প্রস্তরের উপর যবভর্জনকারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করিতেছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠীমধ্যে ভূণকামনায় ভিন্ন দিকে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধনকামনায় তোমার পরিচর্যা করিতেছি অতএব হে সোম। ইন্দের জন্ত ক্ষরিত হও। তাই রক্তেশ বাবু বলিতেছেন—যাহারা বৈদিক সময়ে জাতিভেদ প্রথা ছিলেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ই বলুন, যে পরিবারের পুত্র মাত্র প্রণেতা ঋষি, পিতা বৈদ্য এবং মাতা ময়দাওয়ালী তাঁহারা কোন জাতিভুক্ত?” বিশ্বময়ের বিষয় ইহাই যে, আর্য্য রীতিনীতির সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ছিল হইলেও প্রাচ্য জাপানে বর্তমান সময়ে ইহার অত্যন্ত সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে। একটি পরিবারে ৬টা সন্তান, সকলেরই কর্ম ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, কেহ হয়ত

চর্মকার, কেহ হয়ত ক্ষৌরকার, কেহ হয়ত অধ্যাপক, কেহ হয়ত সূত্রধর, কেহ হয়ত চিত্রকর, কেহ হয়ত দর্জি এবং কেহ হয়ত বস্ত্রবয়নকারী ; প্রাতে ছয় ভাই এক সঙ্গে আহরাদি করিয়া, যার যার কর্মক্ষেত্রে সে সে চলিয়া গেল । সারাদিন অতিবাহিত হইবার পর আবার পুনরায় সন্ধ্যাবেলায় ৬ ভাই একত্র হইল ও একত্রে পান ভোজনাদি করিল । বিবাহ প্রথাও তথায় ঐরূপ । কিন্তু পুরাণ সংহিতা, বেদবেদান্ত দর্শন বিজ্ঞানের জন্মভূমি বিধি ব্যবস্থা শাস্ত্রাদির উৎপত্তিস্থল ভারতে এ প্রথা একরূপ লুপ্ত প্রায় ।

গীতাভারতের বনপর্বাস্তগতঃ অঙ্গগার পর্বাদ্বায়ে লিখিত আছে ;—শূদ্র বংশজ হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণবংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয় এরূপ নহে । যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লক্ষিত হয় না তাহারাই শূদ্র । পূর্বে কেরল রাজ্যে ব্রাহ্মণ ছিল না । ভৃগুবংশাবতংশ ক্ষত্রিয়কুলারি পরশুরামের সাহায্যে কেরল দেশীয় ধীবরগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ।

অব্রাহ্মণ্যে তদাদেশে কৈবর্ত্যানুপ্রেক্ষ্য ভার্গবঃ ।

* * * যজ্ঞসূত্রমকল্পয়ৎ ।

স্থাপয়িত্ব স্বকীয়ে সঃ ক্ষেত্রে বিপ্রান্ প্রকল্পিতান্ ।

যামদগ্ন্য স্তদোবাচ সূত্ৰীতে নাস্তুরাত্মনা । (ঋন্দপুরাণ)

দার্শনিক মহর্ষি কণাদের জননী অনার্য্য জাতীয়া—তাহার নাম ওলকা ছিল । এই জন্মই কণাদ দর্শনের অন্ত নাম ওলক্যদর্শন । বশিষ্ঠ পত্নী অক্ষমালা শূদ্রা হইয়াও পরে ব্রাহ্মণী হইয়াছিলেন । য়েচ্ছরমণী শুকীর গর্ভে অসাধারণ জ্ঞানী ভারত বিখ্যাত শুকদেবের জন্ম । মহর্ষি বেদব্যাসের জননী সত্যবতী ধীবর কন্যা কুমারীকালীন পরাশরের ঔরসে যে সন্তান প্রসব করে, তিনিই সাধনা ও ক্ষমতাবলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

মহারাজা যযাতি ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানির গর্ভে যে দুইটা পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারাষ্ট ভারত বিখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশের আদিপুরুষ ।

আজিও যে গায়ত্রীর দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব রক্ষিত হইতেছে, সেই বেদমাতা গায়ত্রীর রচয়িতা বিখ্যামিত্র ব্রাহ্মণ-সন্তান নহেন, ক্ষত্রিয়ের সন্তান । তিনি তপশ্চাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ।

“করুমাং মানবাং আসন্ করুমাং ক্ষত্রজাতয়ঃ ।

উত্তরাপথগোষ্ঠারো ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মবৎসলাঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।২)

“মনুর পুত্র করুমা হইতে কারুমা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়, ইহারা ক্ষত্র-জাতীয় । ইহারা উত্তরা ও পথের রক্ষক, ব্রহ্মণ্য এবং ধর্ম্মবৎসল ছিল ।

“পৃথক্ হিংসয়িত্বাতু গুরোর্গাং জনমেজয় ।

শাপাং শূদ্রত্বমাপন্নঃ ।

(হরিবংশ ৯ম অধ্যায়)

মনুর পুত্র পৃথক রাজা গুরুর গোহত্যা করিয়া শাপবশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্দ ২য় অধ্যায়)

“নাভাগারিষ্ট পুত্রো দ্বৌ বৈশ্ণৌ ব্রাহ্মণতাং গতে ।”

(হরিবংশ ১১।৬৫৮)

নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্ণ হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্দ ২ অধ্যায়)

মৌদগল্য ও কান্দায়ণ গোত্রজ সমস্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বংশজাত । শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মুদগল হইতে ব্রাহ্মণ জাতির মৌদগল্য গোত্রসম্ভূত হইয়াছিল ।

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৯।২১)

মুদগলাচ্চ মৌদগল্যাঃ ক্ষত্রো পেতা দ্বিজাতয়ো বভূবঃ ।

(বিষ্ণুপুরাণ)

মুগ্ধলশ্চ তু দায়াদো মৌদগল্যঃ সুমহাযশাঃ ।

এতে সর্বো মহাত্মানো ক্ষত্রো পেতা দ্বিজাভয়ঃ ॥

ভর্ম্যাস্থের পুত্র মুগ্ধল, মুগ্ধলের পুত্র রাজা দিবোদাস, দিবোদাসের পুত্র
মিত্রায়ু ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন । (হরিবংশ)

পুষ্করবার বংশে রস্ত নামক নৃপের রভস নামক পুত্র, তাহার বংশে গভীর
জন্মিয়াছিলেন, সেই গভীরের বংশে ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিলেন ।” (ভাগবত)

শুধু গুণ ও কর্মদ্বারাই বশিষ্ঠ ব্যাস নারদ শুকদেব মন্দপাল কণাদ
প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত ঋষিগণ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন । ইহাদের মাতৃগণ
সকলেই নীচ জাতীয় শূদ্রকুল-সমুৎপন্ন ।

গর্গ হইতে শিনি উৎপন্ন হইলেন । শিনির পুত্র গার্গ্য । “গার্গ্য ক্ষত্রিয়
হইতে উৎপন্ন হইলেও ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ।”

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ, ১২শ অধ্যায়)

গর্গাৎ শিনিঃ ততোঃ গার্গ্যাঃ শৈনেয়াঃ

ক্ষত্রো পেতা দ্বিজাতয়ো বভূবঃ । (বিষ্ণুপুরাণ)

ক্ষত্রিয় মহাবীৰ্য্য হইতে ছরিত ক্ষয় উৎপন্ন হন । ছরিত ক্ষয়ের
তিনটি পুত্র ত্রয়্যাক্ষণি, কবি ও পুষ্করাক্ষণি, তিন জন্মই ব্রাহ্মণত্ব লাভ
করিয়াছিলেন ।

ছরিত ক্ষয়ো মহাবীৰ্য্যাৎ তশ্চ ত্রয়্যাক্ষণিঃ কবিঃ ।

পুষ্করাক্ষণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণ গতিং গতাঃ ॥ (ভাগবত)

যযাতি বংশীয় ঋতেয়ুর সন্তান রত্নিনার, তাঁহার পুত্র তংসু, অপ্রতিরথ
এবং ঋব । অপ্রতিরথের বংশে কধ জন্মগ্রহণ করে । কধের পুত্র মেধাতিথি
হইতে কধায়ন ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হয় ।

ঋতেয়োঃ রত্নিনারঃ পুত্রোহভূৎ । তং সূং

অপ্রতিরথাং ঋবঞ্চ রত্নিনারঃ পুত্রান্ অবাপ ।

অপ্রতিরূপাং কথঃ তস্তাপি মেধাতিথিঃ ।

যতঃ কথায়না দ্বিজাঃ বভূবুঃ । (বিষ্ণুপুরাণ)

ধাতেশ্বর পুত্র রত্নিনার । রত্নিনারের স্মৃতি, এবং ও অপ্রতিরূপা,—
এই তিন পুত্র । অপ্রতিরূপের পুত্র কথ, কথের পুত্র মেধাতিথি । এই
মেধাতিথি হইতে প্রকল্প প্রভৃতি দ্বিজগণ উৎপন্ন হন । (ভাগবত—
নবম স্কন্দ)

আর্য্যদিগের প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে জানিতে পারা যায় যে, দশ
প্রজাপতি হইতে সমুদয় মনুষ্য সৃষ্টি হইয়াছে । সূর্য্যবংশের আদি রাজা
ইক্ষ্বাকুর পিতৃপিতামহাদির অনুসন্ধান করিলে মরীচির বংশোদ্ভব প্রমাণ
হয় । মরীচির পুত্র কশ্যপ, তৎপুত্র বিবস্বান, তাঁহার পুত্র সাবর্ণি মনু, তাঁহার
পুত্র ইক্ষ্বাকু এবং সেই ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশীয় রাজস্রগণ জন্মিয়া-
ছিলেন । চন্দ্রবংশ সম্বন্ধেও ঐ একরূপই । চন্দ্রবংশের আদি রাজা
পুরুরবা, তৎপিতা বুধ (ইক্ষ্বাকু রাজভগিনী ইলা তাঁহার মাতা), বুধের
পিতা চন্দ্র, চন্দ্র আবার অত্রির পুত্র । সুতরাং আমরা স্পষ্টই দেখিতে
পাইলাম, প্রজাপতিগণ হইতেই সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের সমুদয় ক্ষত্রিয় রাজ্যগণের
উৎপত্তি ।

স্বায়ম্ভুব মনু হইতে প্রিয়ব্রত ও ভক্তচূড়ামণি এবং পিতা উত্তানপাদ
নামক দুই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

বিষ্ণুপুরাণে ৪র্থ অধ্যায়ে আছে,—মনুর পুত্রগণ মধ্যে পৃথক শূদ্র,
নেদিষ্ঠের পুত্র বৈশ্য, অঙ্গীর ক্ষত্রিয় রথীতরের ভার্য্যাতে জাত পুত্রগণ
ব্রাহ্মণ । যুবনাশ্ব রাজার পুত্র হরিত, তৎপুত্র আঙ্গিরস ব্রাহ্মণ । যবনাদি
য়েচ্ছতা প্রাপ্ত । মেধাতিথি ক্ষত্রিয় তৎপুত্রেরা ব্রাহ্মণ, গর্গ ক্ষত্রিয় তৎপুত্র
শিনি ও তৎপুত্রগণও ব্রাহ্মণ । উরুক্ষয় ক্ষত্রিয়, তাঁহার তিন পুত্রই পরে
ব্রাহ্মণ হয় । মুদগা ক্ষত্রিয় তৎপুত্রগণ ব্রাহ্মণ ।

হস্তিনাপুর নির্মাতা হস্তীর তিন পুত্র, অজমীঢ় দ্বিগীঢ় ও পুরুমীঢ় ।

অজমীঢ়ের বংশে প্রিয় মেধাদি দ্বিজগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।

অপিচ,—কচিরামের পুত্র পার, পারের পুত্র পৃথুসেন । পারের নীপ নামে যে আর এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার একশত পুত্র হয় । ঐ নীপই শুককন্যা কুত্বীর গর্ভে ব্রহ্মদত্তকে উৎপন্ন করেন । সেই ব্রহ্মদত্ত যোগী ।

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্দ—২১শ অধ্যায়)

“কক্ষিবান্, বৈদিক ঋষিদিগের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ঋষি । তিনি কলিঙ্গ দেশীয় রাজপুত্র এবং ক্ষত্রিয় । ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৬ হইতে ১২৫ এবং নবম মণ্ডলের ৭৪ সূক্ত তাঁহার রচিত ।”

কবজ ঐলুয ঋষি একজন শূদ্র । ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৩৪ সূক্ত এই ঋষির প্রণীত । যে হীন বাচক শূদ্রের পক্ষে বেদ প্রণয়ন দূরে থাকুক, বেদ পাঠ বা শ্রবণের অধিকারও ছিল না বলিয়া বর্ণিত আছে, সেই শূদ্রই বেদের শ্রেষ্ঠ ঋগ্বেদের প্রণেতা । এই ঋষি ব্রাহ্মণদিগের সহিত কলহ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন । (কৌষতকী ‘ব্রাহ্মণ’) ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যাইতেছে যে, জন্মে ব্রাহ্মণ না হইয়াও লোকে গুণবলে ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিত এবং হীনকর্মদ্বারা হীনবর্ণত্ব প্রাপ্ত হইত । কোন যজ্ঞে ব্রাহ্মণের নির্দিষ্ট ভাগ ক্ষত্রিয় ভোজন করিতে পাইলে, তাঁহার সন্তানেরা ব্রাহ্মণ গুণবিশিষ্ট হইয়া প্রতিগ্রহ সমর্থ সোম পিপাসু, ক্ষুধার্ত্ত, সর্বত্রগামী হইতেন । দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তাঁহাদের সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব জন্মিত । কোন ক্ষত্রিয় যজ্ঞে বৈশ্যের অংশ ভোজন করিলে, তদংশীয়েরা বৈশ্য গুণোপেত হইয়া জন্মিত, রাজাকে কর প্রদান করিত এবং তাহার দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ বৈশ্য জাতির উপযুক্ত হইত । যদি যজ্ঞে ক্ষত্রিয় শূদ্রের অংশ গ্রহণ করিত তাহার সন্তানেরা

শূদ্র-গুণোপেত হইয়া জন্মিত । তাহারা পরের সেবা করিত এবং প্রভুর ইচ্ছানুসারে তাড়িত ও প্রহারিত হইত । দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষে তাহারা শূদ্র শ্রেণীর যোগ্য হইত ।” (৩রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই)

“বিদেহরাজ রাজর্ষি জনক যাজ্ঞবল্যকে ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত উপনিষদ-তত্ত্ব শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন । যাজ্ঞবল্য মহা আনন্দিত হইয়া রাজাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন । তাহাতে জনক রাজা বলিলেন,—‘আমি যাহা অভিলষ্য করিতেছি আমাকে তাহা প্রদান করুন ।’ তদবধি জনক ব্রাহ্মণ হইলেন ।” (শতপথ ব্রাহ্মণ)

“ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ না করিয়াও অনেকে বিদ্যা জ্ঞান কর্ম ও যশঃ প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । জনক তাহার অন্ততম উদাহরণ । পরন্তু এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই । ‘দ্যুতক্লীড়াসক্ত, দামীপুত্র, অত্রাহ্মণ আমাদের মধ্যে আসিয়া যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত হইবে ।’ এই বলিয়া ঋষিগণ ইন্দ্ৰের পুত্র কাকযকে যজ্ঞীয় ভূমি হইতে অপমানিত করিয়া বিতাড়িত করিয়াছিলেন । কিন্তু দেবতাগণ কাকযকে জানিতেন এবং কাকযও দেবতাদিগকে জানিতেন ; তাই কাকয ঋষি মধ্যে গণ্য হইলেন ।

(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)

ক্ষত্রিয় পুরুষ বংশ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে একস্থানে লিখিত আছে,—“এই বংশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছেন । অনেক রাজর্ষি এই বংশকে পবিত্র করিয়াছেন । কলিযুগে ক্ষেমকের পর এই বংশলোপ পাইবে ।”

বিষ্ণু পুরাণের অন্তর্ভুক্ত দেখিতে পাওয়া যায়,—এই বংশে গর্গের জন্ম । গর্গ হইতে সিবির জন্ম । তাঁহা হইতে গার্গ্য ও মৈবদেবের জন্ম । গার্গ্য ও মৈবেরা ক্ষত্রিয়গুণবিশিষ্ট হইয়াও অবশেষে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ।

উক্ত পুরাণের অন্তর্ভুক্ত দৃষ্ট হয়,—গর্গের ভ্রাতা মহাবীরের তিন পৌত্র ত্র্যম্বক, পুষ্করি এবং কপি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ।

“মৎস্যপুরাণে ৯১ জন বৈদিক ঋষির নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু সেই পুরাণের ১৩২ অধ্যায়ে আবার লিখিত আছে “এই ৯১ জন ব্যক্তি কর্তৃক ঋকসমূহ প্রণীত বা সৃষ্ট হইয়াছিল । এই সকল ব্যক্তিব্যক্তি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিলেন ; তাঁহারা ঋষিদিগের সন্তান, ঋষিকেরা বৈদিক ঋষিগণের সন্তান ।

মহাভারতে লিখিত আছে,—

শূদ্রেচৈব ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজৈ তচ্চ ন বিদ্যতে ।

ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মনো ন চ ব্রাহ্মণঃ ॥

ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি কেহ শূদ্রের স্থায় লক্ষণযুক্ত হয় তাহা হইলে সে শূদ্ররূপে পরিগণিত হইবে, এবং যদি কেহ শূদ্রবংশে জন্মিয়াও ব্রাহ্মণের লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে ।

তির্য্যগজাতিসম্ভূত ধায়াশূদ্র বেদবিজ্ঞানাदि দ্বারা কিরূপে ঋষিত্ব লাভ করিয়া সর্বজনের অর্চনীয় হইয়াছিলেন তাহা শাস্ত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন ।

গনুসংহিতাই পুনরায় গুণকর্ম সম্বন্ধে কি বলিতেছেন—শ্রবণ করুন ।

যোহনধীত্য দ্বিজো বেদগচ্ছত্ কুরুতে শ্রমম্ ।

স জীবনেন ব শূদ্রত্বমাপ্ত গচ্ছতি সাধয়ঃ ॥

“যে সকল দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্ত্র অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যাदि লাভে যত্নবান হয়, তাহারা জীবিতাবস্থাতেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় ।”

ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণত্ব লাভ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের ৯২।১৭ শ্লোকে কথিত হইয়াছে,—

“ধৃষ্টা দ্বীপ্তি মভূৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ ।”

মনুর পুত্র ধৃষ্ট, তাহা হইতেই ধাষ্ট্র নামক ক্ষত্রিয় বংশের উৎপত্তি হয় ।
ধাষ্ট্রগণ ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন ।

“বিনাসুষ্ঠানে একজন ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ হইবার উপাখ্যান এইরূপে
বর্ণিত আছে,—বীতহব্যের পুত্রগণ কানীরাজ দিবোদাসকে আক্রমণ করেন ।
সেই যুদ্ধে কানীরাজের আত্মীয়গণ প্রাণত্যাগ করেন । রাজা দিবোদাস
ভরদ্বাজের আশ্রমে গিয়া বাস করিতে থাকেন । ভরদ্বাজ দিবোদাসের জন্ত
এক যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে প্রতর্দন নামে দিবোদাসের এক পুত্র জন্মিল ।
যথাকালে প্রতর্দন পিতাকর্তৃক বীতহব্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন ।
বীতহব্য পলায়ন করতঃ মহর্ষি ভৃগুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । প্রতর্দন
তাহা জানিতে পারিয়া ভৃগুর আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং ক্ষত্রিয়
বীতহব্যকে দেখাইয়া দিতে বলিলেন । ভৃগু মিথ্যা করিয়া বলিলেন—,
“এখানে কোন ক্ষত্রিয় নাই ।” প্রতর্দন প্রস্থান করিলেন । কিন্তু ভৃগুর
কথায় ক্ষত্রিয় বীতহব্য সেই অবধি ব্রাহ্মণ হইলেন ।”

অন্য একটি দৃষ্টান্ত দেখুন,—

‘বৎসশ্চ বৎসভূমিস্তু ভার্গভূমিস্তু ভার্গবাৎ ।

এতেতদঙ্গিরসঃ পুত্রাজাতা বংশেহথভার্গবে ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ ।

বৎশ হইতে বৎশভূমি এবং ভার্গব হইতে ভার্গভূমি । ভার্গবের বংশে
অঙ্গিরস পুত্রগণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ব ও শূদ্রগণ জন্মগ্রহণ করেন ।

মনু ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব লাভের সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

“শনকৈশ্চ ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ ।

বৃষলভ্বং গত্বা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেন চ ॥ ৪৩ ॥

পৌণ্ড্রকান্ধেচাঁড়বিড়া কান্বোজাজবনাঃ শকাঃ

পারদাপহবাস্তীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥ ৪৪ ॥

মুখবাহুকপাজ্জানাং যালোকে জাতয়ো বহিঃ ।

ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সৰ্ব্বৈ তে দম্ভবঃ স্মৃতাঃ” ॥ ৪৫ ॥

১০ম অধ্যায়, মনুসংহিতা ।

বক্ষগাণ ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি সংস্কারাভাবে এবং যজনাধ্যয়নাদির অভাবে ক্রমশঃ শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছেন । ৪৩ । “পৌণ্ড্রক” ঔড়্র জাতি, কম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহুব, চীন, কিরাত, দরদ এবং ‘খশ’ এই কয়েক দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্বোক্ত কর্মদোষে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে । ৪৪ । ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্রিয়া লোপাদি কারণে যাহারা বাহ্যজাতি বলিয়া পরিগণিত হয়,—সাধুভাষীই হউক আর ম্লেচ্ছভাষীই হউক উহারা দম্ভ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

প্রাচীন কালে সত্যপ্রিয়তা, বিদ্যাবত্তা ও তত্ত্ব জ্ঞানের উপরেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ নির্ভর করিত । এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি মনোরম উপখ্যান আছে নিয়ে তাহা লিপিবদ্ধ হইল ।

জাবালার পুত্র সত্যকাম একদিন মাতাকে বলিল “মা ! আমি ব্রহ্মচারী হইব, কোন্ বংশে আমার জন্ম ও আমি কোন্ গোত্রীয় ?” মাতা সে কথার উত্তর দিতে পারিলেন না । তিনি कहিলেন “যৌবন কালে আমি যখন বিভিন্ন লোকের দাস্তবৃত্তি করিতাম তুমি সেই সময় হইয়াছিলে—কাহার ঔরসে যে তোমার জন্ম তাহা আমি জানি না । তোমার নাম সত্যকাম, আমার নাম জবালা । তুমি এখন হইতে সত্যকাম জাবাল বলিয়া আত্মপরিচয় দিও ।

সত্যকাম গোতমের নিকট উপনীত হইয়া ব্রহ্মচারী হইবার সঙ্কল্প জানাইল । কিন্তু গোতম কর্তৃক বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইলে সত্যকাম মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল—তাহাই বলিল । সত্যকামের সত্য নিষ্ঠায় পরম জ্ঞানী মহর্ষি গোতম মহা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন :—

“ত্বং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিধক্ত মহতি

সমিধং সোম্যাহরোপজ্ঞা নেয্যেন সত্যদগা । ইত্যাদি

(ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৪র্থ অধ্যায়)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ভিন্ন এমন করিয়া আর কেহ সত্য কথা বলিতে পারে না । তুমি সমিধ আহরণ কর, আমি তোমাকে উপনীত করিব । সেই অবধি সত্যকাম ব্রাহ্মণ হইল ।

এস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে সত্যই ব্রাহ্মণত্ব লাভের একমাত্র উপায় ছিল । সত্যকামের জাতি বা বংশের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করা হয় নাই । বালক সত্য কথা বলিল, তামনি তাহাকে ব্রহ্মচারী করিয়া লওয়া লইল । পরে তিনি একজন মহর্ষি হইয়াছিলেন । অজ্ঞাতকুলশীল দাসী পুত্রও যখন ঋষি হইতে পারিয়াছিলেন, তখন প্রাচীন হিন্দুধর্মের উদারতা সন্দ্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না । ফলতঃ যাহাদের পিতৃনির্গম না হয়, তাহাদের স্বীয় স্বীয় কর্ম দ্বারাই কেবল বর্ণ নির্ণীত হইয়া থাকে । যথা মনুসংহিতায় ১০ম অধ্যায় ৪০ শ্লোকে আছে,—

প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য বা বেদিতব্যঃ স্বকর্মভিঃ ।

এইরূপে আমরা ভুরি ভুরি উদাহরণ প্রদর্শনপূর্বক গুণকর্মানুযায়ী জাতি বিভাগের সমর্থন করিতে পারি ; কিন্তু তাহা বাছল্যমাত্র । কেমনা বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল । কে না জানে, গুণ ও কর্মানুযায়ী স্মৃত পুত্র কণ ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, দ্রোণাচার্য্য অশ্বখামা কুপাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয় শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন । আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করি না । অতঃপর বিবাহ ও আহার সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবে ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

বিবাহ ।

বিবাহ । অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের কথা আর্য্য শাস্ত্রে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে । উচ্চ জাতীয় পুরুষ ও নিম্ন জাতীয়া স্ত্রীলোকে যে বিবাহ তাহাকে অনুলোম বিবাহ বলে । প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু অনুলোম বিবাহের বিধি ছিল । প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ সত্ত্বেও আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই প্রতিলোমজ রোমহর্ষণ বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন । যখন নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তখন বেদব্যাস শিষ্য রোমহর্ষণ বিপ্রগণ মধ্যে উচ্চ আসনে উপবিষ্ট ছিলেন । (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৭৮।১৩, ১৪)

পূর্বে ভারত সমাজে অসবর্ণ বিবাহ অবাধে প্রচলিত ছিল । আমরা এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ নানা শাস্ত্র হইতে ক্রমশঃ প্রদর্শন করিয়া আগাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব ।

“তিস্রস্ত্ব ভার্য্যা বিপ্রস্ত্ব দ্বৈ ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্ত্ব তু ॥ ৬

একৈব ভার্য্যা বৈশ্যস্ত্ব তথা শূদ্রস্ত্ব কীর্তিতা ।

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ব্রাহ্মণস্ত্ব প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৭

ক্ষত্রিয়া চৈব বৈশ্যা চ ক্ষত্রিয়স্ত্ব বিধীয়তে ।

বৈশৈশ্চৈব ভার্য্যা বৈশ্যস্ত্ব শূদ্রা শূদ্রস্ত্ব কীর্তিতা ॥ ৮

* * * *

পাণিগ্রাহ্যঃ সবর্ণাস্থ গৃহীয়াৎ ক্ষত্রিয়া শরম্ ।

বৈশ্যা প্রতোদমাদদ্যাঽদ্বৈদলে তু দ্বিজন্মনঃ ॥ ১৪ । চতুর্থ অধ্যায় ।

ব্রাহ্মণের তিনজাতি কন্যা ভাৰ্য্যা, ক্ষত্রিয়ের দুইজাতি কন্যা ও বৈশ্যের একজাতীয়া কন্যা ভাৰ্য্যা হইবে । শূদ্রের একজাতীয়া কন্যা ভাৰ্য্যা হইবে ।

ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা, এই দুইজাতীয়া, বৈশ্যগণের বৈশ্যকন্যা মাত্র, শূদ্রগণের শূদ্রকন্যা মাত্র ।”

মহর্ষি ব্যাসও ঐ কথা সমর্থন করিয়া বলিতেছেন :—

“উঢ়ায়াং হি সৰ্বণায়াগন্থাং বা কামমুদ্বহেৎ
তন্ত্ৰামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সৰ্বণাং প্রেহীয়াতে ॥ ১০
উদ্বহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্ণাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো বিশাম্ ।”

(দ্বিতীয় অধ্যায়, ব্যাসসংহিতা ।)

“সৰ্বণা বিবাহ করিয়া ইচ্ছা হইলে অন্তৰ্গণ্যাকেও বিবাহ করিতে পারে । তাহা হইলে পূৰ্ব পরিণীতা সৰ্বণা স্ত্রীর গৰ্ভসম্ভূত পুত্র অসৰ্বণ হইবে না । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কন্যা এবং বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতে পারেন, ক্ষত্রিয়ও বৈশ্যকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে এবং বৈশ্যও শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে পারে ।”

বিষ্ণুসংহিতায় উক্ত হইতেছে :—

“অথ ব্রাহ্মণস্ত বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভাৰ্য্যা ভবন্তি ॥ ১ ॥
তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্ত ॥ ২ ॥ দ্বৈ বৈশ্যস্ত ॥ ৩ ॥ একা শূদ্রস্ত ॥ ৪ ॥
তাসাং সৰ্বণাবেদনে পাণি গ্রাহঃ ॥ ৫ ॥
অসৰ্বণা বেদনে শরঃ ক্ষত্রিয়কন্যায়া ॥ ৬ ॥
প্রতৌদো বৈশ্যকন্যায়া ॥ ৭ ॥ বসনদশান্তঃ শূদ্রকন্যায়া ॥ ৮

চতুর্বিংশশোহধ্যায়ঃ ।

ভগবান্ বিষ্ণু পুনরায় বর্ণিতেছেন,—

“সবর্ণাস্থ বহুভার্য্যাস্থ বিদ্যমানাস্থ

জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্য্যং কুর্য্যাৎ ॥ ১

মিশ্রাস্থ চ কনিষ্ঠয়াপি সমানবর্ণয়া ॥ ২

সমানবর্ণয়া অভাবে ত্বনস্তরয়েবাপদি চ ॥ ৩

“সবর্ণা বহুপত্নী বিদ্যমান থাকিলে জ্যেষ্ঠা (অর্থাৎ তন্মধ্যে প্রথম পরিণীতা) ভার্য্যার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে। মিশ্রা (অর্থাৎ সবর্ণা অসবর্ণা) বহুবিধা থাকিলে, সবর্ণা পত্নী কনিষ্ঠা হইলেও তাহার সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবে, সমানবর্ণা পত্নীর অভাবে অব্যবহিত পরবর্ণার সহিত ঐ কার্য্য করিবে। (যথা,—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সহিত ইত্যাদি ।)

পূর্ব্বে অসবর্ণ বিবাহ যে অবাধে প্রচলিত ছিল তাহা বহু প্রকারেই দেখান যাইতে পারে। অসবর্ণা ও হীনবর্ণা গুরুপত্নীকে বিরূপভাবে সম্বন্ধনাদি করিতে হইবে শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে।

বিষ্ণুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

“হীনবর্ণানাং গুরুপত্নীনাং দুরাদভিবাদনং ন পাদোপসংস্পর্শনম্ ॥ ৫

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

“হীনবর্ণা গুরুপত্নীদিগের অভিবাদন দূর হইতে করিবে। পাদস্পর্শ করিবে না।’

অন্যত্রও দৃষ্ট হইতেছে,—

“গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাস্চ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ ।

অসবর্ণাস্থ সম্পূজ্যাঃ প্রত্যুথানাভিবাদনৈঃ ॥ ২৭

তৃতীয় অধ্যায়, উশনঃসংহিতা ।

দায়ভাগ সম্বন্ধে বিষ্ণুসংহিতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। পাঠকবর্গকে আমরা সেই অধ্যায়টী পাঠ করিতে অনুরোধ

করি। তবে প্রমাণস্বরূপ আমরা উহা হইতে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি,—

“ব্রাহ্মণস্ত চতুষ্রবর্ণেষু চৈব পুত্রাভবেয়ুস্তে

পৈত্রিকমুক্ৰথং দশধা বিভজেয়ুঃ ॥ ১

তত্র ব্রাহ্মণীপুত্রশ্চতুরোহংশানাদদ্যাৎ ॥ ২

ক্ষত্রিয়াপুত্রস্ত্রীন্ ॥ ৩ ॥

দ্বাবংশৌ বৈশ্ণাপুত্রঃ ॥ ৪ ॥

শূদ্রাপুত্রস্ত্রেকম্ ॥ ৫

* * * দ্বিজাতীনাং শূদ্রস্ত্রেকঃ পুত্রোহর্কহরঃ ॥ ৩২

“ব্রাহ্মণের যদি চতুর্বর্ণীয়া স্ত্রীতেই পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহার (যথাকালে) পৈত্রিক ধন দশধা বিভক্ত করিবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণী পুত্র চারি অংশ, ক্ষত্রিয়া পুত্র তিন অংশ, বৈশ্ণা পুত্র দুই অংশ এবং শূদ্রা পুত্র একাংশ গ্রহণ করিবে। দ্বিজাতিগণের একমাত্র পুত্র শূদ্র হইলে, সে অর্দ্ধাংশের অধিকারী হইবে।”

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন,—

“চতুর্দ্বিদ্বেকভাগাঃ স্যুর্বর্ণশো ব্রাহ্মণাশ্রজাঃ ॥

ক্ষত্রজাশ্চিদ্বেক ভাগা বিড়জাশ্চিদ্বেকভাগিনঃ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়, দায়ভাগ প্রকরণ ।

“চারিজন (ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্ণা, ও শূদ্রা এই চতুর্বর্ণীয়া পত্নীর গর্ভজাত ব্রাহ্মণ পুত্র বর্ণানুক্রমে সমস্ত পৈতৃক ধনের চারি ভাগ, তিন ভাগ, দুই ভাগ এবং এক ভাগ ; তিন জন (ক্ষত্রিয়া, বৈশ্ণা এবং শূদ্রা এই ত্রিবর্ণীয়া পত্নীর গর্ভজাত) ক্ষত্রিয় পুত্র বর্ণানুক্রমে তিন ভাগ, দুই ভাগ, এক ভাগ, এইরূপ দুই জন (বৈশ্ণা ও শূদ্রার গর্ভজাত) বৈশ্ণপুত্র দুই ভাগ এবং এক ভাগ প্রাপ্ত হইবে ।

গৌতম বলেন,—

“ব্রাহ্মণস্ত রাজত্যা পুত্রো জ্যেষ্ঠো গুণসম্পন্ন
স্ত্রীয়াংশভাক্ জ্যেষ্ঠাংশহীনমন্ত্য
রাজত্যা বৈশ্য পুত্রসমবায়ে স যথা
ব্রাহ্মণী পুত্রেন ক্ষত্রিয়াচেৎ শূদ্রাপুত্রোহপ্যানপত্যস্ত
শুক্রযুল্লভেত বৃত্তিমূলমন্তেবাসবিধিনা ।

একোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ—গৌতমসংহিতা ।

অতঃপর দাহাদির কথা উল্লিখিত হইতেছে,—

“পিতরং মাতরঞ্চ পুত্রা নিহ্নিরেযুঃ ॥ ৩
ন দ্বিজং পিতরমপি শূদ্রাঃ ॥ ৪

একোনবিংশ অধ্যায়, বিষ্ণুসংহিতা ।

“পুত্রগণ পিতামাতার নিহ্নরণ (শববহন দাহনাদি) করিবে । কিন্তু পিতা দ্বিজ হইলে, শূদ্র পুত্র তাহা (নিহ্নরণ) করিবে না । অর্থাৎ শাস্ত্রকার ক্ষত্রিয় বৈশ্য পুত্র দ্বারা মৃত ব্রাহ্মণ পিতার শববহন দাহনাদি করিতে পারিবে ;—শুধু শূদ্র পুত্র দ্বারা এ কাজ চলিবে না, এইরূপে নিষেধ বিধি করিয়া দিলেন । ইহা দ্বারাও অসবর্ণ বিবাহ প্রতিপন্ন হইতেছে । দাহাদিব পর অশৌচাদির কথা বলা হইতেছে—

রাজত্যা বৈশ্যাবপ্যেবং হীনবর্ণাস্থ যোনিযু ।

যড়্‌রাত্রং বা ত্রিরাত্রং বাপ্যেকরাত্রক্রমেণ হি ॥ ৩৬

বৈশ্য ক্ষত্রিয় বিপ্রাণাং শূদ্রেষ্বাশৌচমেব তু ।

অর্দ্ধমাসেহথ যড়্‌রাত্রং ত্রিরাত্রং দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ৩৭

শূদ্র ক্ষত্রিয় বিপ্রাণাং বৈশ্যধাশৌচ মিস্যতে ।

যড়্‌রাত্রং দ্বাদশাহশ্চ বিপ্রাণাং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ।

অশৌচং ক্ষত্রিয়ে প্রোক্তং ক্রমেণ দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ৩৮

শূদ্রবিট্ ক্ষত্রিয়ান্যস্ত ব্রাহ্মণে সংস্থিতে যদি ।

একরাত্রেণ শুদ্ধিঃ স্তাদিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥ ৩৯

উশনঃসংহিতা, যষ্ঠ অধ্যায়ঃ ।

“সপিণ্ড শূদ্রের জন্ম মরণে, বৈশ্ব ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে ষড়্রাত্র, ত্রিষাত্র ও একরাত্র অশৌচ । হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ ! সপিণ্ড বৈশ্বের জন্ম মরণে শূদ্র ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের যথাক্রমে ১৫—৬—৩ দিন অশৌচ । সপিণ্ড ক্ষত্রিয়ের জন্ম মরণে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্ব শূদ্রের যথাক্রমে ষড়্রাত্র ও ষাদিশাহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ছয় দিন, বৈশ্ব শূদ্রের বার দিন অশৌচ । সপিণ্ড ব্রাহ্মণের জন্ম মরণে, শূদ্র, বৈশ্ব ও ক্ষত্রিয়ের প্রোক্ত (ব্রাহ্মণের যে কয়দিন অশৌচ উক্ত হইয়াছে—দশ দিন) অশৌচ হইবে ।” এইত গেল অশৌচের কথা ।

এক্ষণে আমরা জাতকর্মাদি সংস্কারের কথা উভয় শাস্ত্রকারগণ কি বলিয়াছেন, তাহাও পাঠকবর্গের গোচরীভূত করিতে চাহি ।

তাহারা বলেন,—

“বিপ্রবদ্বি প্রবিদ্যাসু ক্ষত্রবিদ্যাসু বিপ্রবৎ ।

জাতকর্মাণি কুর্ব্বীত ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ ॥৭

বৈশ্বাসু বিপ্রক্ষত্রাত্যাং ততঃ শূদ্রাসু শূদ্রবৎ ।”

প্রথম অধ্যায়—বাসসংহিতা ।

“ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিধিপূর্ব্বক বিবাহিতা যে ব্রাহ্মণ কন্যা তাহাকে বিপ্রবিদ্যি কহে । বিপ্রবিদ্যি পত্নীতে জাতসন্তানের, জাতকর্মাদি সংস্কার ব্রাহ্মণেব মত করিবে ; ক্ষত্রবিদ্যি পত্নীতে (ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্র কন্যাকে ক্ষত্রবিদ্যি বলে) জাতসন্তানের জাতকর্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয় জাতির স্থায় করিবে । ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিতা শূদ্রা কন্যাতে জাতসন্তানের জাতকর্মাদি সংস্কার শূদ্রের স্থায় করিবে । ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় কর্তৃক বিবাহিতা বৈশ্বকন্যাতে জাতসন্তানের জাতকর্মাদি সংস্কার বৈশ্বজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ

ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য কর্তৃক বিবাহিতা শূদ্র কন্যাতে জাতসন্তানের জাতকর্ণাদি সংস্কার শূদ্রজাতির গত করিবে ।

সর্বশেষে অসবর্ণ বিবাহের প্রমাণস্বরূপ আর একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ অধ্যায় শেষ করিব ।

কাত্যায়ন-সংহিতা বলিতেছেন,—

“বর্ণ জৈষ্ঠ্যেন বহুবীতিঃ সর্বণীভিষ্ঠ জন্মতঃ ।

কার্যমগ্নিচ্যুতেবাভিঃ স্বাধবীভিমর্থনং পুনঃ ॥ ৫

অষ্টমঃ খণ্ডঃ ।

• “ব্রাহ্মণের সর্বণী অসবর্ণী বহুপত্নী থাকিলে, বর্ণজ্যেষ্ঠতা প্রযুক্ত সর্বণী সাধবী পত্নীগণই অগ্নিনিঃসরণ উদ্দেশ্যে মস্থন করিবে । তন্মধ্যে অতি নিপুণা একজন বা ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একজন পত্নী মস্থন করিবে । তদভাবে দ্বিজাতি জাতীয়া অসবর্ণী যে কোন পত্নীও বিশেষরূপে অগ্নিমস্থন করিতে পারিবে ।”

অনুলোম বিবাহ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় ত্রয়োদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :—

শূদ্রেব ভার্য্যা শূদ্রস্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বা চৈব রাজঃ স্যুস্তাশ্চ স্বাচাঃজননঃ ॥ ১৩ ॥

(৩য় অঃ মনু)

“শূদ্রাই কেবল শূদ্রের ভার্য্যা হইবে ; শূদ্রা এবং বৈশ্যা, বৈশ্যের বিবাহ যোগ্য । শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয় বর্ণের বিবাহ যোগ্য এবং শূদ্রা, বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া এবং ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণের বিবাহযোগ্য হইবে ।”

এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেব (Mr. Elphinstone) তৎকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসেও লিখিয়াছেন :—Men of the three first classes are freely indulged in the choice of woman from any inferior caste, provided they do not give them the first place

in their family. But not marriage is permitted with woman of a higher class.

অনুলোম বিবাহ সম্বন্ধে মনুসংহিতায় অশ্লিষ্ট লিখিত হইয়াছে :—

পানিগ্রহণসংস্কারঃ সৰ্বণীশ্বপদিশ্চতে ।

অসৰ্বণীশ্বয়ং জ্যেয়ো বিধিরুদ্রাহকশ্চনি ॥ ৪৩

শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহঃ প্রতৌদো বৈশ্যকন্তয়া ।

বসনশ্চ দশা গ্রাহা শূদ্রয়োৎকৃষ্ট বেদনে ॥ ৪৪

(মনু তৃতীয় অধ্যায়)

“শাস্ত্রে সৰ্বণী জীৱই পানিগ্রহণ সংস্কারের বিধি আছে । অসৰ্বণী জীৱ বিবাহকালে পানিগ্রহণের পরিবর্তে বক্ষ্যমাণ বিধিই প্রশস্ত । শূদ্রাদি নিকৃষ্ট বর্ণের অন্তর্গত বংশ সমূহ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রেবদ্ধ হইয়া উচ্চবংশত্ব প্রাপ্ত হইত ।”

এ সম্বন্ধে মনু বলিতেছেন :—

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে ।

অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাৎ ॥ ৬৪ ॥

শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণৈশ্চতি শূদ্রতাম্ ।

ক্ষত্রিয়াজ্জাত মেবন্ত বিদ্যাঐশ্চাৎ তথৈব চ ॥ ৬৫ ॥

(মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়)

“স্বপত্নী শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতা পারশব নাম্নীকন্তা যদি অশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ বিবাহ করে এবং তাহার কন্তাকে যদি অপর ব্রাহ্মণে বিবাহ করে এবং এইরূপ ব্রাহ্মণ সংসর্গ যদি ধারাবাহিক গাত পুরুষ পর্য্যন্ত হয়, তবে সপ্তম জন্মে ঐ পারশাখ্য বর্ণ, বীজের উৎকর্ষতা জন্ত ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এই ক্রমে যেকোন শূদ্র ব্রাহ্মণ হয় তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে ।”

এ সম্বন্ধে আর অধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই । আমরা কেবল এতদ্বিষয়ক কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াই নিবৃত্ত হইব ।

ক্ষত্রিয় যযাতি রাজা ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । দেশে ঐরূপ প্রথা না থাকিলে কখনই ঐরূপ বিবাহ হইতে পারিত না । “যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য চতুর্বেদ ও ষড়ঙ্গবেত্তা সর্বগুণাযিত ব্রহ্মদত্ত নামে বিখ্যাত এক যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ, বাসুদেবের তুষ্টির জন্য পঞ্চশত ভাৰ্য্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই পঁচ শত মধ্যে দুই শত ব্রাহ্মণ, এক শত ক্ষত্রিয়া, এক শত বৈশ্যা ও এক শত শূদ্রা । * * * ছর্কাসার সেবা করায় তিনি বর দেন, প্রত্যেক ভাৰ্য্যাতে, একটা করিয়া পুত্র ও একটা করিয়া কন্যা জন্মিবে, অধিকাংশ কন্যা যদুবংশীয়দিগকে সম্প্রদান করিয়া অবশিষ্ট কন্যাগুলি অন্যান্য নরপতির সঙ্গে বিবাহ দেন । (১)

হিন্দু জাতির শীর্ষস্থানীয় চন্দ্রবংশোদ্ভূত পাণ্ডবগণ যেমন পঞ্চাল ও যদুবংশে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অনার্য্য নাগ বংশীয়া উলুপী এবং রাক্ষসী হিড়িম্বারও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । রঘুবংশে লিখিত আছে যে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ এক নাগ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণের অনেক জাতীয়া বহুবিধা স্ত্রী ছিল বলিয়া প্রকাশ । চন্দ্রগুপ্ত যবনরাজের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন । রাজপুত বংশীয় ললনাগণের সহিত দিল্লীর গোঘল সম্রাটগণের বিবাহ হইয়াছে—কিন্তু তাহাতে রাজপুত জাতির জাতি নষ্ট হয় নাই ।

মুচ্ছকটিক নাটকের নায়ক চারুদত্ত গণিকা বসন্ত সেনাকে বিবাহ করিয়াও জাতিভ্রষ্ট হয়েন নাই এবং ব্রাহ্মণ শবিলক অন্ততঃ গণিকা

(১) “৩প্রতাপ রায়ের অনুবাদ (হরিবংশ বিমূপর্ক ৩৪৪ পৃষ্ঠা) ।”

মদনিকাকে বিবাহ করিয়া জাতিচ্যুত হন নাই । কাব্য বা নাটকের বিষয় উড়াইয়া দিবার কাহারও অধিকার নাই । বরং পুরাণ সংহিতা অপেক্ষা নাটকে তাত্‌কালিক যুগের সামাজিক আচার ব্যবহার ক্ষুণ্ণতর রূপে চিত্রিত রহিয়াছে । সমাজের নিখুঁত চিত্রই নাট্যকার তদীয় নাটকে সুরঞ্জিতরূপে চিত্রিত করিয়া থাকেন । তৎসময়ে এরূপ বিবাহ কোন দোষাবহ ছিল না এরূপ অনুমান করা অন্তায় হইবে না । ফলতঃ পূর্বযুগে বিবাহ ব্যাপার এ কালের ন্যায় বাঁধাবাধি রীতিতে নিবদ্ধ ছিল না ।

মনু নবম অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধম যোনিজা

শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হনীয়তাম্ ॥২৩॥

এতাশ্চাত্তাশ্চ লোকেহস্মিনপকৃষ্টে প্রসূতয়ঃ ।

উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ ঐশ্বঃ ঐশ্বভর্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ ॥২৪॥

(মনুসংহিতা, নবম অধ্যায়)

“নিকৃষ্টাকুলসম্ভূতা অক্ষমালা এবং পক্ষিনী শারঙ্গী ক্রমান্বয়ে ঋষি বশিষ্ঠ ও মন্দপালের সহিত উদ্বাহসূত্রে মিলিত হইয়া পরম গাত্ৰা হইয়াছিলেন । উক্ত রমণীদ্বয় এবং সত্যবতী প্রভৃতি আরও কতকগুলি রমণী অপকৃষ্ট বংশীয়া বা অপকৃষ্ট যোনিজা হইলেও ভর্তৃগুণে সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন ।”

মনু অন্তত্ৰ বলিয়াছেন :—

শ্রদ্ধাধানঃ শুভাং বিদ্যা মাদদীতাবরাদপি ।

অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং জীৱত্বং হৃক্ষাদপি ॥২৩৮॥

জিয়ো রদ্ধান্তথো বিদ্যা ধর্মঃ শৌচং স্তুভাষিতম্ ।

বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ ॥২৪০॥

(মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়)

“শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর লোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে । অতি অন্ত্যজ চণ্ডালাদির নিকট হইতেও পরম ধর্ম লাভ করিবে এবং জীরত্ব ছন্দুলজাত হইলেও গ্রহণ করিবে । ২৩৮। জ্ঞী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম, শৌচ, হিতকথা, এবং বিবিধ শিল্প কার্য সকলের নিকট হইতে সকলে লাভ বা শিক্ষা করিতে পারে । ২৪০।” ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ আদিতে প্রাচীন-কালে একই পিতা কশ্যপ ঋষির সন্তান ছিলেন এবং নিজদিগকে পরস্পর সহোদর ভাই বলিয়াই জ্ঞান করিতেন,—পরস্পরের মধ্যে বিবাহ, আহার ও আদানপ্রদান স্বচ্ছন্দে চলিত । পরে যখন এই চারি শ্রেণীর মধ্য হইতে প্রেম ও ভালবাসা, প্রীতি ও মমতার ভাব তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইল—তখনই পরস্পরের মধ্য হইতে আহার, পান ও বিবাহাদি প্রথা উঠিয়া যাইতে লাগিল । ক্রমে এই ভাব বদ্ধমূল হইয়া বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে । জাতিত্ব ও স্বজাতীয়ত্ব বোধ চলিয়া যাওয়াতেই এবং পরস্পর স্নেহ ভালবাসা, মায়া মমতার অভাব হওয়াতেই এই সব সামাজিক ও জাতিগত পার্থক্যের সৃষ্টি হইয়াছে । ইহা ভিন্ন বিবাহাদি না হইবার আর কোন কারণ নাই । ব্রাহ্মণাদি চারি-বর্ণের মধ্যে যে ভেদ ও ব্যবধান দেখা যাইতেছে—এ সবই কৃত্রিম ও মিথ্যা । এই মিথ্যা, অশাস্ত্রীয় কুলাচার ও দেশাচার ভাঙ্গিতে হইবে । বিবাহের সঙ্কীর্ণ গাঙী ভাঙ্গিয়া আদানপ্রদানের সীমা বাড়াইতে ও প্রশস্ততর করিতে হইবে । জাবার বৈদিক যুগ ফিরাইয়া আনিতে হইবে । বিবাহের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে চারি বর্ণকে বাঁধিতে হইবে । রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, কুলিন, কাপ শ্রোত্রীয় প্রভৃতির মিথ্যা বেড়া ও কুসংস্কারের সনাতন প্রাচীর এই দণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে ।

পরশর অধ্যায় ।

আহার ।

পরশর স্মৃতিই কলিকালের ধর্মশাস্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে । উক্ত শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—

ক্ষত্রিয়ো বাপি বৈশ্যো বা ক্রিয়াবন্তৌ শুচিব্রতৌ
তদগৃহেযু দ্বিজৈর্ভোজ্যং হব্যকব্যেযু নিত্যশঃ ।

“যে সকল ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ক্রিয়াবান্ এবং শুচিব্রতধারী তাঁহাদের গৃহে ব্রাহ্মণেরা সর্বদা “হব্যে কব্যে” ভোজন করিবে ।”

মহু আপস্তম্ব গৌতম প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের মতামত উদ্ধৃত করিয়া ভারত গৌরব পরম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, এম, এ ; পি, এইচ, ডি ; সি, আই, ই, মহোদয় তাঁহার বিখ্যাত “ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাস নামক ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকে আহারাদি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মতামত রহিয়াছে । তিনি বলিয়াছেন,—But in the olden times we see from the Mahabharat and other works, that Brahmans, Kshatriyas and Vaisyas could eat the food cooked by each other, Manu lays down generally that a twice-born should not eat the food cooked by a Sudra (IV, 223) ; but he allows that prepared by a Sudra, who has attached himself to one, or is one's barber, milkman, slave, family-friend, and co-sharer in the profits of agriculture, to be partaken (IV 253). The implication that lies here is that the

three higher castes could dine with each other. Gautama, the author of Dharmasutra, permits a Brahman's dining with a twice-born (Kshatriyas or Vaisyas) who observes his religious duties (17, 1,). Apastamba, another writer of the class, having laid down that a Brahman should not eat with a Kshatriya and others, says that according to some, he may do so with men of all the varnas, who observe their proper religious duties, 'except with the Sudra. But even here there is a counter-exception, and as allowed by Manu, a Brahman may dine with a Sudra, who may have attached himself to him with a holy intent (1-18. 9. 13. 14.)

বর্তমান সময়ে আহারাদি সম্বন্ধে যেরূপ আঁটাআঁটী ভাব দেখা যায়, পূর্বে এরূপ ছিল না। ভাণ্ডারকার মহাশয়ই এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত এলফিনষ্টোন সাহেব তৎকৃত “ভারত ইতিহাসের ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—But there is no prohibition in the code against eating with other classes or partaking of food cooked by them (which is now the great occasion for loss of caste), except in the case of Sudras ; and even then the offence is expiated by living on water-gruel for seven days (Ch. XI, 153)

পুনর্বার ভাণ্ডারকার মহাশয় মাদ্রাজের হিন্দুসমাজ সংস্কার সমিতির অধিবেশনে বলিয়াছেন—“Even in the time of the epics, the Brahmins dined with the “Kshatriyas and Vaisyas, as we see from the Brahmanic—sage Durvasa, having shared the hospitality of Draupadi, the wife of Pandavas,

প্রাচীন অর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং শেষে কথন কখনও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের ভিতর আহাৰাদি চলিত । তৎকালে ক্ষত্রিয় রাজগণ যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং ব্রাহ্মণগণও সেই সকল যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া আনন্দের সহিত ভোজন করিতেন । মহাভারত পাঠে জানিতে পারা যায় যে পাণ্ডবদিগের বনবাস কালে স্বয়ং দ্রৌপদী রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইতেন । সকলেই অবগত আছেন যে প্রাচীনকালে বৈশ্য সুপকার ছিল । বিরাট রাজত্ববনে ভীম নিজকে সুপকার বলিয়া পরিচয় দান করতঃ উক্ত কার্যে নিয়োজিত হইয়া অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত করেন । স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এক সময় বলিয়াছিলেন, “রন্ধনাদির কার্য কেন ব্রাহ্মণের হইতে যাইবে । রন্ধনের কার্য হইতেছে চাকর-বাকরের কার্য ।” বর্তমান সময়ে হিন্দুজাতির যদি কোনও গৌরব করিবার কিছু থাকে, তবে তাহা খাদ্যাখাদ্য বিচার ও স্পর্শদোষ ভীতি । পৃথিবী পূজিত কোনও মহাপুরুষ একদিন বলিয়াছিলেন,— “জ্ঞানমার্গ কৰ্ম্মমার্গ ভক্তিমার্গ সব পলায়ন এখন আছেন কেবল ছুৎমার্গ, কেবল আগায় ছুওনা আগায় ছুওনা—পৃথিবীর সব অপবিত্র কেবল আমিই পবিত্র । হিন্দুর ব্রহ্ম এখন ব্রহ্মলোকেও নাই, গোলকেও নাই—মুনি ঋষির হৃদয়কন্দরেও নাই, উপাসনা তপস্তাতে নাই, ব্রহ্ম এখন রান্নাঘরে, ব্রহ্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে ।” হিন্দুসমাজ রসাতলে গিয়াছে, পাপে যে ডুবিয়াছে তবুও কপটতা ছাড়িতে পারিতেছে না । কত সমাজশিরোমণি নেতা মহাশয়কে দেখিতেছি, যাহারা নিশাকালে নিম্নশ্রেণীর রক্ষিতা নারীর গৃহে গোপনে স্বচ্ছন্দে তাহার তৈয়ারী খাদ্য আহাৰ করিয়া কৃতার্থম্ভ হইতেছেন ও বাটী আসিয়া বিলাতযাত্রীর প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেছেন । কত সমাজপতিকে দেখিতেছি যাহারা ষ্ট্রিমারে স্বচ্ছন্দে বাবুর্জির প্রস্তুত মুরগীর মাংস দিয়া আহাৰ করিতেছেন ও বাটী আসিয়া মুখ মুছিয়া দুর্বল স্বজাতীয়

ভোগ করিতে হইবে, যতই বিলম্ব করিবেন মুখ দেখান ততই ভার হইয়া উঠিবে । মনে হয় শুধু আহার বিষয়ক বিধি ব্যবস্থাই হিন্দুজাতির উন্নতি মার্গের অর্গলস্বরূপ হইয়াছিল । খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিতে করিতেই দেশটা অধঃপাতে গেল । শাস্ত্রে কত উদার মত আছে কিন্তু সমাজ শাস্ত্রানু-মোদিত পথে পবিচালিত হইতেছে না বলিয়াই সমাজের এ ছুরবস্থা । বর্তমান হিন্দুসমাজ দেশাচার ও লোকাচারের দাস হইয়া পড়িয়াছে । শাস্ত্রের দোহাই দেওয়াও বৃথা । লোকাচারের অনুকূল মত যে কোন সংস্কৃত ছন্দেও কবিতায় আছে—উহাই শাস্ত্র উহাই বেদ উহাই ধর্ম উহাই পালনীয় । যিনি উহার প্রতিবাদ করিবেন, তিনিই ধর্মভ্রষ্ট নাস্তিক পাষণ্ড সমাজ বিপ্লবকারী বলিয়া অভিহিত হইবে । মনুসংহিতায় চতুর্থ অধ্যায়ে আছে :—

আন্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপাল দাস নাপিতৌ ।

এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥

২৫৩ শ্লোক, মনু ।

“যে যাহার কৃষিকর্ম করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র, যে যাহার গো পালন করে, যে যাহার দাস্ত্যকর্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌরকর্ম করে,—শূদ্রের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজন করা যায় এবং যে যাহার নিকট আত্ম সমর্পণ বা নিবেদন করিয়াছে, তাহাবও অন্ন ভোজন করা যায় ।

বিষ্ণু এবং যাজ্ঞবল্ক্যও ঐ কথাই বলিতেছেন :—

শূদ্রেষু—দাস গোপাল কুলমিত্রাঙ্ক সীরিণঃ ।

ভোজ্যান্না নাপিত ঐশ্তব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥ ১৬৮ । যাজ্ঞবল্ক্য ।

পরশর এবং যমসংহিতাও সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন :—

“দাস নাপিত গোপাল কুলমিত্রাঙ্ক সীরিণঃ ।

এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥

২০ শ্লোক যমসংহিতা । পরশরসংহিতা ২০ শ্লোক ।

এইত শাস্ত্রের মত উদ্ধৃত করিলাম । এক্ষণে হিন্দুসমাজ কি এই বিধি মানিতে প্রস্তুত আছেন ? ইহাদ্বারা বেশ অনুরাগিত হয় হিন্দুসমাজ আর শাস্ত্র কথিত পথে চলিতেছে না—লোকাচার স্ত্রীআচার দেশাচার তাহাকে যেমন চালাইতেছে—যেমন নাচাইতেছে সে তেমনি চলিতেছে, তেমনি নাচিতেছে । শাস্ত্রীয় মত অধিক প্রদর্শন করা বাহুল্য মাত্র । অধিক দিনের কথা নহে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে মহাত্মা নিত্যানন্দ দেব সপ্তগ্রামে স্মরণবণিক বংশীয় উদ্ধারণ দত্তের গৃহে তৎকর্তৃক প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন ও সকলে মিলিয়া মহোৎসব করিয়াছেন । এসম্বন্ধে ব্যাসাবতার শ্রীকৃষ্ণাবনদাস গোস্বামী তৎকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতে এইরূপ লিখিয়াছেন—“উদ্ধারণ দত্তকে সঙ্গে লইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অশ্বিকানগরে উপনীত হইয়াছেন । তথায় সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা বসুধাদেবীকে বিবাহ করার প্রস্তাব উত্থাপন করিলে কুলাচার্য্যগণ তাঁহার পরিচয়—আহারাদি কিরূপে সম্পাদিত হয় জিজ্ঞাসা করিলেন ।

প্রশ্ন :—“শ্রীপাদের নিতি নিতি ভিক্ষা আয়োজন ।

স্বপাক করহ কিম্বা আছয়ে ত্রাঙ্গণ ?

উত্তর :—প্রভু কহে কখন বা আমি পাক করি ।

না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উত্তারি ॥

এইমত পরিবর্ত্ত রূপে পাক হয় ।

শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময় ॥

প্রশ্ন :—তারা কহে এ বৈষ্ণব, হয় কোন জাতি ।

পূর্ব্বাশ্রমে কোন্ নাম, কোথায় বসতি ॥

উত্তর :—প্রভু কহে ত্রিবেণীতে বসতি উহার ।

স্মরণ বণিক দেখি, করিছ স্বীকার ॥

বৈশ্য কুণ্ঠিতে জন্ম, হয় সদাচারী ।

এজন্ত উহার অন্ন, ঘৃণা নাহি করি ॥

* * * *

সেই দিন হইতে নিত্য নিত্য মহোৎসব ।

আসিয়া মিলয়ে যত আত্ম বন্ধু সব ॥

প্রভু আজ্ঞাগতে দত্ত করয়ে বন্ধন ।

নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ ॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

পুরাণ সংহিতা মহাভারত ও ইতিহাস হইতে আমরা এইরূপ প্রমাণ আরও প্রদর্শন করিতে পারিতাম কিন্তু বাহুল্যভয়ে নিবৃত্ত থাকিলাম । আপনাদের মধ্যে সকলেই বোধ হয় অবগত আছেন যে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ত্রৈলোক্যস্বামী বিগ্ৰহানন্দস্বামী ভাস্করানন্দস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ নিয়-শ্রেণীস্থ হিন্দুজাতীর অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন । আধুনিক কালের দয়ানন্দ সরস্বতী, পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী, রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপ ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারক স্বামী রামতীর্থ, স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক শ্রীমৎ প্রেমানন্দভারতী প্রভৃতি ভারতের উজ্জ্বল মণি স্বরূপ মহাপুরুষগণ খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে সঙ্কীর্ণমত পরিত্যাগপূর্ব্বক উদার মতই পোষণ করিয়া গিয়াছেন । জগতের কোন মহাপুরুষই বলেন নাই যে, “অমুকে নীচ জাতীয়—অমুকের হাতে অন্ন পানীয় গ্রহণ করিলে আমার জাত যাইবে ও স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হইয়া আসিবে ।”

ফলতঃ বর্তমান কালের খাদ্য বিবাহ আহারাদি ও খাদ্যাদি গ্রহণ বিষয়ে -
এরূপ আঁটাআঁটি ও গোঁড়ামি ভাব এবং সঙ্কীর্ণ নীতি প্রাচীন আচার্য্যদিগের

সময়ে কখন ছিল না । ইতঃপূর্বে আমরা তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি । পরবর্তী যুগে যখন ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রগণকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল, যখন পরস্পরের মন হিংসার হলাহলে জর্জরীত হইয়া উঠিল, বিদ্বেষের ভীষণ বহি যখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মনে দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিল তখন হইতেই চতুর্দর্শের মধ্যে বিবাহাদি ও আহারাদির নিয়ম উঠিয়া গেল । (১) বর্তমান সময়ে আমরা কি দেখিতে পাই ? নিতান্ত শত্রুতাভাব দ্বৈতদেবী হিংসা-হিংসি না থাকিলে পরস্পরের মধ্যে আহার ও বিবাহ সম্বন্ধ রচিত হয় না । ছুই বা ততোধিক দলের মধ্যে যখন মনান্তর উপস্থিত হয়, যখন কোন কারণে প্রবল বৈরভাব জন্মিয়া উঠে তখন তাহারা পরস্পরের মধ্যে আহারাদি ও বিবাহ সম্বন্ধ বন্ধ করিয়া দেয় । পরস্পরের মধ্যে থাওয়া দাওয়া ও বিবাহ সম্বন্ধ বিশেষ প্রণয় ও সন্তাবের চিহ্ন । যেখানে সন্তাব নাই ভালবাসা নাই প্রণয় প্রীতি নাই বন্ধুত্ব অনুরাগ নাই, সেখানে কেহ আহারাদি ও বিবাহাদি করে না । আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই, ছুইখানি গ্রামের মধ্যে বিরোধ—দলাদলি বা অসন্তাব উপস্থিত হইলে, তাহাদের মধ্যে থাওয়া দাওয়া ও বিবাহ সম্বন্ধ উঠিয়া যায় । প্রাচীনকালে অর্থাৎ আর্যদিগের পরবর্তী সময়ে বা সংহিতাদিযুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি চতুর্দর্শের মধ্যেও এই কারণেই আহার বিহার ও বিবাহাদি আদান প্রদান রহিত হইয়া গিয়াছিল । এই চারি শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের মধ্যে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ঘৃণা অনুরাগ বিদ্বেষ অসন্তাব বিরোধ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, পরে আমরা তাহা বিষদরূপে আলোচনা করিয়াছি । পাঠকগণ সপ্তম অধ্যায়ে তাহা দেখিতে পাইবেন । স্বামী বিবেকানন্দ বলেন,—‘এমন কি খুব আধুনিক শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহেও বিভিন্ন জাতির একত্র

(১) বিস্তৃত বিবরণ সন্নিবিষ্ট “জলচল ও খাদ্যাধার্য বিচার” গ্রন্থে জটয়া ।

ভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই, আর প্রাচীনতর গ্রন্থসমূহের কোথাও বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই ।” (১)

যাঁহারা শুচি-ধর্মের নামে স্বীয় পরিণীতা অর্দ্ধাঙ্গিনী সহধর্মিণীর হাতে পর্য্যস্ত খান না—তঁাহাদিগকে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। তাঁহারা সংসারের বাহির, সমাজের বাহির। তাঁহারা মনে করেন, খাদ্যদ্রব্য অন্ত্রকে ছুঁইতে না দেওয়ার মত ধর্ম নাই। ইঁহারা ছুঁৎরোগগ্রস্ত। কিন্তু যাঁহাদিগকে জীবনসংগ্রামে কর্মের তাড়নায় সারা ভারতবর্ষ বা সমগ্র বিশ্ব পর্য্যটন করিতে হয়—তঁাহাদিগকে ত ছোঁয়া-ছুঁয়ির বাড়াবাড়ি করিলে চলে না। ছোঁয়া-ছুঁয়ির ধর্ম বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে চলিতে পারে। সমাজ-পতিনামক শাস্ত্রব্যবসায়ীগণের কর্তব্য—খাদ্যাদি গ্রহণ সম্বন্ধে উদার মত পোষণ করা। অনুদার ব্যবস্থাদাতাকে এ যুগে আর কেহ মানিবে না। যাঁহারা বিদেশে যাইতেছেন—তঁাহারা কেহই পাঁতি লইবার জন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ছুয়ারে ধরা দিতেছেন না। দেখিতে হইবে—খাদ্যবস্তুগুলি যেন হিন্দুর জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধ্বংস না করে; অথায় যেন কোন হিন্দু না খান। সব জাতিই যেন খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে নিজ নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলে, হিন্দুকেও তাহার জাতীয় বিশিষ্টতা ত্যাগ করিলে চলিবে কেন? ভারতে মুক্তির হিল্লোল বহিয়াছে। এ সময় কোন প্রকার অনুদার বিধি নিষেধের দোহাই দিলে কেহ তাহা মানিবে না। ভারত তর তর বেগে উন্নতির পথে ছুটিয়াছে—এ সময় পশ্চাৎ দিক হইতে ছোঁয়া-ছুঁয়ির বিধি নিষেধ দিলে কেহই তাহা শুনিবে না—লাভের মধ্যে শাস্ত্র ও শাস্ত্রব্যবসায়ীগণের প্রতি অশ্রদ্ধা বাড়িবে মাত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

জাতিভেদোৎপত্তির কারণ ।

জাতিবিভাগের কারণ সম্বন্ধে বিশ্বকোষসম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ “বুদ্ধের জাতীয় ইতিহাস”এ এইরূপ লিখিয়াছেন :—

“সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় মানবগণ সংখ্যায় অতি অল্প ছিল, যখন জীবিকার চিন্তা ছিল না, সৃজলা সফলা শস্ত্র-শ্যামলা মেদিনী প্রচুর আহার সামগ্রী যোগাইতেন, হিংসা দ্বেষ লোভ যখন মানবকে স্পর্শ করিতে পারে নাই যখন সত্যভাষী সরল মানব কেবল স্বভাবজাত ফল-মূল্যাহারে পরিতৃপ্ত হইত, মানবের সেই সুখ শান্তির যুগে সমাজবন্ধনের কোনও প্রয়োজন হয় নাই ।

সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে উচ্চনীচ ক্রমে শ্রেণী বা বর্ণ বিভাগেরও আবশ্যকতা ছিল না । এই কারণে একদিন মহর্ষি ভরদ্বাজ এইভাবে ভৃগুকে বলিয়াছিলেন—“বর্ণ সকলের ইতর বিশেষ নাই । পূর্বে যখন ব্রহ্মা সৃষ্টি করিলেন তখন সমস্তই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন । সৃষ্টির প্রথম যুগই পুরাণেতিহাসে সত্যযুগ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । সত্যযুগের যেকোনও পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাই আর্য্যজাতির আদিম অবস্থার পরিচয় ।”

“যখন মহাভারত ও রাগয়ণে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি স্থিরীকৃত হইয়াছে, তখন উভয় গ্রন্থেই স্বীকার করিতে হইবে সত্যযুগে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি হয় নাই, কেবল ব্রাহ্মণই ছিলেন । বেদোচ্চারণ রূপ মুখের কার্য্যই ব্রাহ্মণের মুখ্য ধর্ম, তাই ব্রাহ্মণ বিরাট পুরুষের মুখ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছিলেন ।”

“যখন পূজ্যপাদ আৰ্য্যগণ, হিমালয়ের তুষার শিখর পবিত্যাগ করিয়া ভারতের সমতল ভূমিতে অবতরণ কবিত্তে আবস্থ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা রাজসৌন্দর্য্য হইয়া রাজ্য বিস্তার, বলবীৰ্য্য সঞ্চার ও সাম্বিক বেদস্তোতাগণের রক্ষা বিধানে অগ্রসর হইলেন তাঁহারা ই শেয়ে “ক্ষত্রিয়” উপাধি লাভ করিলেন । পুরাণেতিহাসে সেই সময়ই ত্রেতাযুগ নামে বর্ণিত হইয়াছে । ওজঃ বা বীৰ্য্য রজোত্তমের পরিচায়ক । তাই পুরাণে ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণতা নির্দিষ্ট হইয়াছে । বাহুর কার্য্যই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য, তাই ক্ষত্রিয় বা রাজহু বিরাট পুরুষের বাহু বা বাহুজ বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন ।

“ধাক্‌সংহিতার অনেক মন্ত্রেই বিশ্ বা বৈশ্ণোর উল্লেখ আছে । কিন্তু ঐ সকল স্থানে বিশ্ শব্দের অর্থ প্রজা সাধারণ ;—উহা জাতিবাচক অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই । বাস্তবিকই বেদ সংহিতাব ‘পুরুষসুক্ত ব্যতীত আর কোথাও জাতিবাচক বৈশ্ণ শব্দের উল্লেখ নাই । এতদ্বারা অনুমিত হয়, যে সময়ে সেই মন্ত্রসমূহ ঋষিগণের হৃদয়াকাশে সমুদিত হইয়াছিল তখনও বৈশ্ণ নামক এক বিভিন্ন জাতি সমাজবদ্ধ হয় নাই । ঐতবেয় ব্রাহ্মণ পাঠে স্পষ্ট বোধ হইবে, যাহারা কৃষি গোবক্ষা স্ত্রজল ধন ও ধাত্তের উপায় সর্বদা চিন্তা করিত তাহারা বৈশ্ণ বলিয়া পরিগণিত হইল । বেদস্মৃতি ও পুরাণের বর্ণোৎপত্তি প্রকরণ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে মনে হইবে, মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ এবং যাগ ও যজ্ঞাদিতে যাহারা নিরত থাকিতেন তাঁহারা বা তাঁহাদের সন্তানেরা ব্রাহ্মণ । যাহারা যাগ যজ্ঞাদির উৎসাহদাতা, ব্রাহ্মণের রক্ষাকর্তা, রাজ্য ও জনপদের অধিকারী ও বলবীৰ্য্যশালী, তাহাবাই ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের স্ত্রথ শান্তিব জহু যাহারা কৃষি দ্বারা শস্তাদি উৎপন্ন করিতেন, পশ্বাদি পালন কবিতেন ও ধন দ্বারা রাজার অভাব পূরণে চেষ্টা করিতেন, তাহারা বা তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ

বৈশ্ব নামে অভিহিত হইয়াছিলেন । ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের পূর্বভাগে ৮ম অধ্যায়ে বৈশ্ববর্ণের স্বরূপ এইরূপ নিখিত হইয়াছে—

“যাহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রয়ে নির্ভরশীল হইয়া কেবল মাত্র সর্বভূতেই ব্রহ্ম বিদ্যমান, এইরূপ চিন্তায় দিনপাত করিতেন, তাহারা ব্রাহ্মণ ; তাহাদের মধ্যে যাহাবা অপেক্ষাকৃত দুর্বল, বৈশ্ব কৰ্ম্মে নিযুক্ত কৃষকরূপে যাহাবা অনিষ্ট উৎপাদন (?) করিত এবং ভূমি সম্বন্ধে যাহারা কার্য্যকারী হইয়াছিল, তাহারাই বৃত্তিসাধক কৃষক বৈশ্ব । বৈশ্ব রজঃ ও তমোগুণের একত্র সংযোগ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ঐশ্বর্য্য শূদ্র উভয়েব ভাব বিদ্যমান । বৈশ্বের প্রধান অবলম্বন কৃষি । শস্ত্র পরিপক্ব হইলেই তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি ও কামনা পূর্ণ হয় । এই জন্ত পরিপক্ব শস্ত্রের রূপ পীতবর্ণই হিন্দুশাস্ত্রে বৈশ্বের লক্ষণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ।”

“ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে পাওয়া যাইতেছে, গুণ কৰ্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণের মধ্য হইতেই বৈশ্ব জাতি উৎপন্ন হয় । পুরাণাদি পাঠে বোধ হয় ত্রেতাযুগের শেষ ভাগে ও দ্বাপর যুগের প্রথমে বৈশ্বসমাজ গঠিত হইয়াছিল । ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণু প্রভৃতি মহাপুরাণে দ্বাপর যুগের যে সকল লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে বৈশ্ব সমাজেব ছবিই প্রকটিত হইয়াছে । কৃষাদি লোক—জীবিকার হেতু বৈশ্ব (বৈশ্বের লোক জীবিকার হেতু কৃষি আদি), উক্কই তাহাদের প্রধান অবলম্বন, সেই জন্তই বৈশ্ব বিরাট পুরাণের উরদেশজাত এইরূপ কল্পিত হইয়াছিল ।”

“পুরাণে ইতিহাসে বৈশ্বসমাজ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই শূদ্রোৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় । ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ নির্দেশ করিতেছেন”—

“পূর্বে যে সকল ব্রহ্মোৎপন্ন সিদ্ধাত্মা মানবগণের বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহাবাই ত্রেতাযুগে পূর্বজন্মের শুভাশুভ কৰ্ম্মফল ভোগের জন্য যথাক্রমে, শাস্ত্রচিত্ত, তেজস্বীকৰ্ম্মী ও দুঃখী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও

শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন । অর্থাৎ ব্রহ্ম পুত্রগণ চতুর্বর্ণে বিভক্ত হইলেন ।”

“দ্বিজাতির পদসেবাই শূদ্রের মুখ্য ধর্ম—তাই শূদ্র বিরাট পুরুষের পাদজ বদিয়া কল্লিত হইলেন ।”

চতুর্বর্ণের বিভাগ সম্বন্ধে আগ্রার নিয় আদালতের বিচারপতি শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর লাল বৈজিনাথ বি, এ, তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত সুবিখ্যাত গ্রন্থ “Fusion of subcastes in India”-য় লিখিয়াছেন :—

The Vedas and the Epics carry us back to the good old days of India, when there were no castes and the whole world consisted of Brahmans only. Created equally by Brahma, men have in consequence of their acts, become fond of indulging their desires and were addicted to pleasure and were of a severe and wrathful disposition, endowed with courage and unmindful of piety and worship * * * * * those Brahmans possessing the attribute of Rajas (passion) became possessed of the attributes of goodness (satwa) and passion and took to the practice of rearing of cattle and agriculture, became Vaisyas. Those Brahman again, who were addicted to untruth and injuring others and engaged in impure acts and had fallen from purity of behaviour on account of possessing the attribute of darkness (tamas) became Sudras. Separated by occupation, Brahmans became members of the other three orders (Mahabharata, Mokha Dharma, Chap. 118). “Neither birth, nor study nor learning constitutes Brahmanhood, character alone constitutes it. (Mahabharata,—Van Parva—Chap. 313 Vers 103.)

জাতিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের একটা সিদ্ধান্তে ধারণা হইয়াছে—আমরা নিম্নে তাহা যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতেছি। পূর্বের আর্য্যগণ একবর্ণ ও এক জাতীয় ছিলেন। আদিম অধিবাসী অনার্য্যগণের সহিত তাঁহাদিগের বহুবর্ষব্যাপি সংগ্রাম চলিয়াছিল। তাঁহাদের প্রায় সকলেই অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া দিবাবসানে ক্লান্তশ্রান্ত অবসন্ন দেহে যুদ্ধ সমাধা করণান্তর গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন।

গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেও ক্লান্তি অপনোদনকারী কোনও দাস দাসী বা চাকর বাকর তখন ছিল না—কেননা পূর্বেরই বলিয়াছি তখন জাতিভেদ হয় নাই সকলেই একজাতীয় ছিলেন। কেবা হস্তপদ প্রক্ষালনের জল, বসিবার আসনাদি প্রদান করিবে, কেবা তাল বৃন্তে বাজন করিয়া ক্লান্তি অপনোদন করিবে, কেবা খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিবে, রন্ধনের উপাদানাদিই বা কে প্রস্তুত করিয়া দিবে, বহুবর্ষব্যাপি যুদ্ধের খরচ পত্রই বা কিরূপে নির্বাহিত করিবে, বিজিত ভূমিখণ্ড চাষ আবাদ করিয়া কেই বা শস্য উৎপাদন করিবে, যুদ্ধের ও দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গশস্ত্র আসবাব আদিই বা কে প্রস্তুত করিবে—অধিকৃত জনপদই বা কিরূপে শাসিত হইবে—ইত্যাদি বিষয় আলোচনা ও ইতি কর্তব্যতা নির্ধারণের জন্ত, তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হন। তখন সর্বসম্মতিক্রমে গুণ, কর্ম্ম ও শক্তি অনুযায়ী তাঁহারা নিজেরাই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। আর্য্যগণের মধ্যে যাহারা ধীশক্তিসম্পন্ন মেধাবী মঙ্গলাকুশল তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন অথচ শারীরিক শক্তিতে দুর্বল ও যুদ্ধকার্য্যে অপটু ছিলেন তাঁহারা এক শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন, এই শ্রেণীর নাম হইল ব্রাহ্মণ।

ইহাবা যজ্ঞন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কর্ম্মে ব্যাপৃত ও অল্প তিন বর্গের পরামর্শদাতা হইলেন। অবশিষ্ট আর্য্যগণের মধ্যে যাহারা যুদ্ধ বিদ্যাবিশারদ মহাবলশালী কঠোরহিঁদু অনলস মহাবীৰ্য্য সম্পন্ন তাঁহারা

পৃথক এক শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন । অনার্য্যদিগের সহিত সংগ্রাম করা, অধিকৃত জনপদ শাসন করা, অপর তিন শ্রেণীকে রক্ষা করা ইহাদের কার্য্য হইল ইহা বা ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইলেন । অবশিষ্ট আর্য্যদিগের মধ্যে যাঁহা বা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বা প্রচুর বলশালী নহেন, যুদ্ধে ভীত অথচ শিল্পকার্য্যে ও ব্যবসা বুদ্ধিতে সুনিপুণ, কৃষিকার্য্যে দক্ষ, বাণিজ্যপটু তাঁহারা এক শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন—ইহাদের নাম হইল বৈশ্য । কৃষিকার্য্য দ্বারা শস্য উৎপাদন, ধন সম্পদ যুদ্ধোপকরণ টাকাকড়ি দ্বারা তিন শ্রেণীকে প্রতিপালন, গোরক্ষা, নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা ইহাদের কার্য্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইল । অবশিষ্ট যাঁহারা বহিলেন তাঁহারা স্বভাবতঃই ধীসম্পদে দরিদ্র, শক্তি সামর্থ্যহীন, যুদ্ধে অসমর্থ ও অনভিজ্ঞ, অর্থ উপার্জনে ব্যবসা-বাণিজ্যে শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণে অক্ষম তাঁহারা আর কি করিবেন,— উল্লিখিত তিন শ্রেণীর পবিচর্যা ও সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শূদ্র বলিয়া কথিত হইলেন ।

এইরূপ ভাবে সর্ব জাতির সুখ সুবিধা শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী জাতি বিভাগ করিয়া আর্য্যগণ অত্যন্তকাল মধ্যেই এক অমিত পরাক্রমশালী জাতিরূপে পরিগণিত হইলেন । ব্রাহ্মণ সর্ববিষয়ে উক্ত তিন শ্রেণীর পরামর্শদাতা হইলেন । তাঁহাদের ইহলৌকিক ও পাবলৌকিক কল্যাণ সাধন উদ্দেশ্যে ঈশ্বর আরাধনা নানা প্রকার যাগযজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদন করিতে লাগিলেন, যুদ্ধ বিষয়ে ক্ষত্রিয়গণকে সহপদেশ দিতে লাগিলেন । ক্ষত্রিয়-গণ আবার অপর পক্ষে নিশ্চিত্তচিত্তে অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক দিন দিন নব নব রাজ্য স্থাপন এবং ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্রগণকে সর্বপ্রকার বহিঃ শত্রু হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন । রক্তদান ও জীবনদান করিয়া তিন শ্রেণীকে রক্ষা এবং সাম্রাজ্যবৃদ্ধির ভার তাঁহারা এই গ্রহণ করিলেন । বৈশ্য শ্রেণীও খাদ্য, ধনৈশ্বর্য্য, যুদ্ধোপকরণ,

অশ্ব, শস্ত্রাদি নানাবিধ শিল্পদ্রব্য বাণিজ্যাদি দ্বারা তিন শ্রেণীকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও শূদ্রগণের যাবতীয় অভাব অভিযোগ পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন । ইহারা তিন শ্রেণী দ্বিজবর্ণান্তর্গত হইলেন । পরবর্তী শূদ্র সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণের সেবা কার্যে নিযুক্ত হইলে তাহাদিগের রক্ষার ভার আহারাদি সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের ভার প্রতিপালনের ভার ভরণ-পোষণের ভার উল্লিখিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শ্রেণী গ্রহণ করিলেন । ইহারা কোনও শ্রেণী কোনও শ্রেণীকে ঘৃণা বা বিদ্বেষের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন না । কেননা ইহারা 'নিজেরাই' এমন ভাবে বিভক্ত হইয়াছিলেন যে ইহাদের কোনও শ্রেণীর সাহায্য ব্যতীত কোনও শ্রেণীর চলিবার উপায় ছিল না ।

ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণকে বাদ দিয়া ব্রাহ্মণের জীবন বা জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল না, ক্ষত্রিয়ের ব্রাহ্মণ বৈশ্য বা শূদ্র শ্রেণীর সহায়তা ব্যতীত জীবনযাত্রা নির্বাহ করা অসম্ভব ছিল, বৈশ্যেরও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রগণের সাহায্য ভিন্ন জীবন অতিবাহিত করিবার উপায় ছিল না এবং শূদ্রগণেরও উল্লিখিত তিন শ্রেণীর সাহায্য ব্যতিরেকে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিবার উপায় ছিল না । ইহারা প্রত্যেক শ্রেণী অপর তিন শ্রেণীর দ্বারা উপকৃত হইতেন এবং তজ্জন্ত পরস্পর পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন । বর্তমান কালের গ্রায় জাতিভেদ তৎকালে ছিল না ও কেহ তাহা কল্পনাও করিতে পারিতেন না । গুণ ও কর্মানুযায়ী ইহাদের মধ্যে অনেক নানা শ্রেণীতে গমনাগমন করিতে পারিতেন । ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রকর্মা হইলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র শ্রেণীভূত হইয়া যাইতেন । এইরূপ ক্ষত্রিয় সন্তান ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্র, বৈশ্য সন্তান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও শূদ্র এবং শূদ্র সন্তান যথাক্রমে বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ শ্রেণী হুস্ত হইয়া যাইতেন । ইহার প্রমাণ পূর্বে অনেক উদ্ধৃত হইয়াছে । বর্তমান

কালের গ্রাম ব্রাহ্মণের পুত্র—যে ব্রাহ্মণ হইবেন তা তিনি বৈশ্যকর্মা হইউন বা শূদ্রকর্মা হইউন,—একপ অদ্ভুত যুক্তি বা শাস্ত্র তৎকালে ছিল না ।

মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের রৈবতক কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাস দেবকে বলিতেছেন :—

“পবিত্র উত্তর কুরু হইতে যখন
উচ্চারি পবিত্রধ্বক, গাই সামগান,
আসিল ভারতে সেই পিতৃদেবগণ,
আছিল কি চারি জাতি ? লইল যখন
কেহ শাস্ত্র, কেহ শাস্ত্র, বাণিজ্য বা কেহ ;
সমাজের হিতব্রতে হইল যখন—
কেহ হস্ত কেহ পদ কেহ বা মস্তক ;
আছিল কি জাতিভেদ ? কাটিয়া যাহারা
সুন্দর সমাজদেহ—মুরতি প্রীতির,
করিতেছে চারিখণ্ড প্রতিরোধি বলে
অঙ্গ হইতে অঙ্গান্তরে শোণিত প্রবাহ,—
মহর্ষি বিপ্লবকারী আমি কি তাহারা ?
নাহি দিবে যারা প্রভো, ভবিষ্যৎব্যাসে
ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব কণ্ডুতুল্য শূবে,
নাহি দিবে জ্ঞানান্যোক ক্ষত্রিয়ে কখন,
বৈশ্যে বাহুবল, আদি জাতি ভারতের
করিয়া দাসত্বজীবী রাখিবে যাহারা
মহর্ষি বিপ্লবকারী আমি কি তাহারা ?”

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি পরলোকগত সারদাচরণ মিত্র এম, এ,

বি, এল ; পি, আর, এন্ ; মহোদয় জাতিভেদ সম্বন্ধে এইরূপ ভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

“ব্রহ্মার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তির কথা কবিকপোল কল্পিত উপমাঅক মাত্র । গোষগুণ অনুসারে ব্যবহার ও আচার ব্যবহারেব পার্থক্য অনুসারে পুরাকালে বর্ণ নির্ণয় হইয়াছিল ।” (১)

“ব্রাহ্মণোহশ্রমুখমাসীৎ” শ্লোকটির একটি সুন্দর ও সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা কাব্যসুন্দরী দেবসুন্দরী সাহিত্যচিন্তা কাব্যচিন্তা সমাজচিন্তা সমাজতত্ত্ব হিন্দুধর্মের প্রমাণ প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক ‘পূর্ণচন্দ্র’ বসু মহাশয় করিয়াছেন । তিনি বলিতেছেন :—“যাহা বিরাটের মুখ তাহাই ব্রাহ্মণ, যাহা বাহু তাহাই ক্ষত্রিয়, যাহা উরু বা মধ্যভাগ তাহাই বৈশ্য, যাহা পাদ তাহাই শূদ্র । এস্থলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র বলিতে একজন ব্যক্তি মাত্র নহে, সকলই সমষ্টি অর্থে বুঝিতে হইবে । ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব এবং শূদ্রত্ব যুক্ত লোক সমষ্টিই ব্রহ্মার কায়া । যাহা ব্রহ্মার কায়া, তাহা শুধু আর্য্য জাতিতে নহে, শুধু অনার্য্য জাতিতে নহে, সমস্ত লোক-মণ্ডলীতে যাহা আছে, তাহাই ব্রহ্মার কায়া । ব্রহ্মা শুদ্ধ জাতি বিশেষে আবদ্ধ নহেন ; সর্বজাতিতে তিনি বিদ্যমান ।”

শ্রীমৎ নির্মলানন্দ ভারতী মহোদয় উক্ত শ্লোকের ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন—তবে তাঁহার ব্যাখ্যা আরও বিঘদ আরও সংস্কৃত আরও যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, সুধীবৃন্দের বিচারের অশ্রু তাহাও এস্থলে লিখিত হইল ।

তিনি বলিতেছেন :— * * * * “পুরুষ সূক্ত রূপকে পরিপূর্ণ । “ব্রাহ্মণোহশ্রমু” ইত্যাদি মন্ত্রটী নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যায়, উহা বিরাট পুরুষের বর্ণনাও নহে, প্রজাপতির বর্ণনাও নহে, রাষ্ট্র পুরুষের বর্ণনা মাত্র । সমাজের বর্ণনাই এই শ্লোকের অর্থ ।

ব্রাহ্মণ তখনকার সমাজে মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র পদ । জ্ঞান প্রকাশ ব্রাহ্মণে, স্মরণ্য তদভাবে সমাজ নীরব ; বল ক্ষত্রিয়ে তাহা না হইলে সমাজের কার্য্য করিবার শক্তি লোপ পায় । কৃষি-বাণিজ্য বৈশ্য বল, তাহা না থাকিলে সমাজ ভগ্ন-উরু, দাঁড়াইতে পাবে না । পরিচর্যা শূদ্র কার্য্য, তাহা না থাকিলে, সমাজের হস্ত পদ মস্তিষ্ক সবই অপরিষ্কৃত রুগ্ন ভগ্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা । যাহার দ্বারা কাজ পাইতে হইবে, তাহার সেবা গুশ্রযা চাই । এইত গেল ঋকের প্রকৃত অর্থ, এখন টীকাকার ভীষ্যকার যাহাই কেন বলুন না, এ ঋকু আধুনিক । সকলেই ব্যাখ্যা করিতে গৌজামিল দিয়াছেন । বেদের বর্ণিত বিরাট পুরুষ জিনিষটা কি, এ বিষয় যাহার কিছু মাত্র জ্ঞানও আছে, তিনি অবশ্যই বলিবেন, ব্রাহ্মণ জাতি বিরাট পুরুষের মুখ হইতে পারে না । কেবল ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি মানবের দ্বারা যদি বিরাট মূর্তি কল্পিত হয় তবে স্থাবর জঙ্গম গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য্য নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত কাহার বাটী যাইবে ? অতএব ব্রাহ্মণ মুখরূপে কল্পিত হইয়াছিলেন, একরূপ অর্থও দর্শন শাস্ত্র বিরুদ্ধ । বিরাট পুরুষের বর্ণনা বহু পুরাণে আছে, বেদান্তাদি দর্শনেও সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজ হইতে বড় বিভিন্ন । ঐ মন্ত্র—পুরুষ সূক্তের অন্তর্গত নয়, উহা কোনও মতে জাতিভেদের প্রমাণ রূপে পুরুষ সূক্তে প্রক্ষিপ্ত । বিরাটের সহিত উহার সম্বন্ধ বলিতে গেলে বিরাট বহুবিধ হইয়া দাঁড়াইবে । ঐ মন্ত্রের অর্থ যদি টীকাকারদিগের মতানুযায়ী হয়, তাহা হইলেও উহা অর্থাৎ মুখ দিয়া, হাত দিয়া, অপূর্ব্ব জীবোৎপত্তি প্রক্রিয়া প্রচার করা বেদের অনধিকার চর্চা ব্যতীত আর কিছুই নহে । জীব-শরীর-নির্মাণ-প্রণালী ও জগতের পূর্ব্বতন অবস্থা বিষয়ে ভারতীয় আৰ্য্যজাতির জ্ঞান এত ভিন্নস্বত, একরূপ বিশ্বাস করিতে কষ্ট হয় ।” শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ এম, এ, মহাশয় বলেন—

“আমাদের বেদে আছে যে বিরাট পুরুষ ব্রাহ্মার মুখ বাহু উরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ যখন ভারতবর্ষের বাহিরে নাই এবং বিরাট পুরুষের মুখ হইতে পাদ পর্য্যন্ত যখন ভারতবর্ষেই শেষ হইল, তখন আর পৃথিবীর অপরাপর জাতির জন্ম অন্য কোন অঙ্গ বাকী রহিল না। এ যুক্তি নিতান্ত অসার নিতান্ত ভ্রমাত্মক।” মেদিনীপুরের অত্যাশ্চর্য রত্ন কটক স্যাম্ভেন্স কলেজের অধ্যক্ষ “রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার” স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ মজুমদার এম, এ ; জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন :—

“কৃষ্ণ বলিতেছেন—“আমিই জাতিভেদের কর্তা, কিন্তু আমাকে জাতিভেদের কর্তা বলিয়া মনে করিও না”। * * * * *

* * “আমি কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদের প্রথা প্রবর্তিত করি নাই। অর্থাৎ এমন কোন সময় নাই যখন আমি সমস্ত হিন্দুদিগকে একত্রিত করিয়া কতকগুলিকে ব্রাহ্মণ, কতকগুলিকে ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলাম, তবে আমি হিন্দুসমাজে যে শক্তি নিহিত করিয়াছিলাম সেই শক্তি প্রভাবেই কাল সহকারে সমাজ মধ্যে চারিটি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমি জাতিভেদের কর্তা।” * * * * * কাল সহকারে হিন্দু সমাজের লেবর ও আয়তন বর্দ্ধিত হইলে হিন্দুগণ স্বাভাবিক নিয়ম বলে ভিন্ন ভিন্ন বসি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত ব্যবসার মধ্যে যেগুলি অর্থকর অনেকেই সেই পথে যাইতে গিলেন। এইরূপে সমাজস্থ ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বসি অবলম্বন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ যত দিন কৃষি কার্যে ব্যয়গণের সুবিধা থাকে, তত দিন সকলেই কৃষক হয়, আবার যিক লোকে কৃষক হইলে উহাতে লাভ অধিক থাকে না। তখন

আবার কৃষকদের মধ্যে কতকগুলি লোক বাণিজ্য ব্যবসা অবলম্বন করে । এইরূপে যুদ্ধ বা বিগ্রহের সময় কৃষকদের বিনাশ হইয়া গেলে কে কৃষিকার্য্য করিবে তাহার নির্ণয় হয় না । ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা শ্রেণীবদ্ধ না থাকাতে এইরূপ নানাবিধ অসুবিধা ঘটে । অন্য অন্য দেশেও এইরূপ অসুবিধা হইয়া থাকে । সর্ব্ব দেশেই এ অসুবিধার সময়ে এক শ্রেণীর লোক বলবান্ হইয়া অন্য অন্য শ্রেণীকে পরাজিত করিয়া রাখে । যখন যুদ্ধ জীবগণ বলবান্ হয়, তখন শ্রমজীবীদের দুর্দশার সীমা থাকে না । হিন্দু সমাজেও বোধ হয়, অনেক বার এইরূপ এক শ্রেণীর উন্নতি ও অন্য শ্রেণীর অবনতি হইয়াছিল । বহুবার একাপে বহু প্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়া হিন্দু সমাজ দেখিল শ্রেণী বা জাতির স্পষ্ট নির্দেশ ও সীমা না থাকিলে, সকল শ্রেণীবই অবনতি ও অসুবিধা হয় । এজন্য সকলের সম্মতি ক্রমে সর্ব্বপ্রকার শ্রেণীর মধ্যে সুবিধা ও অসুবিধার অংশ সমান রূপে বণ্টন করিয়া দিয়া সমাজ মধ্যে চাতুর্ক্যের প্রচার করা হইয়াছিল ।

প্রথমে ব্রাহ্মণ । ইহার সুবিধা কি কি ? শারীরিক পরিশ্রমের অভাব, সকলের নিকট পূজা ও সম্মাননা গ্রহণ ; শাস্ত্র পাঠে অধিকার । ইহার অসুবিধা কি কি ? অহোরহঃ মানসিক পরিশ্রম, দারিদ্র্য, সাংসারিক ও শারীরিক সকল প্রকার সুখে বিতৃষ্ণা ; এক বেলা ভোজন ; পঞ্চাশের পর অরণ্য বাস । তাহার পর ক্ষত্রিয় ;—ক্ষত্রিয়ের সুবিধা কি কি ? রাজ্য ভোগ, ঐশ্বর্য্য, বিলাস, শাস্ত্রে অধিকার । ক্ষত্রিয়ের অসুবিধা কি কি ? সর্ব্বদা প্রাণহানির আশঙ্কা, রাজকার্য্যের জন্য সর্ব্বদা মস্তিষ্ক সঞ্চালনা ও চিন্তা, পঞ্চাশের পর অরণ্য বাস ।

তাহার পর বৈশ্য, বৈশ্যের সুবিধা কি কি ? ঐশ্বর্য্য, বিলাস, শাস্ত্রে অধিকার । ইহার অসুবিধা কি কি ? পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ হইতে সর্ব্বদা দূরে অবস্থান, পঞ্চাশের পর অরণ্য বাস ।

তাহার পর শূদ্র । শূদ্রের অসুবিধা কি কি ? নির্ভাবনা, আশাচ্ছাদন সম্বন্ধে ভাবনারাহিত্য ; চিরকাল গৃহস্থাশ্রমের অধিকার, মানসিক স্বচ্ছন্দতা । ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জীবনে নানাবিধ দুর্ঘটনা সম্ভবপূর্ণ । ক্ষত্রিয় যুদ্ধে পরাজিত হইতে পারেন । বৈশ্য বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন । কিন্তু শূদ্রের জীবনে এরূপ দুর্কির্পাক একবারেই অসম্ভব । শূদ্র চিরকাল পরিবারবর্গের মধ্যে অবস্থান করিতে পারেন । শূদ্রের অসুবিধা কি কি ? দারিদ্র্য, অশ্রমের সেবা, শারীরিক পরিশ্রম । একটি তালিকা এই চারি বর্ণের অসুবিধা অসুবিধা দেখাইতেছি ।

বর্ণ	শারীরিক অসুখ	মানসিক অসুখ	অসুখের সমষ্টি
ব্রাহ্মণ	০	২	২
ক্ষত্রিয়	১	১	২
বৈশ্য	১	১	২
শূদ্র	২	০	২

ইহাদের মধ্যে শূদ্র সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ ভ্রম হইয়া থাকিতে পারিবে । কিন্তু শূদ্র ভিন্ন অল্প তিন বর্ণের অসুবিধা ও অসুবিধা যে সমান অংশে বণ্টিত হইয়াছিল ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি । * * * *
 * * * * এক্ষণে কৃষ্ণ জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে খাড়া বলিতেছেন তাহা শ্রবণ কর । কৃষ্ণ বলিতেছেন—“মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ ত্রিগুণাত্মক । সেই তিনটী গুণের নাম সত্ত্ব, রজঃ ও তম । দয়া, মমতা, পরোপকার প্রভৃতি কার্য্য সত্ত্বগুণের ফল । পরদ্রোহ, পরোপকার প্রভৃতি দ্বারা উদ্দেশ্য সাধন, রজোগুণের ফল । হিংসা ক্রোধ লোভ প্রভৃতি কার্য্য তমোগুণের ফল । সত্ত্বগুণে লোক সকল পরোপকারের জন্য সৰ্ব্বদা স্বার্থ বিসর্জন করেন । রজোগুণে লোক সকল সছপায় বা অসছপায় দ্বারা আত্মোন্নতির প্রয়াস

পান । তমোগুণে লোক সকল অসহুঁপায় দ্বারা আত্মোন্নতির প্রয়াস পাইয়া থাকেন । সত্বগুণের কার্যমালা পুণ্যময় ।

রজোগুণের কার্যমালা কখনও বা পুণ্যময় কখনও বা পাপদ্বারা কলঙ্কিত । তমোগুণের কার্যমালা পাপদ্বারা কলঙ্কিত । এই তিন গুণের মধ্যে সত্ব গুণ ও তমোগুণ একত্র অবস্থান করিতে পারে না । আলোক ও অন্ধকার, পাপ ও পুণ্য, পরোপকার ও পরাপকার একত্র থাকিতে পারে না । পূর্বোক্ত তিনটি স্বাভাবিক গুণ সম্বন্ধে মনুষ্যদিগের প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । প্রথমতঃ যাঁহাদের মধ্যে সত্ব গুণ প্রধান ইঁহাদের রজঃ ও তমঃ গুণ থাকিতে পারে না । দ্বিতীয়তঃ যাঁহাদের মধ্যে রজো গুণ প্রধান । ইঁহাদের মধ্যে আবার দুইটা শ্রেণী থাকিতে পারে যাঁহাদের মনে রজোগুণ অধিক পরিমাণে ও সত্বগুণ অল্প পরিমাণে কার্য্য করে, এবং যাঁহাদের মনে রজোগুণ অধিক পরিমাণে ও তমোগুণ অল্প পরিমাণে কার্য্য করে । এতদ্বিন্ন অন্য কতকগুলি লোক আছেন যাঁহাদের মনে তমোগুণ প্রধান । ইঁহাদের মনে সত্বগুণ ও রজোগুণ থাকিতে পারে না । এইরূপে মনুষ্যদিগের (শুধু হিন্দু জাতিকে নহে) চারিটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । যথা সত্ব প্রধান, সত্বরজোময়, রজস্তমোগময় ও তমঃপ্রধান । এই চারি প্রকারের লোকে স্বভাবতঃ চারি প্রকারের কার্য্য বা ব্যবসা অবলম্বন করিবে । সত্ব প্রধান ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা প্রভৃতি গুণে বিমণ্ডিত হইয়া যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যে আপনাদিগকে ব্যাপ্ত করিবে । যাহারা সত্ব রজঃ প্রধান তাহারা শৌর্য্য বীর্য্যাদি গুণে বিভূষিত হইয়া প্রজারক্ষা, যজন, দান, অধ্যয়ন, প্রভৃতি কার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিবে । যাহারা রজস্তমঃ প্রধান, তাহারা বুদ্ধি, বিবেচনা, অধ্যবসায়, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গুণে বিমণ্ডিত হইয়া কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্য অবলম্বন করিবে ।

আর যাহারা তমোগুণ প্রধান, তাহারা ক্রোধ, হিংসা, লোভ প্রভৃতি স্বভাবের হীনতাবশতঃ অল্প সকল ব্যবসায় অবলম্বনে অসমর্থ হইয়া অশ্রের প্রভু হই থাকিবে । এইরূপে মনুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন গুণ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কর্ম অবলম্বন করিবে । এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইবে । যাহারা সত্ত্বগুণ প্রধান, তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাত হইবেন, যাহারা সত্ত্বরজোগুণ প্রধান তাহারা ক্ষত্রিয়, যাহারা রজস্তমোগুণ প্রধান তাহারা বৈশ্য এবং যাহারা তমঃপ্রধান তাহারা শূদ্র হইবেন ।” (১)

এতৎ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাপাদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্, এ ; মহাশয় বলেন :—* * * * “এখন একবার কল্পনাতে তৎকালীন আর্য্য সমাজের অবস্থা চিত্রিত করিবার চেষ্টা করুন । একদিকে দেখুন, একদল দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট বিদেশী লোক আসিয়া পঞ্চনদের উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্ব বাহুবলে পরাজিত দেশকে স্বদেশ করিয়া আপনাদের গ্রাম জনপদ প্রভৃতি নির্মাণ করিতেছেন, কৃষি বাণিজ্যের আয়োজন করিতেছেন, অরণ্য সকল নিঃশেষ করিয়া মনোহর কৃষিক্ষেত্র সকল বিস্তার করিতেছেন ; উপনিবেশের প্রাপ্তবর্তী অরণ্য ভূমি সকলে মৃগয়ার্থ পর্য্যটন করিতেছেন ; এবং আপনাদের যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন । আর এক দিকে দেখুন পরাজিত আদিম অধিবাসিগণ পর্ব্বতাদিতে আশ্রয় লইয়া নিরন্তর তাঁহাদের উপর উপদ্রব করিতেছে । আর্য্যেরা যাহাতে বিরক্ত হইতেন এই সকল অসত্য দস্যুগণ তাহাই করিতেছে । আর্য্যেরা ইহাদিগকে আমমাংস ভোজী বলিয়া ঘৃণা করেন স্নাতরাং ইহারা ছুটামি করিয়া তাঁহাদের যজ্ঞ ভূমিতে আমমাংস প্রভৃতি বর্ষণ করিতেছে ; হঠাৎ বন্যাস্তর হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাদের রমণীদিগকে পথে পাইলে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে । আপনারা প্রাচীন যে সকল পৌরাণিক

কথাতে ধাযিদিগের উপর ব্রাহ্মদিগের উপদ্রবের বিবরণ শুনিতে পান, তাহাতে এই সকল উপদ্রবেরই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক যখন প্রতিনিয়ত দস্যুগণের উপদ্রব চলিতে লাগিল এবং তাঁহাদের ভয়ে স্থখশান্তিতে শ্রমের অন্ত ভোগ করা আর্যদিগের পক্ষে দুষ্কর হইয়া পড়িল, তখন আর্যগণের আত্মরক্ষার বিশেষ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইল। তাঁহারা লোক বাছিয়া আপনাদের গ্রাম ও জনপদ সকলের প্রান্তভাগে স্থাপন করিলেন। ইহা বা সশস্ত্র হইয়া দলে দলে স্বীয় অধিকার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ইহাবাই ক্রমে ক্ষত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ক্ষত্র শব্দের অর্থ—যাহা বা ক্ষয় হইতে রক্ষা করে। এই অর্থের সহিত বর্ণিত ঘটনাব চমৎকার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। এই ক্ষত্রগণ আদিতে অবিভক্ত আর্য সমাজের অঙ্গীভূত ছিলেন; তখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্র প্রভৃতি প্রভেদ ছিল না, কর্মভেদ বশতঃ এই সকল প্রভেদ উৎপন্ন হইল। পূর্বে একমাত্র জাতি ছিল, তাহা হইতে ক্ষত্র প্রভৃতি উৎপন্ন হইল ইহা একটা প্রমাণ মহাভারত হইতে দেওয়া হইয়াছে। আর একটা প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে—

“ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসিৎ একমেব, তদেকং সৎ নব্যভবৎ। তচ্ছ্রয়ো রূপং অত্যসৃজত ক্ষত্রং।

অর্থ—“অগ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। ঐ জাতি একাকী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না—সুতরাং সেই শ্রেষ্ঠবর্ণ (ব্রাহ্মণ) ক্ষত্রকে সৃষ্টি করিলেন।” যাহারা বেদ বা স্মৃতি কিছুমাত্র পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে ব্রহ্ম শব্দ ব্রাহ্মণ অর্থে ভুরি ভুরি স্থলে প্রয়োগ হইয়াছে; এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ। উপনিষদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ, এতদ্দেশে উহা বেদ বলিয়া আদৃত, সুতরাং দেখুন আমি জাতিভেদের যে বিবরণ দিতেছি তাহার প্রমাণ বেদের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

দেখুন তবে কেমন করিয়া প্রাচীন আর্য্য সমাজের শূদ্র ও ক্ষত্র দুইটী জাতির সূত্রপাত হইল। এখন প্রশ্ন হইতে পারে অবশিষ্ট আর্য্যগণ কি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কিয়দংশ লোককে একটী গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইল। সে কার্য্যটী কি? আপনারা স্মরণ রাখিবেন যে, যে সময় বেদের প্রাচীন মন্ত্র সকল রচিত হইয়াছিল, সে সময় ঐ সকল মন্ত্র কঠিন রাখিতে হইত। আর্য্যেরা যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন তাহার পূর্বাধিই তাঁহাদের মধ্যে সোম যজ্ঞ ও অগ্নির উপাসনা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। বর্তমান পারসীকদিগের প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রে এইগুলির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতেরা প্রভূত গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে বর্তমান হিন্দুগণের ও বর্তমান পারসীকদিগের পূর্বপুরুষগণ ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্বে একত্রে বাস করিতেন। সুতরাং অগ্নির উপাসনাদি সেই সময়কার ধর্ম্মাচরণ হইবে। যাহা হউক অতি প্রাচীনতম কাল হইতে অগ্নির উপাসনাদি ও তদর্থ রচিত মন্ত্র সকল দৃষ্টিগোচর হয়। আর্য্যেরা যখন অত্যাশ্রিত গিরিগণ্ডিত, বহনদ পরিধৌত ও শস্যশ্যামলক্ষেত্র-পূর্ণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন এখানকার প্রকৃতির গম্ভীর ও মনোহর ভাব সকল সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদের চিত্তে কবিত্ব শক্তির সমধিক আবির্ভাব হইতে লাগিল। যখন তাঁহারা উষাকালে নবোদিত সূর্য্যের তরল কিরণছটা দ্বারা অলুপ্ত নীলাকাশ দেখিতে লাগিলেন, যখন নিদাঘের প্রথর তাপের পর প্রারুঢ় কালের নব মেঘমালার ঘন নীলিমা প্রত্যক্ষ করিলেন, যখন গিরিপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ বন্যাসমূহের কল্লোলিত জলরাশি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়সাগরে অপূর্ব ভাবতরঙ্গ সকল উথিত হইতে লাগিল এবং মস্তক পর মন্ত্র সকল রচিত হইতে লাগিল।

ঋগ্বেদ এই সকল কবিত্ব-রসপূর্ণ সঙ্গীত লহরীর সমষ্টি মাত্র। ইহার স্থানে স্থানে কবিত্ব কি সুন্দর। কি আশ্চর্য্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য গ্রহণের

শক্তি । কি হৃদয় মুগ্ধকর মানব প্রাণের স্বাভাবিক ছবি ! বেদমন্ত্রকার কবিগণ বর্ষাকালের ভেকের ক্রোকা ধ্বনির মধ্যেও এক প্রকার অপূর্ব মাধুরী অনুভব করিয়াছিলেন । এই সকল বেদমন্ত্রকে কবির কবিত্ব বল, বিহঙ্গমের স্বাধীন কণ্ঠের সম্মীতধ্বনি বল, সৌন্দর্য্য-মোহিত মানবহৃদয়ের উচ্ছলিত ভাবরাশি বল, তবে ঠিক বলা হইল ; কিন্তু শাস্ত্র বল, ধর্ম্মোপদেশ বল, লৌকিক কি আধ্যাত্মিক বিধি ব্যবস্থা বল, ঠিক বলা হইল না । যাহা হউক আর্য্যগণ পুণ্যারণ্য ভারতক্ষেত্রে যখন তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন—তখন তাঁহাদের মন্ত্র সকলের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল । এই সময় বর্ণমালার সৃষ্টি হয় নাই । সুতরাং এক শ্রেণীর লোককে যজ্ঞসহকারে এই সকল মন্ত্র অভ্যাস করিয়া রাখিতে হইত । ইঁহারা বালককাল হইতে ঐ সকল মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিতেন । যজ্ঞস্থলে ঐ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হোমকার্য্যের সহায়তা করিতেন । বর্ত্তমান সময়ে আপনার, পল্লীগ্রামে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান দেখিয়া থাকিবেন, ইঁহারা বর্ণজ্ঞান বিহীন, সংস্কৃত ভাষা বিন্দুবিসর্গ জানেন না—অথচ ইঁহারা দশকর্ম্মাবিত, অর্থাৎ গৃহস্থের গৃহে যে সকল নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়—তাহার সমুদয় প্রকরণ ইঁহারা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন । জিজ্ঞাসা করুন পিতৃশ্রাদ্ধ কিরূপে করিতে হয় ? অমনি ইঁহারা শ্রাদ্ধের মন্ত্র সকল অনর্গল বলিয়া যাইবেন । ‘মধুবাতা ধাতায়তে’ প্রভৃতি মন্ত্র সকল পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন । শুদ্ধ হউক অশুদ্ধ হউক যেক্রপ শিখিয়াছেন অবিকল আবৃত্তি করিতে পারিবেন । বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাহায্যের জন্য যেমন এক শ্রেণীর দশকর্ম্মাবিত লোক দৃষ্ট হয়, প্রাচীন আর্য্য সমাজের বেদমন্ত্র সকলের রক্ষা ও শিক্ষার নিমিত্ত এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত হইয়াছিলেন । ইঁহারাই উত্তরকালে ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন । ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ যিনি ব্রহ্মকে জানেন—বা ধারণ করেন ।

প্রাচীন সংস্কৃতে ব্রাহ্ম শব্দের অনেক অর্থ—এক অর্থ ঈশ্বর, দ্বিতীয় অর্থ ব্রাহ্মণ জাতি, তৃতীয় অর্থ বেদমন্ত্র । এখানে ব্রাহ্ম অর্থে বেদমন্ত্র । বেদমন্ত্র যাহারা ধারণ করেন, তাহারা ব্রাহ্মণ ।

মহু বলিয়াছেন—

উত্তমাজ্জোহুবাৎ জ্যেষ্ঠাৎ ব্রাহ্মণৈশ্চ ধারণাৎ ।

সর্বশৈবাস্ত সর্গস্ত ধর্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ ॥

মহু, ১ম অধ্যায় ।

“উত্তমাজ্জ হইতে উৎপন্ন হওয়াতে, জ্যেষ্ঠতা নিবন্ধন এবং বেদমন্ত্রের ধারণ নিবন্ধন ব্রাহ্মণ এই সমুদয় সৃষ্টির প্রভু ।”

এইরূপে যখন প্রাচীন আর্য্যসমাজের একাজ্জ সশস্ত্র হইয়া সমাজ রক্ষা ব্রতে ব্রতী হইলেন—এবং অপরাজ্জ বেদমন্ত্র সকল শিক্ষা ও শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তখন সমাজের অপর সকল লোক——ইহাদেরই সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল,——কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতিতে নিযুক্ত হইয়া অর্থোৎপাদনে রত হইলেন । বেদে ইহারা “বিশ” শব্দে উক্ত হইয়াছেন । বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষাতে “সাধারণ” এই শব্দ ব্যবহার কবিলে যেরূপ অর্থ বোধ হয়, বেদমন্ত্র সকলে “বিশ” শব্দে সেই প্রকার অর্থ । বিশ অর্থাৎ প্রজাবর্গ । এই কারণে “বিশাম্পতিঃ” শব্দের অর্থ রাজা, যিনি প্রজাদিগের প্রভু ।

দেখুন তবে কেমন অপরিহার্য্য কারণে আদিম আর্য্যসমাজ মধ্যে চারি প্রকার জাতির সূত্রপাত হয় । প্রথম যখন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন, তখন জাতিভেদের বর্ত্তমান চিহ্ন সকল কিছুই বিদ্যমান ছিল না । অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদের যে তিনটি প্রধান চিহ্ন দৃষ্ট হয় । (১ম) নিম্ন জাতীয়দিগের অন্নপান গ্রহণ নিষেধ, (২য়) ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ নিষেধ, (৩য়) জাতির প্রভেদ

অনুসারে ব্যবসায়ের বিভিন্নতা । আদিম আৰ্য্য-সমাজে এই সকল চিহ্নের কোনটাই লক্ষিত হয় না । এগুলি প্রবল দলাদলি ও বৈর ভাবের ফল-স্বরূপ, সুতরাং এগুলি সামাজিক নিয়মরূপে পরিগণিত হইতে অনেক শতাব্দী লাগিয়াছিল । বরং শাস্ত্রে এমন ভুরি ভুরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, বর্তমান সময়ে জাতি যেমন জন্মগত, গুণগত নয়, পূর্বে তাহা ছিল না । উৎকৃষ্ট বর্ণের হীন বর্ণত্ব প্রাপ্তি, এবং হীন বর্ণের উত্তম বর্ণত্ব প্রাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায় । * * *

এখন একটি কথা আপনারা স্মরণ রাখিবেন । বর্তমান সময়ে সভ্য-সমাজে সাধারণ শিক্ষার যেমন রীতি দৃষ্ট হয়, আদিম আৰ্য্য সমাজে তাহা কখনই ছিল না । অর্থাৎ এখন যেমন একটি বিদ্যালয়ে তুগি আমি দশ জন আপনাপন অবস্থা ও শক্তি অনুসারে আমাদের সন্তানদিগকে প্রেরণ করিতে পারি, দশ দিক হইতে দশ শত বালক বালিকা আসিয়া প্রতিদিন শিক্ষা করিতে পারে, প্রাচীন ভারত-সমাজে একপা বিদ্যালয় ছিল না । তখন বিদ্যার্থীদিগকে গুরুকুলে বাস করিতে হইত এবং গুরুদিগের প্রতি কঠোর শাসন ছিল, তাঁহারা ভূতি বা বেতন গ্রহণ করিতে পারিতেন না, পরন্তু শিষ্যগণকে অন্ন দিয়া পুষিতে হইত । শিষ্যগণ গুরুগৃহে বাস ও গুরুগৃহের পরিচর্যায় নিযুক্ত হইয়া দিনাতিপাত করিতেন । বিশেষ তখন বর্তমান সময়ের মত গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না ; মুদ্রাঘট্ট না থাকাতে অতি কষ্টে অনেক পরিশ্রম সহকারে বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত সুতরাং ব্যুৎপন্ন গুরুর সংখ্যা অধিক হইত না । যে সকল ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি শাস্ত্রবিশারদ বলিয়া প্রতিষ্ঠাবান্ হইতেন, বহুদূর হইতে শিষ্যগণ আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আসিয়া বাস করিত । এইরূপ অবস্থায় যাহার যে বিদ্যা ছিল তাঁহার নিজ বংশীয় বালকদিগকে শৈশব অবস্থা হইতেই শিক্ষা দেওয়াই স্বাভাবিক । মানুষ যে বিষয়ে প্রতিষ্ঠা বা গৌরব লাভ করে

তাহা নিজ বংশে রক্ষা করিবার ইচ্ছা স্বতঃই উদ্ভূত হয় । এই সকল কারণেই দেখিতে পাই এ দেশে সকল প্রকার বিদ্যাই কৌলিক হইয়া যায় । এখানে নৈয়ায়িকের ছেলে নৈয়ায়িক, শ্রীকৃষ্ণের ছেলে শ্রীকৃষ্ণ, দেওয়ানের ছেলে দেওয়ান, বৈদ্যের ছেলে বৈদ্য । যিনি যখন যে বিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনিই তাহা নিজ বংশধরদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন ।

আপনারা এই বিষয়টী স্মরণ রাখিলেই কিরূপে বর্তমান জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইল তাহা বুঝিতে পারিবেন । যাহারা মশাজ্ঞ হইয়া দেশ রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারা যুদ্ধ বিদ্যাতে যে নিপুণতা লাভ করিলেন, তাহা তাঁহাদের বংশ পরম্পরাতে থাকিল,—যাহারা বেদমন্ত্র সকল রক্ষা ও শিক্ষা করিতে লাগিলেন সেই কার্য্য তাঁহাদের কৌলিক কার্য্য হইল,—যাহারা কৃষি ও বাণিজ্যাদিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারা আপন আপন সম্ভানদিগকে উক্ত বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন । এমন কি আপনাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, যে বিদ্যা এ প্রকার কৌলিক হয়, লোকে সর্বদাই যত্নপূর্ব্বক তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকে ও তত্পরিত্ব অপব্যয় সহজে অধিকার স্থাপন করিতে দেয় না ? আপনারা সমাজ মধ্যে প্রতিদিন হাজার হাজার প্রকার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতেছেন, সুতরাং এই কথার প্রমাণ দিবার জন্ত আর ব্যগ্র হইবার প্রয়োজন নাই । যখন বেদমন্ত্র রক্ষকগণ আপনাদের কর্ম্মের জন্ত গৌরব ও স্পর্ধা করিতে লাগিলেন এবং দেশ রক্ষক ক্ষত্রগণ স্বীয় কার্য্যের গৌরব ঘোষণা করিতে লাগিলেন তখন অল্পে অল্পে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিদ্বেষ ভাবের সৃষ্টি হইল, এবং ক্রমে ক্রমে বর্তমান কঠিন নিয়ম সকল দেখা দিল ।”

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, বলেন :—“আদিম কালে কৃষি যাজন যুদ্ধাদি জীবিকা-ভেদজনক বর্ণ বিচার বা বংশানুক্রমে পুরোহিত বা

রাজার প্রথা তখন ছিল না। শ্রামণ শস্ত্র ভরা প্রভূত ক্ষেত্রের অধিস্থাণী যেমন স্বহস্তে ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেন আবার তেমনি বারুবলে স্বগ্রাম, আত্ম-জীবন ও অর্থ প্রভৃতি রক্ষা করিতেন। যুদ্ধান্তে গৃহে ফিরিয়া তাঁহারাই আবার সুন্দর ভাষায় মন্ত্ররচনা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করিতেন। তখন দেব মূর্তিও ছিল না, দেব গৃহও ছিল না, পূজা বিধির নানাবিধ আড়ম্বরও ছিল না।”

তারপর আর্য্যগণ শক্তি ও সুবিধা অনুযায়ী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। এক এক শ্রেণী এক এক কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে এই কার্য্য বা ব্যবসায় বংশগত হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের পুত্রগণ সাধারণতঃ যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি ; ক্ষত্রিয় পুত্রগণ যুদ্ধ বিগ্রহাদি ; বৈশ্য পুত্রগণ কৃষিকর্ম্ম বাণিজ্যাদি ও শূদ্র পুত্রগণ তিন বর্ণের সেবাদি কার্য্যে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে বহুদিন অতিবাহিত হইবার পর সাধারণ লোক অর্থাৎ বৈশ্য শূদ্রগণ পুরোহিতদিগের চরণে বিবেক বুদ্ধি অর্পণ করিয়া জ্ঞানালোচনা, বিদ্যাচর্চা এবং ধর্ম্মচিন্তার হস্ত ও কণ্ঠ হইতে মুক্তিলাভ করিল। আবার দেহ ধন ঐশ্বর্য্যাদির ভার ক্ষত্রিয়ের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। কাজেই সময় ও সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ঈদৃশলোকের সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। পুরোহিতেরা সাধারণ লোকদিগকে মুর্থ ও অশুদ্ধ বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন, আর ক্ষত্রিয়েরা নিস্তেজ কাপুরুষ বণিক ও কৃষকদিগের রক্ত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিলেন। পুরোহিত ও ক্ষত্রিয়ের এইরূপ ব্যবহার বৈশ্য ও শূদ্র সাধারণ দ্বিরুক্তি না করিয়া সহ্য করিতে লাগিলেন।

এই সময়ের অবস্থা আলোচনা করিয়া ও ব্রাহ্মণ প্রাধাত্যের ক্রমবিকাশ কারণ নির্দেশ করিয়া শ্রীযুক্ত পি, এন, বসু মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত Hindu civilisation under British Rule গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

“Blind followers are always the most thorough going and the most zealous, outside the narrow and secret precincts of an interested group of Brahmans, there was no one now to dispute or even question their authority Whatever the Brahmans now uttered or wrote was accepted as an infallible truth. If any Brahman wanted to countenance a particular tribe, he had only to declare that it was sanctioned by the Sastras. But whether he was right or wrong, whether he had mis-interpreted or not, very few were in a position to judge.....Thus sprang up an infinity of caste rules and regulations, chiefly local, some universal, but mainly something more than merely conventional or customary.”

দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য সমাজে বদ্ধমূল হইয়া উঠিল । আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে সমাজ চলিবে, রাজ্য শাসিত হইবে, সেই শক্তি তখন ব্রাহ্মণের হস্তে ; তাই ক্ষত্রিয় যখন রাজা হইলেন ব্রাহ্মণ তাঁহার পরামর্শ দাতা হইলেন । ক্ষত্রিয় বাহু, ব্রাহ্মণ মস্তক ; ক্ষত্রিয় শক্তি ব্রাহ্মণ বুদ্ধি । সুতরাং ব্রাহ্মণের প্রাধান্য যে দিন দিন নিরঙ্কুশ হইবে তাহার আর সন্দেহ কি ?

অতঃপর ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয় প্রভুত্বও উন্নতি হইতে লাগিল । তাই তাঁহারা তখন ব্রাহ্মণের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য লোলুপ হইলেন ।

শ্রীযুক্ত পি, এন, বসু মহাশয় বলেন :—But the extravagant

pretensions of the Brahmanic priesthood were, as we also saw shortly after disputed by the other members of the Aryan community, especially the Kshatriyas.”

পরে বহুদিন পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে একটা সংঘর্ষের পরিচয় ইতিহাস সাক্ষ্যদান করিয়াছেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, পরশুরাম শ্রীরাম, বেন নহুষ নিমি প্রভৃতির উপাখ্যান তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব যজ্ঞে ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ সর্বোত্তম পদে বৃত্ত হইয়াছিলেন—এবং পবে সময় সময় বৈশ্য শূদ্রও কখন কখন শক্তি ও সাধনা বলে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের সম্মাননীয় হইয়াছেন। কিন্তু তাহা সমুদ্রে বারিবিন্দু প্রায় নিতান্তই সামান্য! নৈমিষারণ্যে ষষ্টি সহস্র ঋষি পরিবৃত্ত পরিষদে শূদ্র স্মৃত পুরাণ বক্তার পদ অলঙ্কৃত করিয়া ঋষিগণকে ধর্মতত্ত্ব শ্রবণ ও ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণাধিকার বিস্তৃত ও ব্রাহ্মণ প্রাধান্য রক্ষার নিমিত্ত পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগণ সাম্যভাব জলাঞ্জলী দিয়া—নিরপেক্ষ সমদর্শন ডুবাইয়া দিয়া—মনু আদি সংহিতা পুস্তকে ব্রাহ্মণেতর জাতি সম্বন্ধে সূকঠোর অনুশাসন চালাইতে লাগিলেন। শূদ্রদিগের সম্বন্ধে তাহা কথাই নাই।

সপ্তম অধ্যায় ।

সঙ্কর বর্ণ ।

আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, আদিযুগে একমাত্র বর্ণ ছিল । ‘এক বর্ণ আসীৎ পুরা’ । পরে গুণ ও কর্ম অনুযায়ী তাঁহারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন ; এই চারি বর্ণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ বা সঙ্করজাতি সম্বন্ধে শাস্ত্র ও ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে তেমন কোনও উল্লেখ নাই । মনু বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণাঃ দ্বিজাতয়ঃ ।

চতুর্থ এক জাতিস্ত শূদ্র নাস্তিতু পঞ্চমঃ ॥

অর্থাৎ “ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, চতুর্থ বর্ণ শূদ্র একজাতি । ইহা ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই ।” সুতরাং বর্ণ-সঙ্করের কথা যাহা বৃহদ্রক্ষপুরাণ মনুসংহিতাদিতে উল্লিখিত হইয়াছে উহা অতি আধুনিক । আধুনিক না হইলে ইহাদের বৃত্তান্ত পূর্ব পূর্ব গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচিত হইত । মনুসংহিতা যে অত্যন্ত আধুনিক, ইহা স্মৃতি নামেই বিদিত আছেন । এই মনুসংহিতায় যাহাদিগকে সঙ্করজাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহারা বাস্তবিকই সঙ্করজাতীয় কি না সে সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দেহ বিদ্যমান । এ সম্বন্ধে আমরা যথাসম্ভব বিস্তারিতরূপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । “শুক্ল যজুর্বেদ ঋগ্বেদের অনেক পরে রচিত হইলেও, ইহা যে আদিম কালেরই অন্ততম গ্রন্থ, ইহা বোধ হয় বলাই বাহুল্য । ঋগ্বেদের অনেক সূক্তও ইহাতে পরিদৃষ্ট হয় । এই গ্রন্থ যে সময়ে রচিত হইয়াছিল সেই সময়কার সামাজিক অবস্থা ইহা হইতে অনেকটা জানা যায় । ইহার শত ব্রহ্মীয় নামক ষোড়শ অধ্যায়ে অনেক ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু

কোনও জাতিবিভাগের উল্লেখ নাই। আদিম অধিবাসী নিষাদদিগেরও ইহাতে উল্লেখ আছে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে পববর্তীকালে এই নিষাদেবাই ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রানীর গর্ভজাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

“পুরুষ মেধ” নামক ত্রিংশৎ অধ্যায়ে আমরা ব্রাহ্মণ, রাজত্ব, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যান্য কতকগুলি ব্যবসায় এবং আদিম অধিবাসীর নামোল্লেখ দেখিতে পাই। পৌরাণিক সময়ে তাহাদিগকেই কতকগুলি বিভিন্নজাত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ত্রয়োদশ ও ষোড়শ অধ্যায়ে আমরা নিম্নলিখিত ব্যবসায় ও আদিম অধিবাসীর নাম দেখিতে পাইঃ—স্থপতি, স্তেন, স্তায়ুঃ, তক্ষর, মুঞ্চঃ, কুলঞ্চঃ (বিভিন্ন প্রকারের চোর ডাকাইতের নাম), সারথি, তক্ষার (স্থত্রধর), রথকার, কুলাল, কৰ্ম্মকাব, নিষাদ। এই সমুদয় ব্যবসায়ীরা স্মৃতি এবং পুরাণাদিতে সঙ্করবর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। স্মৃত বা সারথিকে ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতা হইতে, তক্ষার বা স্থত্রধরকে করণ পিতা বৈশ্য মাতা হইতে, কৰ্ম্মকারকে শূদ্র পিতা ও অব্যক্ত মাতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। আর্য্য সমাজে কি বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ অবৈধ প্রণয় করিবার পূর্বে কুলাল, কৰ্ম্মকার, স্থত্রধর প্রভৃতি ব্যবসায় আদৌ ছিল না?

“পুঞ্জিষ্ঠেয় (আদিম অধিবাসী), শ্বনি (অনার্য্য জাতি বিশেষ), মাগধ (অনার্য্য জাতি বিশেষ) পুবাণে এই জাতি বৈশ্য পিতা ও ক্ষত্রিয় মাতা হইতে সম্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। স্মৃতও সঙ্কর বর্ণ বলিয়া উল্লিখিত আছে, কোন স্থানে ক্ষত্রিয় পিতা ব্রাহ্মণী মাতা ও কোন স্থানে বৈশ্য পিতা ক্ষত্রিয় মাতা হইতে সম্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অযোগ (খনিতে কার্য্যকারী), পুংশ্চলু (পরদার অভিঘর্ষকা), শৈলুঘ (নট), খনিকার, বপ (কৃষক), ইয়ুকার, ধনুষ্কার, ভিষক, জাতি প্রথা প্রচলিত হওয়ার পরেও ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসক ছিলেন। কিন্তু এখন চিকিৎসক

ব্যবসায়ীকে ব্রাহ্মণ পিতা বৈশ্য মাতা হইতে সম্ভূত বলিয়া, বলা হইয়া থাকে)। নক্ষত্রদর্শ, হস্তিপ, (মাহুত), অশ্বপ (সহিস), গোপাল, সুরাকার, গৃহপ (দ্বারবান), বিত্তধ (খাজাঞ্চী), অমুক্ষতা (চাকর), দার্বাহার (কাঠুরিয়া), অগ্ন্যেধ (আলোওয়াল), অভিযেতা (পাচক), পরিবেশনকর্তা, পেশিত (চিত্রকর), প্রকরিতা (খোদাইকর), উপসেক্তা (স্থানকারক), উপমস্থিতা (তৈল মর্দনকারী), বাসপুলালী (রজক), রজায় স্ত্রী (রজদার), স্তেনহৃদয় (নরসুন্দর), ক্ষতা (সারথী), চর্ম্ম (চর্ম্মকার), ধীবর, কৈবর্ত (ইহাদিগকেও পুরাণে বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে)। কিরাত (অনার্য্য জাতি বিশেষ) পৌন্ড্রক (অনার্য্য জাতি বিশেষ), ছর্ম্মদ, ভিমল (অনার্য্য জাতি বিশেষ)। আভির বা গোপাল, রজক, নরসুন্দর, সারথী, চর্ম্মকার, ধীবর, কৈবর্ত ইত্যাদিদিগকেও পুরাণে ও সংহিতায় বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উপরিউক্ত ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে আভিরকে গোপ পিতা ও বৈশ্য মাতা হইতে, চর্ম্মকারকে আভির পিতা বৈশ্য মাতা হইতে, ধীবরকে গোপ পিতা ও শূদ্র মাতা হইতে, নটকে মালাকার পিতা ও শূদ্র মাতা হইতে সম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

উপরের লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, কতকগুলি অনার্য্য জাতি এবং কতকগুলি ব্যবসায়ের নামমাত্র ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে গায়ক, কবি, বিভিন্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোক, বোবা, অন্ধ, কাদা এবং কতকগুলি অগ্ন্যেধ নানারকম নামোল্লেখও আছে। মাগধ, নিষাদ, ভীমল, মৃগয়, এবং শ্রুনি প্রভৃতির অনার্য্য জাতি। যজুর্বেদের ঐ দুই অধ্যায়ে যে সমস্ত ব্যবসায়ের উল্লেখ আছে, তাহা হইতে আর্য্যজাতির ঐ সময়ে সভ্যতার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, আমরা তাহাই অবগত হই। কিন্তু সঙ্করজাতি-বিভাগের সহিত উল্লিখিত জাতিদিগের কোনও সংশ্রব

নাই। সঙ্করজাতি উৎপত্তি না হওয়া পর্যন্ত আর্য্যদিগের মধ্যে কর্মকার কুস্তকার সূত্রধর সারথি রত্নাকর চিত্রকর চর্ম্মকার প্রভৃতি ব্যবসায়ী লোক ছিল না, এরূপ অনুমান করা অসম্ভব ও অত্যাচার। বৈদিক সময়ে যে কেবল কোন জাতি-বিভাগ ছিল না তাহা নহে, কিন্তু সে সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট ব্যবসায়ও ছিল। পরবর্ত্তী সময়ে যদিও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা বিশেষ ক্ষমতাসালী হইয়াছিলেন তথাপি তখনও বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী আর্য্যেরা একই জাতি ছিলেন। স্মার্ত্ত ও পৌরাণিক সময়ে বিভিন্ন ব্যবসায়াবলম্বী আর্য্যগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। প্রাচীন সময়ে পৌরহিত্য ও যুদ্ধ ব্যবসায়িগণ অবশ্য বিশেষ ক্ষমতাসালী ছিলেন কিন্তু জাতি শব্দে বর্ত্তমান সময়ে আমরা যাহা বুঝি, প্রাচীন ভাবে সেরূপ কোন জাতি-প্রথা প্রচলিত ছিল না। অনেক ব্যবসা বংশগত হইয়া উঠিলেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকে জানিত যে, তাহারা একই জাতি। তাহারা একত্র পানাহার করিত, পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি কার্য্য হইত, একই ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হইত; তাহারা একই জাতীয় ইতিহাসে ও একই পূর্বপুরুষের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিত”। (১)

“বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধে মনুসংহিতাই প্রধান পুস্তক। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইহা একখানি আধুনিক পুস্তক। পণ্ডিতগণ বলেন যে, ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। মনুসংহিতাই ভারতের প্রাচীনতম ব্যবহার শাস্ত্র নহে, আপস্তম্ব, বৌদ্ধায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ খৃষ্টীয় অব্দের ২০০ হইতে ৬০০ বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছে। পদ্য মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক। মনুসংহিতা অল্পষ্টু পৃচ্ছন্দে রচিত। কিন্তু সূত্রশাস্ত্র রচনাকালে,

অনুষ্ঠাপ্চ্ছন্দে, বিস্তৃত গ্রন্থ রচনাকালে ব্যবহৃত হইত না। এই পদ্যময় স্মৃতিগুলি প্রাচীন স্মৃত্তশাস্ত্রের পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আধুনিক সংস্করণ মাত্র। মনুসংহিতা কৃষ্ণ যজুর্বেদান্তর্গত মৈত্রেয়ণ শাখার উপরিভাগ মানব স্মৃত্তচারণের ধর্মস্মৃত্ত হইতে পদ্যে রচিত হইয়াছে। আমরা বর্তমানে মনু-সংহিতা বলিয়া যে গ্রন্থ দেখিতে পাই, তাহা ভৃগুর রচিত; কিন্তু তাহা মনুর রচিত বলিয়া উল্লিখিত আছে।”

আমরা এক্ষণে মনুসংহিতা ও বৃহদ্রশ্মপুরাণসম্মত কতিপয় প্রধান প্রধান বর্ণসঙ্কর জাতির উল্লেখ করিয়া তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পিতার বর্ণ	মাতার বর্ণ	উৎপন্ন বর্ণ	পিতার বর্ণ	মাতার বর্ণ	উৎপন্ন বর্ণ
ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	অশ্বষ্ঠ	করণ	বৈশ্য	তক্ষ বা
ঐ	শূদ্র	নিষাদ বা			স্মৃত্তধর এবং রজক ।
		পারশব ।	ব্রাহ্মণ	অশ্বষ্ঠ	আভির ।
ঐ	ঐ	বারুজীবী ।	গোপ	শূদ্র	ধীবর ও সূড়ি
ক্ষত্রিয়	ঐ	উগ্র ।	মাগধ	ঐ	শেখর,
ঐ	ব্রাহ্মণ	সূত ।			জালিক ।
বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	মাগধ, গোপ ।	আভীর	... বৈশ্য	... তক্ষ বা
ঐ	ব্রাহ্মণ	বৈদেহ ।			চর্মকার ।
শূদ্র	বৈশ্য	অযোগব ।	রজক	... ঐ	... ঘটজীবী ।
বৈশ্য	শূদ্র	করণ ।	তেলকার	... ঐ	... দোয়াবাহী ।
শূদ্র	ব্রাহ্মণ	চণ্ডাল ।	নিষাদ	... শূদ্র	... পুকস ।
শূদ্র	ক্ষত্রিয়	কুন্তকার ও	ব্রাহ্মণ	... অযোগব...	ধীগবান ।
		তন্তবায় ।	শূদ্র	... ক্ষত্রিয়	... ক্ষেত্রি ।
অশ্বষ্ঠ	বৈশ্য	স্বর্ণকার ও	ক্ষত্রিয়	... শূদ্র	... নাপিত,
		সুবর্ণবণিক ।			মোদক ।

পিতার বর্ণ	মাতার বর্ণ	উৎপন্ন বর্ণ	পিতার বর্ণ	মাতার বর্ণ	উৎপন্ন বর্ণ
ঐ	... ব্রাহ্মণ ...	মালাকার ।	দেবল	... বৈশ্য ...	গণক ।
বৈশ্য	... ব্রাহ্মণ ...	তাম্বুলি ও তৈলিক ।	বৈদেহিকা	করবর ...	অন্ধু ।
মালাকার...	ঐ ...	নট, শাবক	ঐ	... নিষাদ ...	মেদ ।
দম্ব্য	... অযোগব...	সৈরিকু ।	বিপ্র	... ক্ষত্রিয় ...	মূর্দ্ধাভিষিক্ত (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা) ।
স্বর্ণকার ...	অশ্বষ্ঠ বা বৈদ্য মলগ্রাহী	(মেথর)	ক্ষত্রিয়	... বৈশ্য ...	মাহিষ্য । (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

“সংস্কার সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রথম তিন জাতি ব্রাত্য হইয়াছিলেন । ব্রাহ্মণ ব্রাত্য হইতে ভূজ্জকটক, অবস্ত্য, বাতধান, পুষ্পথ এবং শৈথ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে । ক্ষত্রিয় ব্রাত্য হইতে বল্ল মল্ল, লিচ্ছীভী, নট, করণ, গাশ এবং দ্রাবিড় জাতি হইয়াছে । এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে শুধনান, আচার্য্য, কুরুশ, বিজানমান মৈত্র জাতি হইয়াছে ।

“নীচ ক্ষত্রিয় জাতি—পৌণ্ড্রক, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শাক, পারদ, শ্লভ, চীন, কিরাত, দরদ । মনু বলেন, ব্রাহ্মণ মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে জাত জাতিদিগের মধ্যে যে সমস্ত জাতিকে গণ্য করা হয় নাই তাহারা শ্লেচ্ছভাষী হউক, কি আর্য্যভাষী হউক, দম্ব্য নামে পরিচিত ।

“মনুতে ইহার কোন কোন জাতির ব্যবসায়ের উল্লেখও আছে । সূত-গণের প্রতি গাড়ী ঘোড়ার তত্ত্বাবধানের ভার থাকিত । অশ্বষ্ঠের প্রতি চিকিৎসার ভার থাকিত । বৈদেহিকগণ স্ত্রীলোকের পরিচর্যা করিত । মাগধেরা ব্যবসায়ী ছিলেন । নিষাদেরা মৎস্য ধরিত । অযোগবেরা সূত্রধরের কার্য্য করিত । মেদ, কুণ্ডু, অন্ধ, মদগুগণ বহুজন্তু ধরিত । ক্ষত্রী, উগ্র, পুষ্ককশগণ গর্ভস্থ জন্তু ধরিত । ধীগবানেরা চন্দ্রব্যবসায়ী ছিল ; বিন্ধু

ঢাক বাজাইত । চণ্ডাল ও স্বপচদের ধন সম্পত্তি স্বরূপ কুকুর ও গর্দভ ছিল ; শ্মশানে শবের কার্যাদি করিত । উপরি উদ্ধৃত তালিকার মধ্যে আগরা বৈদ্য ও কায়স্থের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না । কিন্তু অনেকে করণ ও কায়স্থ এবং অশ্বষ্ঠ ও বৈদ্যকে একই সংজ্ঞায় নির্দেশ করিয়া থাকেন । অনেকে আবার তাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করেন না । কায়স্থ জাতির উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণে ও যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতাতে আছে । কায়স্থ সম্বন্ধে Hindu Civilisation under British Rule এ এইরূপ আছে —“Towards the close of the Buddhist Hindu period, the term Kayastha was applied not to a distinct caste but to men who were employed as scribes and taxgatherers men who in all likelihood, belonged partly to the Vaisya and partly to the Kshatriya caste.” বৈদ্যগণের সম্বন্ধেও প্রাচীন সংহিতাদি গ্রন্থে তেমন উল্লেখ নাই । মনু মাংসবিক্রেতা সুরাবিক্রেতা প্রভৃতির সহিত বৈদ্য (চিকিৎসক) সম্ভ্রদায়কে শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন ।

“The Modern Vaidya or physician caste does not also, appear in the more ancient Sanhitas such as those of Manu and Yajñavalkya. / Physicians are mentioned in those books but nowhere as distinct caste, ... Manu mentions Physicians in the same category as meat-sellers and liquor-vendors.”

(Hindu Civilisation under British Rule)

“নিষাধ জাতি—ভারতের আদিম অধিবাসী ছিল । মৎস্য ও মৃগাদি শিকার দ্বারা জীবিকার্জন করিত । মনু তাহাদিগকে সঙ্কর জাতির তালিকাভুক্ত করিয়াছেন ।” নিষাধ নামে একটি দেশ ও একটি জাতিও ছিল ।

নৈষধ চরিতের নলই তাহার রাজা ছিলেন । নিষাধ ও নিষধ একই জাতির বিভিন্ন নাম বলিয়া বোধ হয় ।

“উগ্র বঙ্গদেশের আগুরীরা এই উগ্র বলিয়া পরিচয় দেয় । কেবল অর্থাৎ অধুনিক মালাবার দেশের নাম উগ্র । মনু বলেন যে উগ্রেরা উগ্র-স্বভাবান্বিত ও নির্দয় । যে দেশের লোকেরা উগ্রস্বভাববিশিষ্ট তাহাদিগকে আর্যেরা এই উগ্র নাম দিয়া থাকিতে পারেন । গহ্বরস্থ জন্তুদিগকে বধ করাই তাহাদিগের ব্যবসায় ছিল, কিন্তু আগুরীদের অবশ্য সেইরূপ কোন ব্যবসায় নাই ।

“সূত—জাতি হয়ত গাড়ী চালাইতে সুদক্ষ থাকায় জাতি বিভাগে ঐরূপ আখ্যা পাইয়াছে । ইহা বাস্তবিক আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় এক মুহূর্তের জন্তও একবার চিন্তা করিয়া দেখেন না, যে এই সমস্ত ব্যবসায় কখনই মিশ্র বিবাহের জন্ত অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল না । কোন ক্ষত্রিয় কোন ব্রাহ্মণীর সহিত মিলিত হওয়ার পূর্বে আর্যদিগের রথচালক কেহই ছিল না একুপ অনুমান করা কি মুর্থতা নয় ?

“অযোগব—যজুর্বেদে অযোগের উল্লেখ আছে । তাহারা খনিতে লৌহখননকাৰী অনার্যজাতি বিশেষ ছিল । কিন্তু মনুর অযোগবেরা সূত্রধর ।

“ক্ষেত্রী—আগাদিগের বিশেষ সন্দেহ হয় যে, রাজপুত্রেরা যখন প্রাচীন ক্ষত্রিয়দিগের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন গোড়া হিন্দুধর্ম হইতে পৃথক ভাবে থাকায়, ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের বিরাগভাজন হওয়ায় তাহাদিগকে সমাজে নীচ অবস্থাপন্ন করিয়া সেইরূপ একটা নামও দিয়াছিলেন । পঞ্জাবে বহুতর ক্ষেত্রী আছে । বীর শিখজাতিদিগের গুরুকুলও ক্ষেত্রী । গুরু নানক ও তৎপরবর্তী অগ্রতম নয়জন গুরু এবং তাহাদের বংশধরগণ

যদিও সাধারণতঃ ক্ষেত্রী বলিয়া পরিচিত, তাহা হইলেও তাঁহারা আপনা-
দিগকে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন ।

“চণ্ডাল—অনার্য্য জাতি বিশেষ—বড়ই পরিতাপের বিষয়—সরল
শাস্ত্র ধর্ম্মশীল নমঃশূদ্রগণকে তাহাদিগের স্বজাতীয় অস্ত্র হিন্দুভ্রাতৃগণ অযথা
অত্যাচাররূপে চণ্ডাল আখ্যায় অভিহিত করিয়া—তাহাদের প্রাণে গভীর
বেদনা দিয়া থাকেন । কাজেই ভিন্ন ধর্ম্মী গভর্ণমেন্টও তাঁহাদিগকে চণ্ডাল
সংজ্ঞাতেই গণনা করিয়া থাকেন । ১৮৯১ সালের আদমশুমারী বিবরণীতে
তাহাদের সংখ্যা ১৭৬১৩৬৪ ছিল এবং তাহারা যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর,
বাথরগঞ্জ এবং ঢাকা এই কয় জেলাতেই অধিকাংশ বাস করে । তাহারা
কঠিন পরিশ্রমী । এ প্রদেশে জমি, তাহারাই চাষ করে । মনু বলেন,
শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালের উৎপত্তি ।

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার ‘Ancient India’ নামক গ্রন্থে এই
জাতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :—“(শববহন ও দাহনকারী) চণ্ডাল-
দিগের পরম্পরের মধ্যে একরূপ একটা শারীরিক ও মানসিক সাদৃশ্য আছে
যে, তদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে তাহারা একটা স্বতন্ত্র জাতি । এই
জাতি কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে ? মনু বলেন, শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে
তাহাদের জন্ম । প্রাচীন কালে দক্ষিণ পূর্ববঙ্গে কোন সময়েও ব্রাহ্মণের
সংখ্যা বেশী ছিল না, এবং বর্ত্তমান সময়েও উপরোক্ত পাঁচ জেলাতে
২৫ লক্ষ ব্রাহ্মণও হইবে না ; একরূপ অবস্থায় ঐ সব জেলাতে ১৭ লক্ষাধিক
চণ্ডাল কিরূপে জন্মিল ? মনুর মতে এই প্রশ্নের কি সম্ভোষজনক উত্তর
দেওয়া যাইতে পারে ? (১) আমরা কি অনুমান করিব যে সুন্দরী

(১) কর্ণেল জীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত “ঐংসোন্মুখ জাতি”তে যুক্তবঙ্গে
ব্রাহ্মণ সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ এবং নমঃশূদ্রের সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ বলিয়া উক্ত ও সঙ্গৃহীত
হইয়াছে ।

ব্রাহ্মণগণ অনবরত কৃষকায় শূদ্র সাধারণের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া আসিয়াছেন ? আমরা কি অনুমান করিব যে ক্ষুর্ত্তিবান্ শূদ্রেরা একটা নূতন জাতি সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে, সহস্র সহস্র সুন্দরী অথচ দুর্ব্বলচিত্ত ব্রাহ্মণ-কন্যাকে কুপথে আনয়ন করিয়াছে ? অথবা আমরা কি ইহাই অনুমান করিব যে, রাজানুগৃহীত ও পৌরহিত্য ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-সন্তান অপেক্ষা এই চণ্ডালদিগের বংশধরগণ মৎস্যবহুল জলাভূমি ও গাওগ্রামে নানাবিধ দুঃখকষ্টের মধ্যে থাকিয়াও বেশী হইয়া পড়িয়াছিল ? ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই অনুমানগুলিও বৈরাগ্য অসম্ভব, মনুর প্রচারিত সঙ্করজাতির বিবরণও সেইরূপ অস্বাভাবিক ।”

‘আমরা পুরাণে দেখিতে পাই যে, দেবী চণ্ড ও মূণ্ড নামক দুইটী অশুর সেনাপতিকে বধ করিয়াছিলেন, তাহার। হয়ত এই চণ্ডাল ও ছোটনাগপুরের, মূণ্ডাদিগের দলপতি ছিল ।’

“হিন্দুদিগের মধ্যে ‘চণ্ডাল’ এই শব্দটী বড়ই ঘৃণাব্যঞ্জক । আজকাল নমঃশূদ্রগণের মধ্যে অনেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন । শিক্ষা সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইয়াছেন । ইহাদিগের প্রতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন না করিয়া বরং নানারূপে উৎপীড়ন করিয়া আসিতেছেন । বলা বাহুল্য ইহার ফল ও পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় ।”

শাস্ত্র ও কলমের খোঁচা হইতেই যত অনর্থের উৎপত্তি । শাস্ত্রকার যদি মর্নিব সাধারণকে হীন ভাবে চিত্রিত না করিতেন তবে কি সমাজে উচ্চ নীচ আখ্যা য়েচ্ছ ব্রাহ্মণ চণ্ডালের বৈষম্য উপস্থিত হইত ? সে শাস্ত্রেও আবার কত গোলযোগ ও গরমিল । এই চণ্ডাল সম্বন্ধে ব্যাস সংহিতায় লিখিত আছে :—

কুমারী, সম্ভবন্তেকঃ সগোত্রাং দ্বিতীয়কঃ ॥৯

ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।

“চণ্ডাল তিন প্রকার (১ম) অবিবাহিতা কন্যাতে উৎপন্ন সন্তান ;
(২য়) সগোত্রা পত্নীর গর্ভজাত ; (৩য়) ব্রাহ্মণীতে শূদ্রজনিত ।”

পরশরনন্দন ব্যাস পুনরায় বলিতেছেন :—

* * * * *

বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপুঃ কুন্তকারকঃ ॥১০

বণিক-কিরাত-কায়স্থ-মালাকার-কুটুম্বিনঃ ।

বরটো মেদ-চণ্ডাল-দাস-শ্বপচ-কোলকাঃ ॥১১

এতেহন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্তো চ গবামনাঃ ।

এযাং সম্ভাষণাং স্তানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্ ॥১২

ব্যাস সংহিতা ।

বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুন্তকার, বণিক, কিরাত, কায়স্থ, মালী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, কৈবর্ত, শ্বপচ, কোলজাতি, আর যাহারা গো-মাংস ভক্ষণ করে তাহারা সকলেই অন্ত্যজ । ঐ সকল অন্ত্যজ জাতীয় শূদ্রের সহিত আলাপ করিলে স্তান করিতে হয়, উহাদিগকে দেখিলে সূর্য্য দর্শন করিয়া শুদ্ধ হইতে হয় ।”

আপনাদের সাধের সংহিতাকারগণ নাপিত, গোপ, কুন্তকার, বণিক, ব্যাধ, মালী, চণ্ডাল, কৈবর্ত, শ্বপচ প্রভৃতিকে অন্ত্যজ জাতীয় গণ্য করিয়া বন্ধের উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থগণকেও উহারই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন । শুধু এই পর্য্যন্ত । লিখিয়া ‘শাস্ত্রকার অব্যাহতি দিলেও ক্ষতি ছিল না, ইহার উপর ইহাদিগকে গোখাদক জাতির জাতি গোত্র মধ্যে পরিগণিত করিয়া স্মারধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিতে ক্রটি করেন নাই । অন্ত্যজ জাতির সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে যাইয়া অত্রি বলিতেছেন :—

রজক*চৰ্শ্কার*চ নটো। বরুড় এব চ ।

কৈবর্ত-মেদ-ভিল্লা*চ সপ্তেতে চান্ত্যজাঃ শ্বতাঃ ॥১৯৫

অত্রি সংহিতা ।

“রজক, চৰ্শ্কার, নট (নাটক . যাত্রা করিয়া জীবিকানির্বাহকারী) বরুড়, কৈবর্ত, মেদ ও ভিল্লা এই সাতটি জাতিকে অস্ত্যজ কহে।”

“কৈবর্ত—উহারা সঙ্কর জাতি নহে। যজুর্বেদে কৈবর্ত জাতির উল্লেখ আছে। বঙ্গ দেশের কৈবর্তগণের সংখ্যা দুই নিযুত অর্থাৎ বঙ্গের হিন্দুদিগের অষ্টমাংশেরও অধিক হইবে। মেদিনীপুর, ছগলি এবং হাবড়ায় তাহাদের অধিকাংশের বাস। এই জাতি সম্বন্ধে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন যে, “মনুর মতে একই আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং একই নির্দিষ্ট অংশের অধিবাসী এই অসংখ্য লোক, সহস্র সহস্র অযোগব জীলোক স্বীয় স্বীয় স্বামী পরিত্যাগ করিয়া নিমাদ পুরুষের সহিত মিলিত হওয়ায় যে সব সমৃদ্ধি হয়, তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। একথা কি কোন বিজ্ঞ পাঠক বিশ্বাস করিবেন?”

এইরূপে আরও কতকগুলি জাতিকে অযথা সঙ্কর জাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রদেশে বাস করা নিবন্ধন সেই সেই দেশের নামানুসারে ইহাদের নাম হইয়া যায়। অভিরা দেশের লোককে অভির, উত্তর বঙ্গের আদিম অধিবাসীদিগকে পুণ্ডরক, উড়িষ্যা দেশবাসীকে উড়ু, দক্ষিণ ভারতের লোককে জাবিড়, কাবুলবাসীকে কাছোজ, ব্যাকট্রীয়ান গ্রীকদিগকে যবন, টিউরেনিয়াবাসীকে শাক, পারস্তবাসীকে প্লভ, চীনবাসীকে চীন, আদিম পার্শ্বত্যা জাতিকে কিরাত, উত্তর ভারতীয় পর্বতবাসীকে খম জাতি বলা হইয়াছে। কাশ্মীরের নিকট বর্তমান দার্দিস্থানবাসীকে দারদ, পশ্চিম মালববাসীকে অবস্তা, দক্ষিণ নেপালবাসীকে লিচ্ছিভি এবং

নেপালবাসীকে মাল্ল বলা হইত । বর্তমান তেলাঙ্গনাই প্রাচীন অন্ধ্রদেশ । অন্ধ্রগণ ঐ দেশবাসী ছিলেন ।”

চারি বর্ণ ব্যতীত যে সকল সঙ্কর জাতির উল্লেখ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহা প্রদর্শিত হইল এবং ঐ সকল সঙ্কর জাতির উদ্ভব সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেখানে যাহা আছে, তাহা যে যুক্তিসিদ্ধ তাহাও প্রদর্শিত হইল । উহার সকল অংশই প্রক্ষিপ্ত এবং পরবর্তী লেখকগণের চতুরতার নিদর্শন, ইহা বেশ অনুমান করা যায় । শাস্ত্রে আছে, ব্রাহ্মণ বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করিলে সেই সঙ্কজাত সন্তান অম্বষ্ঠ জাতি । অসবর্ণ বিবাহ তৎকালে সমাজে যে প্রচলিত ছিল তাহা আমরা পূর্বেই প্রমাণ সহ প্রদর্শন করিয়াছি এবং মনুসংহিতারও অনুকূল মত দেখাইয়াছি স্মৃতরাং যখন অসবর্ণ বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল, তখন পিতা ও মাতার বর্ণ—পৃথকই থাকিত, কিন্তু সন্তান অন্য জাতি হইবে কেন ? অম্বষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণের ঔরসোৎপন্ন এবং অসবর্ণী স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান । ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইবে না, ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ করিতে বা ব্রাহ্মণকে কন্যা দান করিতে পারিবে না ইহা অসম্ভব । ব্রাহ্মণ শূদ্র-কন্যাকে বিবাহ করিলে, সন্তান হইবে—নিষাদ ও বারুজীবী বা বারুই ; কত্রিয় কন্যাকে বিবাহ করিলে তৎসঙ্কজাত সন্তান হইবে স্মৃত বা মালাকার ; কত্রিয় শূদ্র কন্যাকে বিবাহ করিলে সন্তান হইবে উগ্র, নাপিত, মোদক ইত্যাদি । অর্থাৎ মনু স্পষ্টতঃ বলিতে চাহেন যে অসবর্ণ বিবাহোৎপন্ন সন্তান—পিতার বর্ণও প্রাপ্ত হইবে না, মাতার বর্ণও প্রাপ্ত হইবে না ; সে ভিন্ন এক বর্ণ প্রাপ্ত হইবে ।

কিন্তু আমরা পূর্ববর্তী শাস্ত্রে ও ইতিহাসগ্রন্থে তো একরূপ বিধান কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই । এ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মত ও সম্পূর্ণ নূতন কথা ।

মহাভারতে কথিত আছে, মহর্ষিগণ-নিষেবিতা জহুতনয়া বরবর্ণিনী

দিব্যরূপা ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গাদেবী ক্ষত্রিয়বংশাবতংশ মহারাজ শান্তনুর
 ঔরসে অমিতপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভূত দেবব্রত ভীষ্মকে প্রসব করিয়া-
 ছিলেন । এটী অসবর্ণোৎপন্ন সন্তান, মমুর মতে পিতৃ ও মাতৃ বর্ণ না হইয়া
 তৃতীয় কোন পিশাচ বা ব্রহ্মদৈত্য হওয়া উচিত ছিল । পিতৃ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়
 পুত্র ক্ষত্রিয় হইলেন । ধীবর-কন্যা সত্যবতীর গর্ভে পরাশর ঋষি যাহাকে
 জন্মদান করেন তিনিও পিতৃ সম্পর্কে ভারত-বিখ্যাত ঋষি—মহর্ষি বেদব্যাস ।
 এটিও অসবর্ণ-উৎপন্ন সন্তান । মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভারতবংশের
 রক্ষার নিমিত্ত বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে বধু অম্বিকা ও অম্বালিকাব গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র
 ও পাণ্ডু এবং অঙ্গরোপমা এক দাসীর গর্ভে ধর্ম্মাত্মা, বিদুরকে জন্ম প্রদান
 করেন । এগুলিও অসবর্ণোৎপন্ন ও মাতৃ সম্বন্ধে ইহারা সকলেই ক্ষত্রিয় ও
 শূদ্র হইয়াছিলেন । যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবের জন্মও অসবর্ণ সম্পর্কিত,
 মাতৃ বর্ণে সকলেই ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন । ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্য গর্ভজাত
 যুযুৎসু নামক এক মহারথ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । চন্দ্রবংশীয় দেবমীচ
 রাজ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করেন । ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে বসুদেব
 পিতা শূর সেন ও বৈশ্য-কন্যার গর্ভে (শ্রীকৃষ্ণ পিতা) নন্দগোপ জনক
 পর্জন্ম জন্মগ্রহণ করেন । পর্জন্ম মাতৃবর্ণানুসারে ক্ষত্রিয় পুত্র হইয়াও বৈশ্য
 হন । মাহিষ্য হন নাই । কাহারও কাহারও মতে দশরথ রাজমহিষী স্মিত্রা
 বৈশ্য-কন্যা । এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমকর্মা বৃকোদর অরণ্যমধ্যে
 রাক্ষসী হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন,
 ইহাদের উভয়েই অসবর্ণোৎপন্ন, ও পিতৃ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন । মমুর
 মতানুযায়ী ইহারা সকলে অসবর্ণোৎপন্ন বিধায় পিতৃ মাতৃ বর্ণ-ভুক্ত না হইয়া
 এক একটি স্বতন্ত্র বর্ণান্তর্গত হওয়া উচিত ছিল । মমুর মতে বিদুরকে
 নিষাদ বা বারুই বলা সম্ভব ছিল ।

ভৃগুর পুত্র ঋচিক, ক্ষত্রিয় গাধিরাজার কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ

করেন । জমদগ্নি সেই সত্যবতীর গর্ভসম্ভূত । জমদগ্নি, প্রাসেনজিৎ রাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন । রেণুকার গর্ভে, জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম উৎপন্ন হইলেন । অতএব ক্ষত্রিয় সত্যবতীর গর্ভজাত জমদগ্নি এবং ক্ষত্রিয় কন্যা রেণুকার গর্ভজাত পরশুরাম অসবর্ণ বিবাহোৎপন্ন সত্ত্বেও উভয়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন—পিতৃ সম্বন্ধে ; এবং সেই পরশুরাম পৃথিবীকে বহুবার নিঃক্ষত্রিয়া করেন । পূর্বে অনেক রাজকন্যার সহিত মহামুনিদিগের বিবাহ হইত ও ঐ রাজপুত্রীদিগের গর্ভে সেই সকল মহামুনির সন্তানগণ বীর্য প্রভাবে প্রায়শঃই ব্রাহ্মণ হইতেন, ইহা অতি প্রসিদ্ধ । ভৃগু মুনির পুত্র চ্যবনের সঙ্গে রাজকন্যা স্নকন্যার বিবাহ হয় । পুত্র প্রমতি ক্ষত্রিয় হন । প্রজাপতি পুলস্ত্য ঋষি তৃণ বিন্দু রাজকন্যাকে বিবাহ করেন—পুত্র বিশ্বা মুনিই হন । গৌতম ঋষির সঙ্গে ভর্ম্যাস্থ রাজকন্যা অহল্যার বিবাহ হয়,—পুত্র শতানন্দ ব্রাহ্মণ হন । অপুত্রক বলি রাজার স্ত্রীর ক্ষেত্রে দীর্ঘতমা ঋষি—ভারত বিখ্যাত অঙ্গ, বঙ্গ, স্কন্ধ, কলিঙ্গ ও পুণ্ড্র এই পাঁচ পুত্র জন্ম দান করেন । ইহারা ক্ষত্রিয় হন । মহাবল কর্ণ সূর্য্যদেবের ঔরসে ক্ষত্রিয়া মাতা কুন্তির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া অসবর্ণোৎপন্ন সত্ত্বেও মাতৃ সম্পর্কে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, কিন্তু স্মৃত কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায় স্মৃত পুত্র বলিয়া অভিহিত ছিলেন । অল্প দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি, মনুর তপশ্চালক তৃতীয় পুত্র অঙ্গিরার ক্ষত্রিয় রথীতরের ভার্য্যাতে উৎপন্ন পুত্রগণ, সকলেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন । মনু স্বকৃত পুত্রকেই অসবর্ণ ক্ষেত্রে নিবৃত্ত করিয়া সঙ্কর বর্ণ উৎপাদনে বাধা প্রদান করিতে পারেন নাই, তা আবার ব্যবস্থা লিখিয়া গিয়াছেন ।

জরৎকার ঋষি অনার্য্য রাজা বাসুকির ভগিনীকে বিবাহ করেন এবং এই দম্পতির পুত্র আস্তিক ঋষিই আর্য্য অনার্য্যের বিবাহ বিগ্রহে সন্ধি ও শান্তি সংস্থাপন করেন ।

“রামায়ণের আদি কাণ্ডে বৈশ্ণব ঔরসে শূদ্রানীর গর্ভজাত সন্তান সিন্ধু-মুনিকে হত্যা করিয়া দশরথের ব্রাহ্মহত্যা হইয়াছিল। “শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্ণব শৃণু জনপদাধিপ।” (রামায়ণ)। পাঠক মাত্রই অবগত আছেন বিশ্রাম মূনি ব্রাহ্মস-কন্যা নিকষা স্কন্দরীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে তিনটি ব্রাহ্মস পুত্র উৎপন্ন করেন। ইহাও অসবর্ণোৎপন্ন এবং মাতৃ সম্পর্কে সম্পর্কিত।

মহারাজ যযাতি অসবর্ণ বিবাহের ও নিরুপ্ত শ্রেনীর প্রতিলোম বিবাহ অনুযায়ী দৈত্যগুপ্ত ব্রাহ্মণ শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করিয়া সমাজে পতিত হন নাই অথবা তৎপুত্রগণ পিতৃ মাতৃ বর্ণ ব্যতীত অন্য এক পৃথক বর্ণান্তর্গত হইয়াছিলেন বলিয়াও কেহ শ্রবণ করেন নাই বরং ‘ইন্দ্র ও উপেন্দ্র’, সদৃশ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ যদু ও তুর্বসু নামধেয় দুইটী পুত্র উৎপাদন করিয়া মহারাজ যযাতি বিখ্যাতই হইয়াছিলেন। বৃহদ্রথ পুরাণ মতে ইহার দুই ভাই অসবর্ণেরও নিরুপ্ত প্রতিলোম বিবাহানুযায়ী ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতা হইতে সমুৎপন্ন নিবন্ধন সঙ্কর বর্ণভুক্ত সূত বা মালাকার জাতীয় হইয়া যান নাই। এ সম্বন্ধে অধিক প্রমাণ প্রয়োগ বাহুল্য মাত্র। মনু নিজেই বীজোৎকর্ষ স্বীকার করিতেছেন আবার তিনিই উহা অস্বীকার করিতেছেন। বীজোৎকর্ষ দেখাইয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন যে, উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র হইলে কি হইবে, বীজের অপকর্ষতার জন্যই শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণ-কন্যার গর্ভজাত সন্তান অতি অধম চণ্ডালের জন্ম। তিনি বলিতে চাহেন, ভূমিতে সরিষার বীজ বপন করিলে—সরিষাই জন্মিবে—তিল বা তিসি, আম বা কাঁঠাল হইবে না। যদি তাহাই হয়, তবে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বৈশ্য কন্যা, শূদ্র কন্যা, অযোগব কন্যা বা অশ্বষ্ঠ কন্যার গর্ভ সম্ভূত সন্তান কেন অশ্বষ্ঠ নিষাদ বারুই ধীগবান বা আভির হইতে যাইবে? এবং ক্ষত্রিয়ের ঔরসজাত ব্রাহ্মণীর গর্ভে বা শূদ্রার গর্ভে

উৎপন্ন সন্তানই বা কেন স্থত, মালাকার, উগ্র, নাপিত বা মোদক এবং বৈশ্য-ঔরস জাত—ব্রাহ্মণ কন্যা ক্ষত্রিয় কন্যা বা শূদ্র কন্যার গর্ভজাত সন্তান কেনই বা বৈদেহ, তাষুলি, গোপল, করণ হইতে যাইবে? শূদ্রের ঔরসজাত ব্রাহ্মণীর সন্তান অতি নীচ চণ্ডাল হইল, কিন্তু শূদ্রের ঔরস জাত ক্ষত্রিয় কন্যার বা বৈশ্য কন্যার গর্ভজাত সন্তান জলাচরণীয় ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত ক্ষেত্রী এবং নবশাধভুক্ত কুন্তকার ও তন্তুবাঈ জাতি হইল কিরূপে? এসব ক্ষেত্রে বীজ মাহাত্ম্য গেল কেথায়?

সঙ্কর জাতির বৈজ্ঞানিকত্ব এইত প্রদর্শিত হইল। তবুও তাঁহারা ভাষ্য টীকা টিপনীর দোহাই দিয়া নিশ্চিত থাকিতে চাহেন, বুঝিব তাঁহাদিগকে কথা দ্বারা বুঝাইবার আর উপায় নাই। অনেক ব্রাহ্মণ পাণ্ডিতের মুখে অসবর্ণজাত সঙ্করজাতীয় বলিয়া অশ্রুত বা বৈদ্যগণকে আরজ বলিতে শুনিয়াছি।

তাঁহারা শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া বলেনঃ—“ব্যভিচারেণ জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ” যদি তাহাই ধরা যায়, তবে বলা বাহুল্য ব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডকে লইয়া ভারতগৌরব পঞ্চপাণ্ডব, বশিষ্ঠ নারদ শুকণেব ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষ সত্যকাম, দাসীগর্ভ সমুত চন্দ্রগুপ্ত ও গ্রীক রাজকন্যা হেলেনায় জাত ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক প্রভৃতি এবং বঙ্গের ব্রাহ্মণেশ্বর সমুদয় ছত্রিশজাতি তাঁহাদের এ আরজ সংজ্ঞা হইতে নিস্তার পান নাই। অর্থাৎ তাঁহারা কলমের জোরে স্পষ্টতঃ বলিতেছেন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সকলেই আরজ সন্তান। বাপ পিতামহগণও ইহাদের হাতে নিস্তার পান না। ইহাদের পিতৃ পিতামহ শাস্ত্রকার আর্য্যঋষিগণ যদি সশরীরে বঙ্গদেশে আগমন করিতেন— তাঁহাদের উপযুক্ত বংশধরগণের শাস্ত্র-ব্যাখ্যা ও ব্যবস্থা দর্শনে নিরতিশয় লজ্জিত হইতেন না কি? ধীবরকন্যা সত্যবতী নন্দন বেদব্যাসের বর্তমানশুচিবাইব্রহ্ম হিন্দুসমাজে কি নিগ্রহ ও লাঞ্ছনাভোগই না হইত, ভাবিতে কষ্ট হয়।

আমরা জিজ্ঞাসা করি এই ব্রাহ্মণের সমুদয় সঙ্করবর্ণ কি বিবাহিত দম্পতির সন্তান ? যদি বিবাহিতা বনিতা না হইয়া উপপত্নী হয় তবে ঐ গর্ভজাত সন্তান সমাজে স্থান লাভ করিবে কেন ? যে সময়ে ব্যভিচার ভয়াবহ দোষজনক, যাহার দণ্ড ক্ষত্রিয় রাজবিধানে প্রাণদণ্ড ছিল, সে সময় ব্যভিচারজাত কোটী কোটী সন্তান জীবিত থাকা কি সম্ভব ? শুধু জীবিত থাকা নহে, প্রতিপত্তি সহিত সমাজের অঙ্গীয়রূপে প্রাচীন কাল হইতে অবস্থান করিয়া আসিতেছে । সমাজে কি এখনও ব্যভিচার নাই ? সে সকল সন্তান কি কালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতেছে ? বিবাহিত পত্নীর গর্ভজাত পুত্র যদি পিতা বা মাতার জাতীয় না হইল তবে অসবর্ণ বিবাহ কি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠনের উদ্দেশ্যেই আবদ্ধ হইয়াছিল ?

সঙ্কর বর্ণ প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় ঊনবিংশ সংহিতার অনুবাদ স্থানে—সঙ্করবর্ণকে বিবাহিতা ভার্য্যা হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন । (ঊনবিংশ সংহিতা ১৪২ পৃষ্ঠা) পূর্বে দেখান গিয়াছে—অনেক রাজা ব্রাহ্মণ কন্যা ও অনেক ব্রাহ্মণ রাজকন্যা বিবাহ করিয়াছেন—তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ কিন্তু নূতন কিছুই হন নাই । পিতৃ বা মাতৃ বর্ণই প্রাপ্ত হইয়াছেন । শ্রীহট্ট জেলায় শুনিয়াছি বৈদ্য কায়স্থে বিবাহ প্রচলিত আছে—তাহাদের উৎপন্ন সন্তান পিতার বর্ণই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বিবাহ প্রথাই যদি শাস্ত্রসম্মত, দেশাচারগত ও সমাজ প্রচলিত থাকে তবে সে বিবাহ-উৎপন্ন সন্তান কেন অন্য এক পৃথক বর্ণভুক্ত হইতে যাইবে ? ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তিন সমাজ—রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিক, ইহাদের মধ্যে বিবাহ প্রথা নাই । কিন্তু যদি কাল ধর্ম্মে বিবাহ প্রথা আরম্ভ হয় তবে কি রাঢ়ী বারেন্দ্র উৎপন্ন সন্তান মালাকার কি কুস্তকার হইবে ? অধিগণ, একটু চিন্তা করিলেই শাস্ত্রকারের প্রহেলিকা ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন । সবর্ণ বিবাহই হউক আর অসবর্ণ বিবাহই হউক

উৎপন্ন সন্তান যে অধিকাংশ স্থানেই (কোন কোন ক্ষেত্রে মাতৃবর্ণও প্রাপ্ত হয়) পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়—তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই । অত্রি সংহিতায় আছে :—

* * * * *

কামতন্তু প্রসূতো বা তৎসমো নাত্র সংশয়ঃ ।

স এব পুরুষ স্তত্র গর্ভোভূত্বা প্রজায়তে ॥ ১৮৪

“যদি জ্ঞানপূর্বক ঐ সকল স্ত্রী (চণ্ডাল স্লেচ্ছ খপচ প্রভৃতির স্ত্রী) গমন বা গমন দ্বারা সন্তান উৎপাদন করে, তাহা হইলে ঐ উপভোক্তা পুরুষ, ঐ স্ত্রীর সমজাতি হইবে ; সেই পুরুষই, সেই স্ত্রীর সন্তান হইয়া জন্ম গ্রহণ করে ।”

এখন জিজ্ঞাস্য, যদি নীচ বর্ণীয়া অবিবাহিতা স্ত্রী গমন করিলে জনক ও তজ্জাত সন্তান মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়, তবে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন কালের অসবর্ণোৎপন্ন সন্তান কেন পিতৃ বা মাতৃবর্ণভুক্ত না হইয়া স্বতন্ত্র আর এক বর্ণীয় (সঙ্কর বর্ণীয়) হইবে ?

“ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির সর্বণ বিবাহজাত অসংখ্য সন্তান কি দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না । শোণিত-সন্মিশ্রণ সংঘটিত নূতন জাতি না গড়াইলে বুঝি আর পারা যাইত না । * * * * * হিন্দু সমাজের বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক বোধে অনার্য্য সংসর্গ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল ; সেই সকল অনার্য্য কুটুম্ব ও তৎসংসর্গজাত আর্য্য সন্তানেরা যাহাতে জাতিভেদের মধ্যে স্থান পান, তাহাই করিতে গিয়া এই সকল গৌজামিল দিতে হইয়াছে । স্লেচ্ছ যবন খশ প্রভৃতিকেও হিন্দু সন্তান করা হইয়াছে । স্লেচ্ছ যবন প্রভৃতির অদ্ভুত উৎপত্তি বলিলেই উহারা আর্য্য সন্তান হইবে, তাহার অর্থ কি ? যেখানে আর স্ত্রী পুরুষ দুটী মিলান যায় নাই, সেখানে পুরুষের হস্ত পদাদি হইতেই কত জাতির উৎপত্তি বলা হইয়াছে । শ্রীমদ্ভাগবতের

বেনের বৃত্তান্তগুলি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে ইহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। বৃহদ্রশ্ম পুরাণের বচনেও বেণোজ ইহাতে স্লেচ্ছাদির উৎপত্তি বর্ণিত যইয়াছে। ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া মন্থ বলিতেছেন :—

শনকৈস্ত ক্রিয়া লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ ।

বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রহ্মণা দর্শনে ন চ ॥

পৌণ্ড্রকাশেচৌড়্রবিড়াঃ কাশ্বোজা যবনাঃ শকাঃ ।

পারদা পল্লবাস্তীনাঃ কিরাতাঃ খরদাঃ খশাঃ ॥

ক্রিয়ালোপের জন্ত এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পৌণ্ড্র, ঔড়্র, দ্রবিড়, কাশ্বোজ, যবন, চীন, কিরাত ইত্যাদি কি সত্যই আর্য্য জাতি? চীন কি আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয় জাতি? হিন্দুর গণ্ডিতে যবন, স্লেচ্ছ, চীনকে স্থান দিতে হইয়াছে,—গৌজামিল আর কাহাকে বলে! কতকগুলি জাতির সংজ্ঞা-নির্দেশ বোধ হয় তাঁহাদের ব্যবসায় অনুযায়ী করা হইয়াছিল। গোপ অর্থ গোপালক। ঐ কার্য্যটী বৈশ্বের, কিন্তু লক্ষপতি বৈশ্ব কি আপনি গোপালন করিবে? কাজেই গোপালনের লোক চাই; যিনি তাহা করিয়াছিলেন, তিনি যে বর্ণেরই হউন না কেন, নাম গোপ। সহদেবকে ত বিরাট পুরে “গোপাল” বলা হইত। এখনকার গোয়ালের নুতন জন্ম না হইলে শাস্ত্রের মহিমা থাকে কি? শঙ্কর তাহুলি, তিলি ইত্যাদির মূলও ঐরূপ। এই সকল জাতির বিদ্যাবুদ্ধি ও শিক্ষা দীক্ষা ব্যবসায় বাদ দিলে, অনেকাংশে একরূপ হইয়া যায়। এদেশের অনেক জাতি ব্যবসায়ে বদ্ধ থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষাদি না করায় স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে, নচেৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ইত্যাদি জাতির অপেক্ষা তাহারা—অশিক্ষা দিলে, বিশেষ কোনও অংশে ন্যূন না থাকিতে পারে। এই সকল ব্যবসার দ্বারা পৃথগ্ভূত জাতির জন্মতত্ত্ব শাস্ত্রানুরূপ হইবার বিশেষ কারণ দেখা যায় না।

ফলতঃ ব্যভিচার দ্বারা এই সমাজ সংবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহা অযৌক্তিক । আর্য্য এবং অনার্য্য শোণিতের সংমিশ্রণে অধিকাংশ জাতি উৎপন্ন, উহা আর্য্যদের একরূপ অপরিহার্য্য বলিয়াই করিতে হইয়াছিল । অনার্য্যদেশে আসিয়া অধিকাংশ আর্য্য তাহাদের সহিত কুটুম্বিতা করিতে বাধ্য হইয়া-
ছিলেন ।” (১)

যখন আর্য্যজাতির জীবনীশক্তি ছিল তখন এইরূপ কত কত জাতিকে যে সে স্বীয় কুক্ষিগত করিয়া লইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই । “পারসীক গ্রীক হন তক্ষক শক পারদ তুরস্ক জাতি প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক নানা সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল । তাহারা ছ’ একটা আসে নাই, পক্ষপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়াছিল । তাহারা কোথায় ? যদি গায়ের জোরে বলিতে চাও যে, তাহারা সকলেই লোপ পাইয়াছে, তবে আর কথা নাই । কিন্তু এতগুলি জাতি এবং যে জাতিগণের মধ্যে কোন কোন জাতি কালে ভারতের অদৃষ্ট-নেমির বিধাতা হইয়াছিল, যে জাতিগণের মধ্যে কলিঙ্গ, শালিবাহন এবং সম্ভবতঃ শিলাদিত্য প্রভৃতি রাজচক্রবর্ত্তীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; সেই সব জাতি সংখ্যায় বা শক্তিতে নিতান্ত অল্প ও হীন ছিল না । তাহারা কি সকলেই লোপ পাইয়াছে না তদানীন্তন জীবিত হিন্দুসমাজের মধ্যেই লীন হইয়া হিন্দুসমাজের অস্থিমজ্জার সহিত মিলিয়া গিয়াছে ? আবার বৌদ্ধ যুগের কথা স্মরণ করুন । বৌদ্ধ সময়ে—ছই এক বৎসর নয়, সহস্র বৎসরেরও অধিককাল যখন ভারতের অধিকাংশ লোক জাতিভেদ মানিত না, তখন সকলের সঙ্গেই সকলের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারিত । শঙ্করাচার্য্যের পর যখন হিন্দুধর্ম্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল তখন বৌদ্ধদেরই বংশধরেরা আবার হিন্দু হইয়া গেল ।

(১) শ্রীমৎ নির্মলানন্দ ভারতী লিখিত—“বর্ণভেদতত্ত্ব ।” হিন্দুপত্রিকা ১০ম বর্ষ, আষাঢ় ওষ সংখ্যা ।

সমুদয় বৌদ্ধগণকে সমূলে আগুনে পোড়াইয়া কি জলে ডুবাইয়া কিম্বা তববাবি সাহায্যে নিপাত করা হয় নাই—অথবা তাহাদিগকে ভারত হইতে নির্বাদিত করা হয় নাই। সেই সব বৌদ্ধদের বংশধরেরা এক্ষণে কোথায়? তাহারা নির্বংশ হয় নাই—সকলেই আমাদের মধ্যেই আছে। ভারতের তখন জীবনীশক্তি ছিল—পরিপাক শক্তি ছিল—তাই এতগুলি জাতিকে তাহারা হজম করিয়া ফেলিয়াছিল। ভারতের জীবনীশক্তি বৃদ্ধিব জন্ত এইরূপে বহুবিধ বিভিন্ন জাতিকে সে তাহার কুক্ষিগত করিয়া লইয়াছিল।”(১)

পাছে এ সম্বন্ধে সমাজে কোনরূপ গোলযোগ, উচ্চবাচ্য উপস্থিত হয় বা পরবর্তীগণের মধ্যে কোনও কথা উপস্থিত হয় এই আশঙ্কা করিয়াই সম্ভবতঃ মনু ঐকপ সময় বর্ণের নবাবিষ্কার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

(১) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার ঘোষ এম, এ, লিখিত—নবভারতে ‘ডুবিতেছি না ভাসিতেছি’।

অষ্টম অধ্যায় ।

—३३३—

শূদ্রের প্রতি ঘোর অবিচার ।

কলিকালেব কর্ণধার মহর্ষি মনু শূদ্রের প্রতি কিরূপ বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এ অধ্যায়ে আমরা তাহাই আলোচনা করিব ।

শূদ্রের জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হইতেছে :—

মঙ্গল্য ব্রাহ্মণস্ত শ্রাং ক্ষত্রিয়স্ত বলাশ্রিতম্ ।

বৈশ্যস্ত ধন সংযুক্তং শূদ্রস্ত তু জুগুপ্সিতম্ ॥ ৩১

শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্ত শ্রাদ্ভাজ্ঞো রক্ষা সমশ্রিতম্ ।

বৈশ্যস্ত পুষ্টি সংযুক্তং শূদ্রস্ত প্রৈষ্যসংযুতম্ ॥ ৩২ । মনু, ২য়, অঃ ।

“ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক নাম রাখিবে ; ক্ষত্রিয়ের বলবাচক, বৈশ্যের ধনবাচক এবং শূদ্রের হীনতাবাচক নাম রাখিবে । ৩১ । ব্রাহ্মণের নামেব শেষে শর্ম্ম উপপদ, ক্ষত্রিয়ের নামে বর্মাদি কোনও রক্ষাবাচক উপপদ, বৈশ্যের নামে ভূতি প্রভৃতি কোন পুষ্টিবাচক উপপদ এবং শূদ্রের নামের শেষে দাসাদি কোন প্রৈষ্যবাচক উপপদ যুক্ত করিবে । যেমন শুভশর্ম্মা, বলবর্মা, বস্তুভূতি এবং দীনদাস ইত্যাদি ॥ ৩২ ॥”

বিপ্রাণাং জ্ঞানতোজ্যেষ্ঠং ক্ষত্রিয়াণাস্ত বীৰ্য্যতঃ ।

• বৈশ্যানাং ধান্নধনতঃ শূদ্রানামেব জন্মতঃ ॥ ১৫৫

২য় অধ্যায়, মনু ।

“জ্ঞানের উপর ব্রাহ্মণদিগের জ্যেষ্ঠত্ব নির্ভর করে ; অধিক বীৰ্য্যশালী হইলে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ হয় ; যিনি ধনধানে বড় বৈশ্যদিগের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ ; আর অগ্র পশ্চাৎ জন্ম বিবেচনায় যে জ্যেষ্ঠত্ব, সে কেবল শূদ্রদিগের মধ্যে ।” ১৫৫ ।

যে অতিথিকে পূজ্যপাদ আৰ্য্যগণ সৰ্বদেব স্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন, অতিথিকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, অতিথি সেবায় যাহারা ধনপ্রাণ তুচ্ছ মনে করিতেন—যে অতিথিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আৰ্য্য পিতামাতা স্বহস্তে অন্নান বদনে পুত্রের শিরচ্ছেদ করিতে পারিতেন, অতিথির ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাওয়া ও গৃহস্থাশ্রমের সমুদয় পুণ্য ধ্বংস হওয়া যে আৰ্য্যগণ একই মনে করিতেন—সেই অতিথির কথায় মন্থ কি বলিতেছেন শুনুন ।

বৈশ্বশূদ্রাবপি শ্রান্তৌ কুটম্বেহতিথি ধর্ম্মিণৌ ।

ভোজয়েৎ সহ ভূত্যে স্তাবানুশংস্রং প্রযোজয়ন্ ॥ ১১২

তৃতীয় অধ্যায়, মন্থ ।

“ব্রাহ্মণের গৃহে বৈশ্বশূদ্রও যদি অতিথি-ধর্ম্মী হইয়া আগত হয়, তাহা হইলে দয়ার অনুরোধে তাহাদিগকেও ভূত্যবর্গের সহিত ভোজন করাইবে ।”

চণ্ডালাদি শূদ্রজাতিকে শূকর কুক্কট কুক্কুর প্রভৃতির সহিত গণনা করা হইয়াছে । যথা :—তৃতীয় অধ্যায়ে—

চণ্ডালশ্চ বরাহশ্চ কুক্কটঃ শ্বা তথৈব চ ।

রজশ্বলা চ যশ্চ নেক্ষেরয়ণতো দ্বিজান্ ॥ ২৩৯

“ব্রাহ্মণগণ ভোজন করিতেছেন—এমন সময় চণ্ডাল, শূকর, কুক্কট, কুক্কুর, রজশ্বলা স্ত্রীলোক এবং ক্লীব যেন তাহাদিগকে দেখিতে না পায় এমন উপায় করিবে ।” ৩২৯ । পরাশরও বলিয়াছেন :—

“শূনা চাণ্ডালদৃষ্টো বা ভোজনং পরিবর্জয়েৎ” ॥ ৬৪ ॥

কুক্কুর বা চণ্ডাল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভোজন পরিত্যাগ করিবে ।”

লোকে আহারের পর কুক্কুর বিড়ালকে উচ্ছিষ্টান্ন দিয়া থাকে—কিন্তু মন্থ শূদ্রকে কুক্কুর বিড়াল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জ্ঞান করিয়া উচ্ছিষ্টান্ন দিতে পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া গিয়াছেন ।

শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা য উচ্ছিষ্টং বৃথলায় প্রযচ্ছতি ।

স মূঢ়ো নরকং যাতি কালস্থত্রমবাক্শিরাঃ ॥ ২৪৯

তৃতীয় অধ্যায়, মনু ।

“শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া যে ব্যক্তি অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন শূদ্রকে দেয়, সেই মূখ কালস্থত্র নামক নরকে অধোমুখে পতিত হয় ।”

হায় ! অভূক্তকে অন্ন, অন্ন নয়, উচ্ছিষ্টাটুকু দিলে পরকাল নষ্ট হয় এমন কথা জগতের কোনও ধর্মশাস্ত্রে কোনও নীতিশাস্ত্রে বোধ হয় এযাবৎ লিখিত হয় নাই—মনু তাহাও লিখিয়াছেন । এইত গেল শ্রাদ্ধের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নদানের কথা ।

এখন নিতান্তই যদি কেহ চারিটা খাইতে দিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি—

অন্নমেযাং পরাধীনং দেয়ং স্তাভিন্ন ভাজনে ।

রাজৌ ন বিচরেয়ুস্তে গ্রামেষু নগরেষু চ ॥ ৪৫

দশম অধ্যায় ; মনুসংহিতা ।

“ইহাদিগকে অর্থাৎ চণ্ডাল, স্বপচদিগকে (যাহাদিগের বাসস্থান গ্রাম বহির্ভাগে দেয়, কুকুর এবং গর্দভ যাহাদিগের একমাত্র ধন, মৃতের বস্ত্র পরিধেয়, ভগ্নপাত্রে ভোজন, লৌহ নির্মিত অলঙ্কার আভরণ, সাধুদিগের বৈধ কস্মীন্মুষ্ঠানের সময় যাহাদিগের দর্শন নিষেধ ।—৫১-৫২ শ্লোক) অন্নপ্রদান করিতে হইলে ভজলোকেরা ভৃত্যদ্বারা ভগ্নপাত্রে অন্ন প্রেরণ করিবেন এবং গ্রাম বা নগরে রাত্রিকালে ইহাদের যাতায়াত একেবারে নিষেধ ।”

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—অন্নং ভূমৌ স্বচাণ্ডাল বায়সেভ্যশ্চ নিক্ষিপেৎ ॥ ১০৩
অর্থাৎ “গৃহস্থ বৈশ্বদেবের হোম করিয়া অবশিষ্ট অন্নদ্বারা সর্বভূতাদেশে

বলি প্রদানপূর্বক—‘অনন্তর কুকুর চণ্ডাল বায়স ও পতিতদিগকে ভূমিতে
অন্ন দিবে ।’

শূদ্রকে বেদে বঞ্চিত করা হইয়াছে । মহর্ষি বেদব্যাাস বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ।

ঋতিশ্রুতি পুরাণোক্ত ধর্মযোগ্যাস্ত্রুতরে ॥ ৫

শূদ্রোবর্ণশ্চতুর্থোহপি বর্ণস্ত্র্যাক্ষর্মমহিতি ।

বেদমন্ত্রস্বধা স্বাহা বযট্কারাদিভির্বিনা ॥ ৬

ব্যাাস সংহিতা ।

“ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি—দ্বিজশব্দ প্রতিপাদ্য ; এই
তিন বর্ণই ঋতিশ্রুতি ও পুরাণোক্ত ধর্মের অধিকারী ; অপরজাতি (শূদ্রাদি)
অধিকারী নহে । শূদ্র জাতি চতুর্থ বর্ণ, এই জাতিই ধর্মের অধিকারী কিন্তু
বেদমন্ত্র ও স্বাহা, স্বধা, বযট্কারাদি শব্দের উচ্চারণে অধিকারী নহে ।”

শূদ্রকে শাস্ত্রশিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে ঋষি অত্রি বলিতেছেন :—

অকুলীনে হৃসদ্রুন্তে জড়ে শূদ্রে শঠেদ্বিজৈ ।

এতে স্বেব ন দাতব্যমিদং শাস্ত্রং দ্বিজোত্তমৈঃ ॥

৮ অত্রি সংহিতা ।

“দ্বিজোত্তমগণ,—অসদ্বংশীয়, অসচ্চরিত্র, মূর্থ, শূদ্র এবং খল-স্বভাব,
দ্বিজ এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিকে শাস্ত্রশিক্ষা দিবেন না ।”

শুধু কি বেদাদি ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়াই নিষেধ ? বেদ শ্রবণ করাও
তাহাদের পক্ষে নিষেধ ।

উশনঃসংহিতায় উক্ত হইয়াছে :—

অস্ত্যানাং সঙ্গতেগ্রামে বৃষলস্ত্র চ সন্নিধৌ ।

অনধ্যায়ো রুদ্যমানে সমবায়ৈ জনস্ত্র চ ॥ ৬৫

“যে গ্রামে অশ্লীলজাতি (নাপিত, গোপ, কুস্তকার, বণিক, ব্যাধ,

কায়স্থ, মালাকার, চণ্ডাল, কৈবর্ত, ঋষপচ ইহারা সকলেই অন্ত্যজ ।
ব্যাস-সংহিতা ১০।১১।১২ ।) বাস করে সেই গ্রামে, বহুলোক সমাগম স্থলে
বেদ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ।”

শূদ্রকে কোনও প্রকার উপদেশ—তাহা লৌকিকই হউক আর
পারমার্থিকই হউক দেওয়া হইবে না । মনু চতুর্থ অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

ন শূদ্রায়মতিং দদ্যামোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্ ।

ন চাশ্রোপদিশেদ্ধর্ম্মং ন চাশ্র ব্রতমাদিশেৎ ॥ ৮০

“শূদ্রকে লৌকিক বিষয়ে কোন উপদেশ দিবে না, অদাস শূদ্রকে উচ্ছিষ্ট
দিবে না, ছতশেষ দিবে না,—কোন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে না, কিম্বা
কোনরূপ ব্রত করিতে আদেশ দিবে না ॥ ৮০ ।”

যদি দাও তবে :—যো হ্যশ্র ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতিব্রতম্ ।

সো হসংবৃতং নামতমঃ সহতেনৈব যজ্জতি ॥ ৮১

“যে ব্রাহ্মণ ইহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, অথবা ব্রতানুষ্ঠানের
আদেশ করেন, তিনি সেই শূদ্রের সহিত অসংবৃত নামক নরকে নিমগ্ন
হন ।”

শূদ্র দূরে থাকুক আজকাল কোল ভিল সাঁওতাল নাগা প্রভৃতি অসভ্য
নরনারীকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাহাদিগকে যথার্থ মানুষ করিবার জন্ত কত
মহাপ্রাণ নরনারী যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—তাহার ইয়ত্তা নাই ।
অর্য্যসমাজের পুত্ৰহৃদয় মহাপ্রাণ প্রচারকগণ, খৃষ্টীয় নরনারীগণ, ব্রাহ্ম-
সমাজের উদারহৃদয় প্রচারকগণ দলে দলে নিম্নজাতিকে শিক্ষাদানের জন্ত,
পার্বত্য-অসভ্য জাতিগণের হৃদয় মন্দিরে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ ফুটাইয়া
দিবার জন্ত, এক কথায় তাহাদিগকে মানুষ করিবার জন্ত সমুদয় স্বার্থ
জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণপণে ঋটিতেছেন, আর আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকার মনু

কিনা—তাহাদিগকে অন্ধকারে কাদার মধ্যে ডুবাইয়া মারিবার উপদেশ দিতেছেন । হায় রে শাস্ত্রকার । হায় রে ধর্ম ।

আবার বলিতেছেন :—ন' সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন' চাণ্ডালৈর্ন' পুঙ্কশৈঃ ।

ন মুর্থৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নাষ্টৈর্নাস্ত্যাবসায়িত্বিঃ ॥ ৭৯

“পতিত, চণ্ডাল, পুঙ্কশ, মুর্থ, ধনাতিমদে গর্ষিত ব্যক্তি, রজকাদি নীচ জাতি এবং অস্ত্যাবসায়ী ইহাদের সহিত কিয়ৎক্ষণের জন্যও এক ছায়াতে বাস করিবে না ।”

(ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা হইতে জাত পুত্রের নাম নিষাদ । নিষাদ হইতে শূদ্রাতে জাত যে পুত্র তাহাকে পুঙ্কশ বলে এবং নিষাদ পত্নীতে চণ্ডালজাত পুত্রের নাম অস্ত্যাবসায়ী । মনু, পতিত চণ্ডাল মুর্থের সহিত এক ছায়াতে বসিতে নিষেধ করিতেছেন—কেননা পাছে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতত্ত্ব যদি উহাদের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায় এই ভয় ।

আমরা বলি কি—পতিত চণ্ডাল মুর্থ অধর্মের জন্য যাহার প্রাণ কাঁদিয়া না উঠিয়াছে, তাহাদিগের অশ্রুবারি মোচন করিবার জন্য যাহাদের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া না উঠিয়াছে, তাহাদিগকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিবার জন্য যাহাদিগের বাহু আগ্রহের সহিত প্রসারিত না হইয়াছে—তাহারা আবার মানুষ ? তাহারা আবার ব্রাহ্মণ ? তাহারা আবার ধার্মিক ? পতিত মুর্থকে ভালবাসার পরিবর্তে যাহারা এমন করিয়া ঘৃণা করিতে পরামর্শ দেন—তাহারা কি ঋষি ? ধর্মশাস্ত্র প্রণয়নের যোগ্য ব্যক্তি ?

শূদ্রকে বেদ পাঠের অধিকার দেওয়া ত দূরের কথা বেদ শ্রবণের অধিকার হইতেও বঞ্চিত করা হইয়াছে :—যথা “ন শূদ্রজন সন্নিধৌ” । (৯৯ চতুর্থ অধ্যায়) অর্থাৎ শূদ্র ও জনতা সমীপে বেদ পড়িবে না ।

শূদ্রকে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ও পাপহীনতার প্রমাণ প্রদর্শনের জন্য কিরূপ কঠোর কর্ম করিতে হইত নিম্নে তাহা লিখিত হইতেছে ।

মহু অষ্টম অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

“সত্যেন শাপয়েদ্বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং বাহনায়ুধৈঃ ।

গো বীজ কাঞ্চনৈর্দৈর্ঘ্যশ্চ শূদ্রং সর্বৈস্ত পাতকৈঃ ॥ ১১৩

অগ্নিং বা হারয়েদেনমপ্সু চৈনং নিমজ্জয়েৎ ।

পুত্রদারস্ত বাপ্যেন শিরাংসি স্পর্শয়েৎ পৃথক্ ॥ ১১৪

যমিকো ন দহত্যগ্নিরাপো নোন্মজ্জয়ন্তি চ ।

ন চার্তিমুচ্ছতি ক্ষিপ্রং স জেয়ঃ শপথে শুচিঃ ॥ ১১৫

“ব্রাহ্মণকে সত্য দ্বারা শপথ করাইতে হয় । ক্ষত্রিয়কে তাহার হস্তাশ্ব বা আয়ুধ দ্বারা ; বৈশ্যকে তাহার গো, বীজ বা কাঞ্চন দ্বারা এবং শূদ্রকে সমুদয় পাতক দ্বারা শপথ করাইতে হয় । ১১৩ । অথবা শূদ্রকে অগ্নি-পরীক্ষা, জলপরীক্ষা কিংবা স্ত্রী পুত্রাদির শিরঃস্পর্শরূপ পরীক্ষা করাইবে । ১১৪ । অগ্নি যাহাকে দগ্ধ না করে, জল যাহাকে শীঘ্র ভাসাইয়া না তোলে এবং স্ত্রী পুত্রাদির মস্তক স্পর্শে—উহাদিগের শীঘ্র যদি কোন পীড়া না জন্মে, তবে শপথ সম্বন্ধে যে ব্যক্তিকে শুচি বলিয়া জানিবে ।” ১১৫ ।

অগ্নিতে দগ্ধ না হওয়া রূপ ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় যে কত লক্ষ লক্ষ শূদ্র ভবলীলা সাধ করিয়া হিন্দু বিচারকের করাল কবল হইতে চিরমুক্ত হইয়াছেন—তাহা কে বলিতে পারে ? কয়টি শূদ্র এ ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় পাপশুভ্রতা প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছে ? হায় ! শূদ্রজীবন বাণির গৃহের ছায় না জানি কতই ভঙ্গপ্রবণ—কতই ভুচ্ছ ছিল ?

এক্ষণে শূদ্রের শারীরিক কঠোর দণ্ডের কথা লিখিত হইতেছে । অষ্টম অধ্যায়ে মহু বলিতেছেন :—

“শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমহতি ।

বৈশ্যোহপ্যর্দ্ধিশতং ধে বা শূদ্রস্ত বধমহতি ॥ ২৬৭

পঞ্চাশদ্ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্তাভিশংসনে ।

বৈশ্যে স্তাদর্দ্ধপঞ্চাশচ্ছূদ্রেহাদশকো দমঃ ॥ ২৬৮

* * * * *

একজাতিবিজাতীংস্ত বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্ ।

জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং ‘জঘন্ত প্রভবোহি সঃ’ ॥ ২৭০

নামজাতিগ্রহস্যেষামভিদ্রোহেণ কুর্কতঃ ।

নিক্ষেপোহয়োময়ঃ শঙ্কুজল্লাস্তে দশাস্থলঃ ॥ ২৭১

“ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিলে ক্ষত্রিয়ের একশত পণ দণ্ড হইবে ; বৈশ্যের দেড় শত বা দুই শত পণ দণ্ড হইবে ; শূত্রের তাড়নাদির শারীরিক দণ্ড হইবে । ২৬৭ । ক্ষত্রিয়কে গালি দিলে ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ পণ দণ্ড হইবে ; বৈশ্যকে গালি দিলে পঁচিশ পণ আর শূত্রকে গালি দিলে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে । ২৬৮ । একজাতি (অর্থাৎ শূত্র সমষ্টিকে একজাতি বলা হইয়াছে) শূত্র যদি বিজাতিদিগের , প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ঐ শূত্র জিহ্বাচ্ছেদনরূপ (দয়ালু !) দণ্ড প্রাপ্ত হইবে । কারণ ইহার জন্ম ‘জঘন্ত স্থান হইতে হইয়াছে ।’ বিরাট পুরুষ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম হইল জঘন্ত স্থান ! ২৭০ । নাম এবং জাতি তুলিয়া শূত্র যদি বিজাতির উপর আক্রোশ করে, তবে একগাছা জলন্ত দশাস্থল লৌহময় শঙ্কু উহার মুখে নিক্ষেপ করা কর্তব্য ।” ২৭১ । পুনরায় বলিতেছেন ।—

ধর্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্ত কুর্কতঃ ।

তপ্তমাসেচয়েৎ তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পাথিব ॥ ২৭২

অষ্টম অধ্যায়, মনু ।

“দর্পিতভাবে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশ করে, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করাইবেন । ২৭২ ।

মন্ত্র ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন, আবার বলিতেছেন :—

“যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্তাচ্ছেদেচ্ছুষ্ঠমন্ত্যজঃ ।

ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্ত তন্মানোরনুশাসনম্ ॥ ২৭৯

পানিমুদ্যম্য দণ্ডং বা পানিচ্ছেদনমর্হতি ।

পাদেন প্রহরন্ কোপাৎ পাদচ্ছেদনমর্হতি ॥ ২৮০

সহাসনমভিপ্রেপ্সু কংকুষ্ঠস্তাপকুষ্ঠজঃ ।

কট্যাং কৃতাক্ষো নির্বাস্তাঃ ক্ষিচৎ বাস্তাবকর্ত্তয়েৎ ॥ ২৮১

অবনিষ্ঠীবতো দর্পাদ্ভাবৌষ্ঠৌচ্ছেদয়েন্ন পঃ ।

অবমুত্রয়তো মেট্রমবশর্কয়তো গুদম্ ॥ ২৮২

কেশেষু গৃহ্নতোহস্তৌচ্ছেদয়েদবিচারয়ন্ ।

পাদয়োদর্ঢিকার্য্যঞ্চ ঐবায়্যং বৃষণেষু চ ॥ ২৮৩

“অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্র যে কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবে, রাজা তাহার সেই অঙ্গচ্ছেদন করিয়া দিবেন—ইহা মন্ত্রের অনুশাসন । ২৭৯ । শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত বা দণ্ড তোলে, তবে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদন করিবেন, (অর্থাৎ শূদ্র যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে নাও মারে কিন্তু মারিবার জন্য শুধু হস্ত উত্তোলন করে ; তাহা হইলেই তাহার হস্ত রাজা ছেদন করিয়া দিবেন ।) চমৎকার বিচার । এমন স্থায় বিচার বর্ত্তমান সময়ে কোনও সভ্যদেশে আছে কিনা জানি না । স্বর্ণলতায় পড়িয়াছিলাম একদিন শ্রামাদাসী রাগের বশবর্ত্তিনী হইয়া ‘গড়াচর চণ্ডকে’ বাটীদা লইয়া নাক্ কাটিতে গিয়াছিল, গদাধবচন্দ্র অমনি একদৌড়ে থানায় যাইয়া শ্রামার অত্যাচার কাহিনী বলিয়া দারোগাকে অনুরোধ করিয়াছিল যে তিনি অনুগ্রহ করিয়া শ্রামাকে গ্রেপ্তার ও তাহাকে শাস্তিপ্রদান

করেন। দারোগা বাবু ইহাতে হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন “শুধু নাক কাটিতে চাহিলে বা উদ্যত হইলে ত মোকদ্দমা হয় না। নাক কাটিলে তবে মোকদ্দমা, অতএব তুমি আবার যাও, বিবাদ কব, নাক কাটিয়া দিলে, তবে আসিও তখন বিচার করিব।”

আমি আইনজ্ঞ নহি, সুতরাং জানি না দারোগার উক্তি ঠিক হইয়াছিল কিনা। এই ত গেল সংহিতা যুগের বিচার পদ্ধতি। পরে বলিতেছেন, “আর পদদ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদ হইবে। ২৮০। শূদ্র যদি দর্প বশতঃ ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করে তবে রাজা উহার কটিদেশ লৌহময় তণ্ডু শলাকায় অঙ্কিত করিয়া উহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিবেন; অথবা যেন না মরে, (কেন না, মরিয়া গেলে ত আপদ চুকিয়াই যায়—শাস্তি ভোগ করিতে হয় না) এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন। ২৮১। দর্প করিয়া শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের গাত্রে নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার ওষ্ঠাধব ছেদন করিবেন; প্রস্তাব করিয়া দিলে নিষ্প্রাণ করিবেন এবং অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া দিলে অর্থাৎ বায়ু নিঃসরণ করিলে গুহাদেশ ছেদন করিয়া দিবেন। ২৮২। শূদ্র অহঙ্কার পূর্বক যদি হস্তদ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ ধারণ করে, বা হিংসা জন্য তাঁহার পাদদ্বয়, নাড়িকা, গলা কিংবা অণ্ডকোষ গ্রহণ করে, তবে রাজা বিচার না করিয়া উহাব হস্তদ্বয় ছেদন করিবেন।” ২৮৩।

এখন আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না কি যে, ইহা মানবধর্ম শাস্ত্র না আর কিছু? টীকা টীপনী ও ভাষ্যকার কি বলেন? ইহাকে ধর্মশাস্ত্র নাম না দিয়া ব্রাহ্মণাধিপত্য নাম দেওয়াই কি সম্ভব নহে? যদি বলেন ইহা ধর্মশাস্ত্র নহে তৎকালিক হিন্দু আইন গ্রন্থ, তবেত কোন কথাই নাই। তৎকালের আইনগ্রন্থ তৎকালেই শোভা পাইত, এখন আর তাহার

কোনও প্রয়োজন নাই। সুতরাং এখন আর মনুষ্যস্বত্তি মনুষ্যসংহিতার দোহাই দিবার কি প্রয়োজন? মনুষ্য স্বত্তি বা ঐক্য যে কোন স্বত্তিকে গম্ভীরভাবে ডুবাইয়া দিগেই ত সব গোনযোগ চুকিয়া যায়। কিন্তু তাহা হইবার নহে। বরং বাহাতে মনুষ্যসংহিতার বিধানাদি নাজে প্রচলিত হই। দেশ ধর্মগম ইত্যাদি যাব তাহার জন্যই সবনোব প্রাণপণ চেষ্টা। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—“মূর্খ কর্তব্য বাজা মহান হইলে, ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের “প্রিহ্বাচ্ছেদ, শবীর ভেদাদি” পুনর্বাব করিবার চেষ্টা করিবেন না, কে বলিতে পারে”?

দাসত্ব করিবার জন্যই যে শূদ্রের জন্ম—তাহাই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়া নহিবে নহু বলিতে পারে না—

শূদ্রত্ব কাননোদাশ্রয় ক্রীতকৃত্যভাব বা ।

মাস্ত্রাদৈব হি শ্রুতোহনৌ ব্রাহ্মণস্ত ব্রাহ্মণা ॥ ৪১৩ মষ্টম অধ্যায়, মনু ।

“পশু শূদ্র ক্রীত কৃত্য গা অকৃত্য কৃত্য, শূদ্র দ্বারা (তিনি রাজা) নান্দ্যকৃত্য বা গা অকৃত্য। যেহেতু বিদ্যা দাস্তকর্ম নন্দ্যকৃত্য উহাকে স্রষ্ট করিয়াছেন।’ মনু বর্ণন করি ত তাহা কইনে ভায়র মনসে— ভাবি গািবান্। ব্রাহ্মণ আদি উচ্চ তিন বর্ণের মেবান অন্যই শূদ্রের স্রষ্ট করিয়াছেন। গািহা, অভিজাত মস্ত্রাদায়েন কষ্ট কি তিনি এ থাকিতে দেখিতে পাবেন? আর শূদ্র! শূদ্রেরা ত মগতান, তাহাদের আবার সুখ দুঃখ কষ্ট বাতনা কি? খাটবার অন্যই ভগবান্ তাহাদিগকে স্রষ্ট করিয়াছেন। উচ্চ তিন বর্ণের সুখ সুবিধার অন্যই তাহাদের উৎপাদি। প্রয়োজন। এইত গেল ভগবানের দিক হইতে শূদ্রের প্রতি মগান করণা! এখন মানবদিগের দিক হইতে করণার পবিমাণ করা খাটক। পূর্বে যে, ইউরোপ আমেরিকার দাগ ব্যবসায় ছিল—মনে হয় তাহাও ভারতেব এ দাস ব্যবসায় অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। কেন না

দাসদিগকে তাঁহাদের অর্থ দ্বারা ক্রয় করিতে হইত ; দাস, অতিরিক্ত খাটুণীতে মরিয়া গেলে কিম্বা কোন অঙ্গ নষ্ট হইলে তাঁহাদের মূদ্রা অর্থ সবই নষ্ট হইয়া যাইত । কিন্তু ভারতের শূদ্র দাস দ্বারা সেরূপ ক্ষতির কোনও আশঙ্কা নাই, কেন না—তাহাদিগকে টাকা দ্বারা ক্রয় করিতে হয় না । এ দাস অতি সুলভ—বিনামূল্যে লাভ—প্রকৃতিদত্ত দাস ।

কেননা মনু বলিতেছেন :—

ন স্বামিনা নিসৃষ্টোহপি শূদ্রোদাস্তাদ্বিমুচ্যতে ।

নিসর্গজং হি তৎ তস্ত কস্তস্মাৎ তদপোহতি ॥ ৪১৪

“শূদ্র স্বামী কর্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় না । দাসত্ব কর্ম তাহার স্বাভাবিক, অতএব কে তাহাকে উহা হইতে মুক্ত করিতে পারে ?”

দাসের দেহ মনঃ প্রাণই যখন ব্রাহ্মণাদির প্রকৃতিদত্ত সম্পত্তি তখন তাহার ধনাদির ত কথাই নাই ।

মনু তাহাও বলিতেছেন :—

বিশ্বকৃৎ ব্রাহ্মণঃ শূদ্রাদ্ভ্যোপাদানমাচাদৎ ।

নহি তস্তাস্তি কিঞ্চিৎ স্বং ভর্তৃহাৰ্য্য ধনোহি সঃ ॥ ৪১৭

অষ্টম অধ্যায় ।

“ব্রাহ্মণ বিশ্বকৃ চিত্তে দাস-শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিতে পারেন ; যে হেতু তাহার নিজস্ব কিছুই নহে, উহার সমুদয় ধনই ভর্তৃহাৰ্য্য ।”

অন্যত্র বলিতেছেন :—

যজ্ঞশ্চেৎ প্রতিরুদ্ধঃ শ্রাদ্দেকেনাদেন যজ্ঞনঃ ।

ব্রাহ্মণস্ত বিশেষেণ ধার্মিক্যে সতি রাজনি ॥ ১১

যো বৈশ্বঃ শ্রাদ্ধহপশুহীনক্রতুরসোমপঃ ।

কুটুস্বাৎ তস্ত তদ্ভব্যমাহরেদ্যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ১২

আহরেৎ ত্রীনি বা দ্বে বা কামং শূদ্রশ্চ বেষ্মনঃ ।

নহি শূদ্রশ্চ যজ্ঞেযু কশ্চিদস্তি পরিগ্রহঃ ॥১৩

“যাগকারী বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের যজ্ঞ, যদি দ্রব্যভাবে একাক্ষ আটকাইয়া থাকে, তবে ধার্মিক রাজার রাজ্যে বাস করিলে, উক্ত ব্রাহ্মণ—যে বৈশ্বের বহু ধন আছে, কিন্তু যাগ যজ্ঞ হীন ও সোম পান করে না, তাহার নিকট হইতে যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য ঐ দ্রব্য বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বা অপহরণ করিয়া উক্তাঙ্গ পূরণ করিবেন । ১১।১২ বৈশ্বের অভাবে, শূদ্রগৃহ হইতে ইচ্ছামত দুই বা তিনটি যজ্ঞীয় দ্রব্য গ্রহণ করিবে, যেহেতু শুদ্ধের কোনও যজ্ঞ সম্বন্ধ নাই । ১৩ ।”

ব্রাহ্মণ যজ্ঞকারীকে, অভাব হইলে ধনবান্ বৈশ্ব ও শূদ্ধদের বাটী হইতে ঐ সকল দ্রব্য বলপূর্ব্বক অথবা চুরি করিয়া লইয়া কার্য্য সমাধা করিবার জন্ত ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে । বর্ত্তমান ইংরেজ গভর্নমেণ্টের রাজত্বে—মনু এই শাসন রক্ষা করিতে ফোলেই এই অনুশাসন বাক্যের দর কি পরিমাণ, তাহা ভালরূপেই অনুভব করিতে পারা যায় । * একেই বলে ‘গরু মেরে জুতা দান ।’ চুরি করিয়া ধর্ম্ম কার্য্য সমাধান !! হায় রে হিন্দুশাস্ত্র, হায় ঋষিবাক্য ।

বর্ত্তমান কালের ন্যায় মনুর সময়ে যাহার যে ব্যবসা ইচ্ছা সে সেই ব্যবসা করিতে পারিবে এরূপ নিয়ম ছিল না । বৈশ্ব শূদ্ধকে তাহাদের নিজ নিজ ব্যবসাই করিতে হইত । বৈদিক সময়ের অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা ।

* মনু বলিতেছেন :—

বৈশ্ব শূদ্রৌ প্রযত্নেন স্থানি কৰ্ম্মাণি কারয়েৎ ।

তৌ হি চ্যুতৌ স্বকৰ্ম্মভ্যঃ ক্ষোভয়েতামিদং জগৎ ॥ ৪১৮

“রাজা যত্নসহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে গৃহ্য কার্যে নিযুক্ত রাখিবেন—
যেহেতু ঐ উভয়ে বা স্ব কার্য্যাত ইহঁতে জগতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত
হয় ।” ৪১৮

শূদ্রের প্রতি অত্যাচার করিতে দখালু ব্রাহ্মণগণ বিন্দুমানও ক্রটা
কবেন নাই—তাহার পরিচয় পূন্যে দান করিয়াছি ; আরও বিধিও
প্রদান করিব ।

মন্ত্র নবম অধ্যায়ে বর্ণিতহেতেন :—

ব্রাহ্মণান্ বাধমানস্তু কামাদবরবর্ণজন্ ।

অন্যচ্চৈবৈবধোপারৈকস্বৈজনকরৈনুপঃ ॥২৪৮

“শূদ্রবর্ণ যদি কামভঃ ব্রাহ্মণকে শাবীক্ষিক না আর্থিক পীড়া দেয়,
তবে রাজা উদ্যোগকর নানিবিধ বর্ণভেদাদি বিনিষ বধোদ্যায় দাবী জামাদে
বধ করিবেন ।” চোর প্রাণী শূদ্র এর—বৈশ্যের মধ্যেও স্বাভাবিক দৃষ্টে তা ।
রাজ্য্য অন্যত্র বা ব্রাহ্মণের পক্ষে চরি করান প্রাণীজন মন্ত্রের সময়ে ১৭৮৮
দিন না । সেই সমুদয় নিম্নশ্রেণীস্থ ভক্তজন তৎকালীন প্রাণী মন্ত্র বিধি : প্রাণী
বিধানইয়া করিয়া গিয়াছেন । বর্তমান সময়ে কোনও সভ্যদেশে এইরূপ
আইন প্রচলিত ইহঁতে সমুদয় সভ্যজগৎ তাহাদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে
না দেখিয়া থাকিতে পারিত না ।

মন্ত্র আরও বর্ণিতহেতেন :—

যে তত্র নোপ মর্পেয়ুর্ন । প্রাণিহিতাচ্চ যে ।

তান্ প্রমজ্জ নৃপো হন্যাৎ সনিদ্রজ্ঞাতিবাক্তবান্ ॥২৬৯

নবম অধ্যায়, মন্ত্র ।

“চার প্রেরিত ইহঁরাও শঙ্কা বশতঃ যাহারা (যে সমস্ত চোর)
ভাগমন না করে, ইহঁরা রাজা স্বয়ং ঐ সকল ব্যক্তিকে স্ত্রীপুত্রাদির সহিত
বধ করিবেন ।” একজন অপরাধীর জীবনের সঙ্গে অন্য অবশিষ্ট

নিরপরাধা স্ত্রী পুত্রের জীবন নাশ করা যে কত দূর নৃশংসতার পরিচায়ক তাহা বলিবার নহে । পরের শ্লোকেই বলিতেছেন :—“ধার্মিক রাজা” মাল না থাকায় চোর নিশ্চয় না হইলে উহাকে বিনষ্ট করিবেন না ; কিন্তু চোরের উপকরণ ও হৃত দ্রব্য সমেত চোর নিশ্চিত হইলে কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই উহাকে বধ করিবেন ।” ২৭০

শূদ্র চোরদিগেব দণ্ড সম্বন্ধে অত্র এক শাস্ত্রকার কৃপাপূর্বক বলিয়াছেন :—“রাজা অপহৃত বস্তু চোরের নিকট হইতে তৎস্বামীকে দেওয়াইয়া শূলারোহণাদি বিবিধ উপায়ে তাহার বধ দণ্ড করিবেন ।” বলা বাহুল্য এরূপ দণ্ড ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের জন্য নহে । শূদ্রদের প্রতি ধর্মশাস্ত্রকারের কি মেহ !

মনুসংহিতার অত্র বিয়ুসংহিতাতেও শূদ্রের প্রতি কঠোর দণ্ডের বিধান আছে যথা :—

অথ মহাপাতকিনো ব্রাহ্মণ বর্জ্জং সর্বৈ বধ্যাঃ ॥ ১ ॥

ন শারীরো ব্রাহ্মণস্ত দণ্ডঃ” ॥ ২ ॥

পঞ্চম অধ্যায়, বিয়ুসংহিতা ।

“ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকল বর্ণের মহা পাতকীই বধ্য । ব্রাহ্মণের দৈহিক দণ্ড নাই ।” গৌতম সংহিতাও ঐ একই সুরে তান ধরিয়া তাঁহার উদার ধর্মমত প্রচার করিয়াছেন । এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি । দ্বাদশ অধ্যায়ে গৌতম বলিতেছেন :—

শূদ্রো দ্বিজাতীনভিসম্ব্যাসাভিহত্য চ বাগদণ্ডপাক্ষ্যাভ্যাগমঃ মোচ্যো যেনোপহৃতাদার্য্যস্ত্যভিগমনে লিঙ্গোদ্ধারঃ । স্বহরণঞ্চ গোপ্তা চেদ্বধোহধি-
কোহথাহাস্ত বেদযুপশৃংখতন্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণমুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো
ধারণে শরীরভেদ আসন-শয়নবাকপথিষু সমপ্রেমদণ্ডাঃ শতম্ ।

“শূদ্র যদি কোন দ্বিজাতির প্রতি তিরস্কারসূচক বাক্য প্রয়োগ

করিয়া তাহাকে কঠোরভাবে আঘাত কবে, তাহা হইলে যে অঙ্গ দ্বারা আঘাত করিবে রাজা তাহার সেই অঙ্গচ্ছেদ করিবেন । * * * * *
 শূদ্র যদি দ্বিজাতির ধন হরণ করিয়া গোপন করে, তাহা হইলে তাহার জীবন অবধি দণ্ড হইতে পারে । শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করা রূপ “মহাপাপ কার্য্য” করে তাহা হইলে রাজা সীমা এবং জৌ গদাইয়া তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া উহা বুজাইয়া দিবেন । বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বা ছেদন করিবেন এবং বেদমন্ত্র ধারণ করিলে, যে অঙ্গে ধারণ করিবে, সেই অঙ্গ ভেদ করিবেন । আসন শয়ন বাক্য এবং পথে যদি কোন দ্বিজাতির সহিত সমান ব্যবহার (বরাবরি) করিতে ইচ্ছা করে—তাহা হইলে তাহার শতপদ দণ্ডবিধান করিবে । * * * * *

কিন্তু ব্রাহ্মণ শূদ্রের উপর কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিলে একেবারে দণ্ডনীয় হইবে না ।” চমৎকার ব্যবস্থা এরূপ না হইলে কি ধর্মশাস্ত্র নাম দেওয়া যায় ? ধর্মরাজ যেন ব্রাহ্মণের দোষ, তাঁহাদের বেলায় কোনই দণ্ড বা প্রায়শ্চিত্ত নাই, যত দোষ যত অপরাধ যত দণ্ড যত বিধি নিষেধ আইন কানুন সব হতভাগ্য শূদ্রদের “জন্তু” । শূদ্রদিগকে পিসিয়া মারিবার জন্তই যেন সমুদয় সংহিতাকার একযোগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কলম ধরিয়াছিলেন ।

শূদ্রেরা নামমাত্র অপরাধ করিলেও যে নিস্তার পাইবে না তাহা ত দেখাইলাম, এখন স্পর্শ করিলে কি দণ্ড হয় শুনুন :—

কামকারেণাস্পৃশ্তস্তৈবর্ণিকংশনু স্পৃবধ্যঃ ॥ ১০২

পঞ্চম অধ্যায় ; বিষ্ণুসংহিতা ।

“অস্পৃশ্ত জাতি জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে স্পর্শ করিলে বধ্য হইবে ।”

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

* * * * * চণ্ডালশ্চৈবশনু স্পৃশনু ॥ ২৩৭ ইত্যাদি ।

অর্থাৎ “* * * যে চণ্ডাল হইয়া উত্তমবর্ণকে স্পর্শ করে ; যে, শূদ্র প্রব্রজিত যতিদিগকে দৈব পিতৃ-কার্য্যে ভোজন করায় * * * *
যে অযোগ্য হইয়া যোগ্যোপযুক্ত কর্ম্ম করে (শূদ্রের পক্ষে বেদাধ্যয়নাদি)
* * * তাহার শতপণ দণ্ড হইবে । ২৩৭—২৪০ ।”

শুধু কি চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিগণের স্পর্শেই ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মহানী ?
না তাহা নহে । তাহাদেব অবলোকনেও অমঙ্গলের সম্ভাবনা ।

কাত্যায়ন ঋষি বলিতেছেন :—

পাপিষ্ঠং তুর্ভগামন্ত্যং নগ্নমুৎকৃতনাসিকম্ ।

প্রাতরুথায় যঃ পশ্যেৎ স কলেকপযুজ্যতে ॥ ১০

কাত্যায়ন-সংহিতা ।

“যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া, পাপিষ্ঠ ব্যক্তি, * * * *
অন্ত্যজ, উলঙ্গ এবং ছিন্ননাসিকা ব্যক্তিকে অবলোকন করে সে কলিযুক্ত
হয় ।”

ইহা হইতেই বোধ হয় আমাদের দেশে প্রাতঃকালে, যাত্রাকালে,
কোনও মাদ্রলিক কার্য্যে নরসুন্দর, তৈল-বিক্রেতা কলু প্রভৃতির মুখ দর্শন
করা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিবার কুসংস্কার জন্মিয়া
থাকিবে । ক্রমে এইভাবে বন্ধমূল হইয়া সমাজের অস্থিগজ্জায় প্রবেশ
করিয়াছে ।

মাদ্রাজের পারিয়াজাতির প্রতি তথাকার অভিজাত সম্প্রদায় যেরূপ
ব্যবহার করিয়া থাকেন ; এদেশে নিষাদ, মেদ, চুধু, অন্ধ্র, মাদা, ক্ষত্র,
উগ্র, পুন্ড্র, ধিগণ এবং বেণজাতির প্রতিও মত্ন সংহিতা ঐরূপ ব্যবস্থা
করিয়াছেন । সুধিগণের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কায় আমরা উহার মূল উদ্ধৃত না
করিয়া কেবলমাত্র বন্ধানুবাদ প্রদান করিলাম—

মত্ন দশম অধ্যায়ে লিখিতেছেন :— * * * * “পূর্ব্বোক্ত

ঐ সকল জাতি স্ব স্ব বৃত্তি অবলম্বনে জীবন ধারণ করতঃ চৈতন্যবৃক্ষমূলে, পল্লত সমীপে, শ্মশানে বা উপবনে বাস করিয়া থাকে । ৫০ । চণ্ডাল, এবং স্থপচ জাতির বাসস্থান গ্রাম বহির্ভাগে দেয়, এবং ইহাদিগকে পাত্র-রহিত করা কর্তব্য * * * * * একস্থানে অবস্থিত না থাকিয়া সর্বদা পরিভ্রমণ ইহাদের নিত্যকৰ্ম্ম । ০২ । সাধুরা যখন বৈধ-কৰ্ম্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিবেন, তখন ইহাদিগের দর্শনাদি ব্যবহার নিষেধ । * * * * * ইহাদিগকে অন্নপ্রদান করিতে হইলে, ভদ্রলোকেরা (৭) ভৃত্যদ্বারা ভগ্নপাত্রে অন্ন প্রেরণ করিবেন এবং গ্রামে বা নগরে রাত্রি-কালে ইহাদের যাতায়াত একবারে নিষেধ । * * * * * রাজনির্দিষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া উহার দিবাভাগে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া স্বকাৰ্য্য সাধন করিবে ।”

শূদ্রদের প্রতি তৎকালিক ব্রাহ্মণগণের অপার স্নেহ প্রীতির এই ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইল । এক্ষণে শূদ্রদের জীবন ব্রাহ্মণগণের নিকট কিরূপ মূল্যবান ছিল, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক । মনু একাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন :—

মার্জ্জারনকুলৌ হস্তা চাযং মণ্ডুকমৈবচ ।

স্ব গোধোলুককাকাংচ শূদ্রহত্যাভ্রতং চরেৎ ॥ ১৩২

“জ্ঞানতঃ বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, ভেক, কুকুর, গোধা, পেচক ইহাদের একটিকে হত্যা করিলে, শূদ্রহত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।” ১৩২

তৎপরে পুনরায় শ্লোক বলিতেছেন :—

অগ্নিমতান্ত সত্ত্বানাং সহস্রশ্চ প্রমাপণে ।

পূর্ণে চানশ্বনশ্চ শূদ্রহত্যাভ্রতং চরেৎ ॥ ১৪১

একাদশ অধ্যায় ।

কুকলাণ প্রভৃতি (কুল্লকভট্ট) অস্থিবিমিষ্ট সহস্র প্রাণিবধে এবং অস্থি-
হীন একশকট পরিমিত মৎকুণ প্রভৃতি প্রাণীবধে শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত
করিবে। ১৪২। 'মহর্ষি অত্রি তদীয় সংহিতায়' মনুর কথারই প্রতিধ্বনি
করিয়া শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত বিধান এইরূপে করিতেছেন :—

শরভোষ্ট্রহয়ান্নাগান্ সিংহশাৰ্দূনগদভান্।

হস্তা চ শূদ্রহত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্তাং বিধীয়তে। ২২২

অত্রি সংহিতা।

“শরভ (অষ্টচরণ মৃগ বিশেষ) উষ্ট্র, অশ্ব, হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র বা গর্দভ
হত্যা করিলে শূদ্রবধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।”

শূদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে পরাণর ঋষি কি বলিতেছেন শ্রবণ
করুন—

চোরঃ স্বপাকচাণ্ডাল বিপ্রেনাপি হতা যদি।

অহোরাত্রোপবাসেন প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ॥ ১৯

পরাণর সংহিতা।

“ব্রাহ্মণ কর্তৃক চোর স্বপাক বা চণ্ডাল বিনষ্ট হইলে, সেই ব্রাহ্মণ এক
দিবারাত্র উপবাস পূর্বক প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন।”
ইহা দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে—‘শূদ্রের জীবন,’ সংহিতাকারগণের
নিকট কতদূর হেয় ও তুচ্ছ ছিল। ফল কথা শূদ্রকে সর্বপ্রকার
অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সংহিতাদি যুগের ব্রাহ্মণগণ বিন্দুমাত্র চেষ্টার
ক্রটি করেন নাই। জপ তপ সাধন ভজন ধন উপার্জন, ধন সম্পাদ ভোগ,
উৎকৃষ্টতর বৃত্তি অবলম্বন প্রভৃতি সর্বপ্রকার শারীরিক মানসিক সুখ
সুবিধা ও উন্নতি হইতে হতভাগ্য শূদ্রগণকে তাঁহারা বঞ্চিত করিয়াছেন।
স্বলতঃ ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া আমরা এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিব।
শূদ্রদিগকে ধনাদি হইতে বঞ্চিত করিয়া মনু বলিতেছেন :—

সৰ্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণশ্চৈব যং কিঞ্চিজ্জগতীগতং ।

শ্রৈষ্ঠ্যোলাভিজনেদং সৰ্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোহইতি ॥ ১০০

স্বমেব ব্রাহ্মণোভুক্তোক্তে স্বং বস্তু স্বং দদাতি চ ।

আনুশংস্তাব্রাহ্মণস্ত ভুক্ততে ইতরে জনাঃ । ১০১

মন্ত্র, প্রথম অধ্যায় ।

“ত্রৈলোক্যাস্তর্কর্তা সমুদয় ধনই ব্রাহ্মণের নিজস্ব । সর্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্টস্থানজাত বলিয়া ব্রাহ্মণই সমুদয় সম্পত্তি প্রতিগ্রহের যোগ্য পাত্র । ১০০ । ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন করেন, যাহা পরিধান করেন, যাহা দান করেন, তাহা পরকীয় হইলেও নিজস্ব ; যে হেতু ব্রাহ্মণেরই অনুগ্রহ বলে অপরাপর লোকে ভোজন পানাদি দ্বারা জীবিত রহিয়াছে ।” ১০১ ।

এইত গেল শূদ্রাদিগণের ধনের উপর আপনাদের অধিকারের কথা— অর্থোপার্জনের অধিকারের কথা শ্রবণ করুন । দশম অধ্যায়ে মন্ত্র বলিতেছেন :—

শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্যো ধনসঞ্চয়ঃ ।

শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণানেব বাধতে ॥ ১২৯

“অর্থোপার্জনে সক্ষম হইলেও শূদ্রের তৎসঞ্চয়ার্থ যত্নবান্ হওয়া উচিত নহে ; কারণ শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন শূদ্র ধনমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমাননা করিতে পারে ।” ১২৯ ।

শূদ্রাদি তথাকথিত অধম জাতিগণের পক্ষে উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বন করা মহা অপরাধের কার্য্য । দাসত্ব করা ব্যতীত শূদ্রের আর অন্য উৎকৃষ্ট বৃত্তি নাই ।

ঐ দশম অধ্যায়েই মন্ত্র বলিতেছেন :—

যো লোভাদধমো জাত্য জীবেত্ৎকৃষ্টকর্ম্মভিঃ ।

তং রাজা নির্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রেমেব প্রবাসয়েৎ ॥ ৯৬

“যদি কোন অধম জাতীয় ব্যক্তি, উৎকৃষ্ট জাতির বৃত্তি অবলম্বন পূর্বক জীবিকানির্বাহ করে, তাহার সর্বস্ব গ্রহণ পূর্বক শীঘ্র তাহাকে স্বদেশ হইতে নিষ্কাশিত করা রাজার কর্তব্য” । ৯৬ । এইরূপ বিধি যদি বর্তমান কালে রাজাজ্ঞায় প্রচলিত থাকিত তবে ষাঁহাদের উৎপত্তিতে ভারতবর্ষ ও এমন কি পৃথিবী পর্যন্ত ধন্য হইয়াছে,—ষাঁহাদের উৎপত্তিতে সমাজ দেশ জাতি উন্নত হইয়াছে—তাঁহাদিগের অস্তিত্ব কেহ আশা এবং অনুমান পর্যন্ত করিতে পারিতেন কি ? খৃষ্ট, পার্কার, নানক, মহম্মদ প্রভৃতি যুগাচার্য্যগণ এবং কেশবচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, কৃষ্ণলাল, লুথার, মহেন্দ্রলাল সরকার, মনোমোহন, লালমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, পরাঞ্জপে, আনন্দমোহন প্রভৃতি ভারত বিখ্যাত এক একটা উজ্জল মণিকে পৃথিবী কখনও অন্ধে ধারণ করিতে সমর্থ হইত না । কারণ ইহারা সকলেই মনুর মতে ব্রাহ্মণের জাতীয় । ব্রাহ্মণের শূদ্রজাতির পক্ষে দ্বিজাতিগণের দাসত্ব করা ভিন্ন আর কোনও বৃত্তি ছিল না—আর কোনও গতি ছিল না । অতঃপর শূদ্রগণের ধর্মজীবনের প্রসঙ্গে অত্রি বলিতেছেন :—

জপস্তপস্তীর্থযাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনম্ ।

দেবতারাধনঞ্চৈব জীশূদ্রপতনানি ষট্ ॥ ১৩৫

অত্রি সংহিতা ।

“জপ, তপস্তা, তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্রসাধন, দেবতা আরাধন, এই ছয়টা কার্য্য জী শূদ্রের পাতিত্বজনক” । মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য ভগবানকে লাভ করা । কিন্তু ভগবান্নাভের যে ছয়টা উপায়কে পূর্বাচার্য্যগণ পরমোপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, যাহার একটি মাত্র অবলম্বনে ও সাধনায় মানুষ ভীষণ সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে পারে, যাহার একটি মাত্রকে আশ্রয় করিয়া মানুষ কঠিনতর হৃদেদ্য মায়াপাশ অনায়াসে ছিন্ন করিয়া পরম ধামে উপনীত হইতে পারে, পরম প্রেমময় মঙ্গলাম্পদের অভয় দরবারে কটিকল্পান্ত

পর্যাপ্ত আশ্রয় পাইতে পারে, নিষ্ঠুর শাস্ত্রকাবগণ ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি কতগুলি শব্দ সৃষ্টি করিয়া কোটী কোটী নবনাবীকে তাহা হইতে এমন কবিয়া বঞ্চনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। নাবাগণেব পাঞ্চজন্ম শজ্ঞানাদ স্বরূপ যে সর্ব-বিদ্যা সর্ব জ্ঞানাত্মক সর্ব শক্ত্যাধার প্রণব ওঁঙ্কার ধ্বনিতে পাপাশুব দল ও কামক্রোধাদি প্রবল প্রতাপান্বিত দৈত্যদানব ত্রাসিত ও কম্পিত হইয়া উঠে, যে মধুব শব্দ উচ্চারণে হৃদয় মধ্যস্থ সচ্চিদানন্দময় প্রভু আনন্দে তবঙ্গ ভঞ্জে নাচিয়া উঠেন—সেই বেদবেদান্তের সারভূত প্রণব উচ্চারণে—কোটী কোটী নব নারায়ণকে শূদ্ররূপ কল্পিত নামে অভিহিত কবিয়া বঞ্চিত করা হইয়াছে ও হইতেছে। অত্রি পূর্বোক্ত শ্লোকে শূদ্রগণকে জপ, তপশ্চা মন্ত্রসাধন ঈশ্বরারাদনা হইতে শুধু নিবৃত্ত কবিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই—তাহাদিগকে রীতিমত প্রাণ দণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিত হইয়াছেন।

অত্রি তদীয় সংহিতার ঊনবিংশশ্লোকে শূদ্রেব ঈশ্বরারাদনা জপ তপ প্রভৃতি গুরুতব অপবাধে নিম্নলিখিত দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

“বধ্যো বাজ্ঞা স বৈ শূদ্রো জপহোমপবচ্চ যঃ ।

ততো রাষ্ট্রগ্য হস্তাসৌ যথা বহুচ্চ বৈ জলম্ ॥ ১৯

“জপ হোম প্রভৃতি দ্বিজোচিত কর্ম-নিবত শূদ্রকে রাজা বধ করিবেন ; কারণ, জলধারা যেমন অনলকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ঐ জপহোমতৎপর শূদ্র সমস্ত রাজ্যকে বিনষ্ট করে।” সম্ভবতঃ এইরূপ মত প্রদর্শনের নিমিত্তই বামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক শূদ্রক তপস্বীর শিবচ্ছেদের উপাখ্যান রচিত হইয়া থাকিবে ও পরবর্তী কালে বামায়ণে উহা প্রক্ষিপ্ত হইয়া যাইবে। এইত গেল শূদ্রনামধারী হতভাগ্য জীবগণের প্রতি তাহাদের ধর্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণের অপার ভালবাসা ও দয়াব নিদর্শন। তার পর খুঁটি নাটী ধরিয়া যে কত প্রীতি-ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। কোন

স্থানে শূদ্রেব ঘৃণিত ও নিন্দিত নাম রাখিবার কথা বিনির্দেশন । কোনও স্থানে “ধোপাকে এবের বস্ত্রের দণ্ডিত জাতের বস্ত্র বিশাইতে নিষেধ করিয়া বিধি বিনির্দেশন ।” (মহু ত্রিষ্টম অধ্যায় ৩৯৬ । শূদ্রকে আশীর্বাদ করিবার প্রাসঙ্গে আক্ষবঃ সংহিতা বর্ণিতহেচন :—

অপ্রণামে ত শূদ্রেহপি যন্তি বো বদাত্তি দ্বিগঃ

শূদ্রাৰ্হপি নববঃ বারিঃ প্রাকগোহি । ৩৭ । ৫০

“শূদ্র পণ্ডিত না কাবনেও যে ব্রাহ্মণ ভাষাতে আশীর্বাদ বনে, সেই ব্রাহ্মণ । ও শূদ্র উত্তম বাক্যে গমন করে ।” ৫০ । শূদ্র । ৩৭ । ৫০ । ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ টীকা শূদ্রেব গদ্যবর্ণন ! প্রাণের দান, তবে আশীর্বাদ ! ৩৭ । ৫০ । দ্বিগঃ বারিঃ শূদ্রেব ব্রাহ্মণ বাক্যে ব্রাহ্মণ হানোনে ক্রান্ত ! হা শূদ্র বা !

ব্রাহ্মণ শূদ্রেব গার্হব্যের আকাশ পাতালে মাত্ত তুলনা করিলেও বোধ হয় অসঙ্গত হবে ।। যেন না ব্রাহ্মণের হারা ৩ পুণ্য, শূদ্রের তাহাতেই পাপ । ধর্মশাস্ত্রের এই উক্ত বাক্য নিষেধ বাক্যে, একমাত্র ধর্মশাস্ত্রের বিধানের সঙ্গ । প্রাণের দান এবং দান দ্বারা নিষেধ প্রদান হইতেছে, ইহা ঘানাই সুখেরক্ষা অনায়াসে ব্রাহ্মণ শূদ্র । বৈষ্ণব পবিত্র করিতে সঙ্গ হইবে ।

অত্রি সংহিতা বিনির্দেশন :—

পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছন্দো ব্রাহ্মণস্ত জ্বাং পিনেৎ ।

উভৌ তৌ তুণ্যদোষৌ চ বসতো নবকে চিৎসন ॥ ২৯৪

“পঞ্চগব্যপানী শূদ্র এবং জ্বাপাণী ব্রাহ্মণ উভয়েই তুণ্যপানী ; এই দুই ব্যক্তি চিরদিন নরকে বাস করে ।” অর্থাৎ যে পঞ্চগব্য পান করিলে ব্রাহ্মণ মহা পাপ হইতে মুক্তি পায়, সেই পঞ্চগব্য পান করিলে শূদ্র চিরকালের জন্য নরকে নিমগ্ন হয় । একজনের বাহাতে পুণ্য অথবা

তাহাতেই পাপ ও নরক । এ সম্বন্ধে অধিক টীকা টীপনীর প্রয়োজন নাই । শূদ্রের প্রতি অত্যাচারের কথা লিখিতে গেলে বৃহৎ একখানা পুস্তক হইয়া পড়ে । মনু, যম প্রভৃতি সংহিতাকারগণ শূদ্রের প্রতি গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াই নিরস্ত হয়েন নাই, শূদ্রযাজ্ঞী ব্রাহ্মণগণের পৃষ্ঠে পর্য্যন্ত তীব্রভাবে কশাঘাত করিয়াছেন—তাহাদিগকেও শূদ্রের হায় স্থগিত চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন ।

এ অধ্যায়ে এ পর্য্যন্ত ত আমরা শূদ্রদের প্রতি ঘোর অত্যাচারের প্রমাণই প্রদর্শন করিলাম । তাহাদের কি করা কর্তব্য, সে কথা একটী বারও উল্লেখ করি নাই, বিধি নিষেধের কথা অনেক বলিয়াছি । এক্ষণে তাহাদের ধর্ম কি, কর্তব্য কি, কোন্ পথ অবলম্বনীয় ও শ্রেষ্ঠ, কোন্ পথে যাত্রা করিলে তাহারা স্বর্গবাজ্যে উপনীত হইতে পারিবে তাহাই সরল সহজ কথায় উল্লেখ করিব । পূর্বে বলিয়াছি মনু শূদ্রদেব প্রতি বড়ই দয়ালু । স্মৃতরাং তিনি তাহাদের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া বহু চিন্তার পর একটী উত্তম ধর্ম বাছিয়া বাহির করিয়াছিলেন । তাহাই শূদ্রদের একমাত্র শ্রেয়ঃ ও শ্রেষঃ ধর্ম । এমন সোজা সরল ধর্মের কথা পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মশাস্ত্রকারগণ অবগত ছিলেন না । মহর্ষি মনু বহু শত বৎসর তপস্যার পর তাহা আবিষ্কার কবিত্তে সমর্থ হইয়াছেন । তাহার এ অদ্ভুত অচিন্তিত অলৌকিক আবিষ্কারে পৃথিবী ধন্য হইয়াছে—শূদ্র জাতি ধন্য হইয়াছে । সে আবিষ্কৃত ধর্ম হইতেছে—দ্বিজ সেবা—অনন্তমনে মিস্কাম প্রাণে—দ্বিজ সেবা । তাহাদের আব ধর্ম নাই কর্ম নাই যাগ নাই যজ্ঞ নাই পূজা নাই অর্চনা নাই—আছে কেবল দ্বিজ সেবা । ঐ গুণন—মনু পবিত্রকণ্ঠে বলিতেছেন :—

“সর্গাঙ্গমুভয়ার্থং বা বিপ্রানারাদয়েন্তু সঃ

জাতব্রাহ্মণশব্দশ্চ সা হস্ত কৃতকৃত্যতা ॥ ১২২

“বিপ্রসেবৈব শূদ্রস্ত বিশিষ্টং কৰ্ম কীর্ত্যতে ।

যদতোহন্যচ্চি কুরুতে তদ্বত্যাশ্চ নিষ্ফলম্ ॥ ১২৩ । ১০ ম, অঃ

অর্থাৎ “স্বর্গলাভার্থ, অথবা স্বর্গ ও নিজজীবিকা—এতদুভয়ের লাভার্থ ব্রাহ্মণ, শূদ্রেব আরাধ্য । “ব্রাহ্মণ সেবক”—এই শব্দবিশেষণ মাত্রই শূদ্র কৃতার্থতা লাভ করে । ১২২ । বিপ্রসেবাই শূদ্রের পক্ষেই বিশিষ্ট কার্য্য বলিয়া কীর্তিত হয় এবং এতদিন যে যাহা কিছু করে তৎসমস্তই তাহার পক্ষে নিষ্ফল” । ১২৩

আমরা কি এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি না, হে ভারতের ‘চলমান শাসন,’ তথা কথিত হতভাগ্য শূদ্র জাতি, তোমরাই কি মনু অত্রি কথিত সেই ঘৃণিত পদদলিত লাক্ষিত, বেদবেদান্ত উচ্চারণে অনধিকারী শিক্ষা দীক্ষা হইতে চিরবঞ্চিত, সোপার্জিত ধনৈশ্বর্য্য ভোগে অসমর্থ, ‘জঘন্য স্থান হইতে উদ্ধৃত,’ দাস সংজ্ঞায় অভিহিত শূদ্রজাতি ? তোমরাই কি সেই পৌরাণিক যুগের অত্যাচার জর্জরীত ব্রাহ্মণ কর-কষাঘাতে রক্তাক্ত কলেবর ভীষণ পৌরহিত্য শক্তি সংবন্ধনের সহজলব্ধ উপাদান—আশাউদ্যম বিহীন মৃত প্রায় শূদ্রজাতি ? তোমরাই কি সেই পরবর্ত্তীযুগের ব্রাহ্মণ্য-শক্তি কর্তৃক জিহ্বাচ্ছেদ শরীর ভেদাদি দয়াল দণ্ডে উৎপীড়িত জাতির ঘৃণিত বংশধর শূদ্রজাতি ? তোমরাই কি সেই সর্বশক্তির আধার ভারতের মেরুদণ্ড স্বরূপ অথচ মহামোহাচ্ছন্ন আত্মশক্তি অবিদিত নিদ্রিত সিংহতুল্য অবমানিত শূদ্রজাতি ? হে বজ্রের বৈদ্য কায়স্থ বারজীবী সংগোপ কর্ণকর কুন্তকার স্বর্ণকার তিলি তাষুলি নরসুন্দর সাহা তন্তুবার মালাকার সূত্রধর প্রভৃতি ব্রাহ্মণ কথিত হীনজাতীয় শূদ্রগণ । তোমরা কি মনু* কথিত অত্যাচার নিপীড়িত হতভাগ্য শূদ্রজাতির বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে বিশ্বাস কব ? তোমরা কি বিশ্বাস কর, ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সেবার জন্যই পরম মঙ্গলময় দয়ার জলধি পরমেশ্বর তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন ?

তোমরা কি খাবণ বিশ্বাস কর, ভগবান্ তোমাদিগকে সর্বাধিকার স্বয়ং
 সৃষ্টিয়া বিদ্যাভ্যাসে ও তেঁও চির বঞ্চিত করিয়া ভগবৎ চরণাবনত দাঁড়
 করিয়া তোমাদিগকে এ সংসার ক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছেন ? শুধু এ
 বৈদ্যবোধ—শুধু জগৎপদে মগ্ন হইয়া আত্মবোধ নাই—
 নৈব কবিবোধ স্যাদি তাহাদের ভাষা—দান করিয়াই প্রকৃতি শৃঙ্গারে প্রবেশ
 করিয়াছেন, ধর্মোপার্জন ধর্মবিশ্বাসে তাহাদের কিছুলাই থাকিয়া নাই—
 প্রাক্ষণাদি অর্থাৎ নান্দ্রিয়ার ভোগেই তাহাদের বৈদ্যবোধ অজ্ঞান কার্যে
 তাহাদের কথারি তাহাদের চরিত্র তাহাদের হৃদয়াদি সমস্ত নিষ্ঠুর আদেশমুদিত
 কি তোমরা এত ভিত্তিহীন বা তা বিশ্বাস কর ? তোমরা কি আপনাদিগকে
 প্রকৃত শৃঙ্গারগত মানস পাঠাইতে নোংরা হইতে চাও ?
 তোমরা কি মন্তব্য এত কালের ধর্মোপার্জন প্রভৃতি সমস্ত বৈদ্যবোধ
 নষ্ট করিয়া দিয়া তাহাদের ভোগেই তাহাদের বৈদ্যবোধ অজ্ঞান কার্যে
 তাহাদের কথারি তাহাদের চরিত্র তাহাদের হৃদয়াদি সমস্ত নিষ্ঠুর
 আদেশমুদিত কি তোমরা এত ভিত্তিহীন বা তা বিশ্বাস কর ? তোমরা কি
 আপনাদিগকে প্রকৃত শৃঙ্গারগত মানস পাঠাইতে নোংরা হইতে চাও ?
 তোমরা কি মন্তব্য এত কালের ধর্মোপার্জন প্রভৃতি সমস্ত বৈদ্যবোধ
 নষ্ট করিয়া দিয়া তাহাদের ভোগেই তাহাদের বৈদ্যবোধ অজ্ঞান কার্যে
 তাহাদের কথারি তাহাদের চরিত্র তাহাদের হৃদয়াদি সমস্ত নিষ্ঠুর
 আদেশমুদিত কি তোমরা এত ভিত্তিহীন বা তা বিশ্বাস কর ? তোমরা কি
 আপনাদিগকে প্রকৃত শৃঙ্গারগত মানস পাঠাইতে নোংরা হইতে চাও ?
 তোমরা কি মন্তব্য এত কালের ধর্মোপার্জন প্রভৃতি সমস্ত বৈদ্যবোধ
 নষ্ট করিয়া দিয়া তাহাদের ভোগেই তাহাদের বৈদ্যবোধ অজ্ঞান কার্যে
 তাহাদের কথারি তাহাদের চরিত্র তাহাদের হৃদয়াদি সমস্ত নিষ্ঠুর
 আদেশমুদিত কি তোমরা এত ভিত্তিহীন বা তা বিশ্বাস কর ? তোমরা কি
 আপনাদিগকে প্রকৃত শৃঙ্গারগত মানস পাঠাইতে নোংরা হইতে চাও ?

বিশ্রাম হউক, এইখানেই কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া যাউক, এইটুকু আসিয়াই ভাষা বিদায় গ্রহণ করুক । যদি বিশ্বাস কর, তবে আর কিছু বলিবার নাই— আর কিছু লিখিবার নাই । বুঝিলাম তোমরা মৃত—চির নিদ্রিত । চির নিদ্রিত ব্যক্তিকে কে জাগাইতে পারে ? কে উঠাইতে পারে ? বুঝিলাম অজ্ঞানতার ঘন ঘোর ঘটাচ্ছন্ন নিবিড় তমসায় তোমরা নিমজ্জিত, বুঝিলাম তোমাদের কর্মবন্ধন এখনও ছিন্ন হয় নাই । সুতরাং আর অধিক বলা নিম্প্রয়োজন । শেষ একটা কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিব । পূর্বে বলিয়াছি শুধু বিশ্বাস করি বলিলে চলিবে না, কায়মনোবাক্যে তাহার পরিচয় দাও । যদি বিশ্বাস কর, তবে এই মুহূর্ত্তে—এই দণ্ডে, যাহাদের জ্ঞান বিদ্যা তাহাদিগকে প্রদান করিয়া, যাহাদের ধন ঐশ্বর্য্য তাহাদিগকে প্রদান করিয়া,—(কেন না শুদ্রের ধনাদিতে তাহার নিজের কোনই অধিকার নাই, ব্রাহ্মণাদিরই সম্পূর্ণ অধিকার) যাহাদিগের আধিপত্য তাহাদিগের হস্তে ব্রহ্ম করিয়া, যাহাদিগের প্রাধান্ত্য গৌরব তাহাদিগকে পুনঃ প্রদান করিয়া, জীর্ণ বস্ত্র ছিন্ন বসন পরিধানপূর্ব্বক গললগ্নি কৃতবাসে করজোড়ে দীনের দীন, দাসের দাস সাজিয়া ব্রাহ্মণের চির আশ্রয় অভয় চরণ তলে পড়িয়া যাও,—“না জানিয়া মহা অপরাধ করিয়াছি—আপনাদের চায়া অধিকার দানে প্রতারণা করিয়াছি” বলিয়া—চরণধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর । “প্রভু কৃপা কর, এ দীনহীন মূর্থ্য শুদ্রগণের অপরাধ মার্জ্জনা কর” বলিয়া, ব্রাহ্মণগণের (তা তিনি যেমনই হউন না কেন—শুদ্রগণের ব্রাহ্মণত্বের বিচারের অধিকার নাই) চরণ তলে পড়িয়া যাও, শুদ্রের সাধন ভজন তপ জপ সার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ-চরণে নিশ্চিত ক্ষমা পাইবে । হে ধর্ম্ম বিশ্বাসী শুদ্রগণ, যাও—এই মুহূর্ত্তে গিয়া ব্রাহ্মণগণের চরণে শরণাপন্ন হও গে,—আর বিলম্ব করিও না । বিলম্বে ধর্ম্মভ্রষ্ট—ইহকাল নষ্ট, স্বর্গ দার রুদ্ধ হইয়া যাইবে । যাও—যে যাহার পূর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া,

এই মুহূর্তে ব্রাহ্মণগণের দাসত্বে ব্রতী হও গে । উকীল ওকালতি—মোক্তার মোক্তারী—ডাক্তার ডাক্তারী—জমিদার জমিদারী—রাজা রাজত্ব—মন্ত্রী মন্ত্রণা—বণিক বাণিজ্য—বিচারক বিচারাসন—জোতদার জোত জমি এবং সর্বশেষে শিক্ষক ছাঃ স্কুল কলেজ পরিত্যাগ পূর্বক—হে বিশ্বাসী শূদ্রগণ ! যে যাহার দাসত্ব কার্য্যে ব্রতী হও গে । শূদ্রের কর্তব্য দাসত্ব করা,—উপরি লিখিত কার্য্য করা শূদ্রের শাস্ত্রসম্মত নহে । তোমরা যদি দ্বিতীয় ভাগের সুশীল স্ত্রবোধ বালকের মত নিজ নিজ দাসত্বে ব্রতী হও—তাহা হইলে আর কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না—সংস্কারক আপনা হইতেই নীরব হইয়া যাইবে । একদিক্ হও,—যদি শূদ্র বলিয়া আপনাদিগকে প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস কর,—মনুসংহিতাকেই কলির একমাত্র পালনীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া—কাণ্ডারী বলিয়া মনে কর, তবে—বিশ্বাসীর মত শূদ্র কর্ম্ম ব্রাহ্মণাদির পদ সেবায় ব্রতী হও । অথ কাজ কর্ম্ম ব্যবসা বাণিজ্য ধনোপার্জন ধন সঞ্চয়াদি কর্ম্ম পরিত্যাগ কর । নতুবা কাজ করিবে, ব্যবসা করিবে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, আর পরিচয় দিবে শূদ্র বলিয়া ! ইহলৌকিক কার্য্য কর ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণের, আর পারলৌকিক কার্য্য করিতে বসিলেই নিজকে শূদ্র করিয়া বস, প্রণব উচ্চারণে নিজ হইতেই বঞ্চিত হও, ঈশ্বরের পূজায় পুরোহিতের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হও । মন মুখ এক করাই ধর্ম্ম । কিন্তু তোমরা এ কি করিতেছ ? মুখে পরিচয় দাও শূদ্র বলিয়া—কাজ কর ব্রাহ্মণাদির । এই কি তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—ধর্ম্ম জ্ঞান । এই না তোমরা শাস্ত্রের দোহাই দিতেছ—মনুর প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতেছ ? এই কি সেই বিশ্বাসের কার্য্য ? এই কি শূদ্রের কর্ম্ম ? হা ধিক ! তোমাদিগের বিশ্বাসকে ? ধিক তোমাদিগের কপটতাকে—কাপুরুষতাকে ! !

অথ যদি বিশ্বাস না কর, তবে কোটী জিমুত মস্ত্রে অত্যাচারী

হিন্দুসমাজ শরীর কম্পান্বিত করিয়া মহাবেগে উথিত হও । “নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদেব কেশরী” ভীম বলশালী কেশরীর ছায়া, হে সর্ব শক্ত্যাধার শূদ্রজাতি ! তোমরা শূদ্রত্বের পিঞ্জর চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া—পদ তলে দলিত করিয়া বাহিরে আসিয়া দণ্ডায়মান হও । বঙ্গের বা ভারত-বর্ষের এমন কোনও সামাজিক শক্তি নাই যে উহার প্রতিরোধ করিতে সমর্থ ? এ বিরাট শক্তির নিকট কোন শক্তিই তিষ্ঠিতে পারিবে না । এই দণ্ডে শূদ্রের কলঙ্ক অঙ্কিত চিহ্ন সকল মুছিয়া ফেলিয়া,—সংস্কারের জলে বিধৌত করিয়া, তোমাদের ছায়া প্রাপ্য অধিকার লাভের জন্য বন্ধপরিকর হও । এই দণ্ডে শূদ্রত্বের ক্ষুদ্র কুপ মণ্ডূকের ক্ষুদ্রতম গর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া বৈশ্বত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বের অনন্ত প্রবাহ নদ নদী ও সুবিশাল সাগরাসু-রাশিতে মিশিয়া পড়, এবং ক্রমে সুকঠোর সাধনা ও তপস্তাবলে চরম আদর্শ ব্রাহ্মণত্বের মহা সিদ্ধিতে ভাসিয়া গিয়া জন্ম জীবন সার্থক কর । স্বপ্নেও ভাবিও না, ব্রাহ্মণাদি অভিজাত সম্প্রদায় তোমাদিগকে দয়া ও স্নেহ প্রণোদিত হইয়া কখনও সামাজিক মুক্তি প্রদান করিবে, স্বপ্নেও ভাবিও না—তোমরা হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে প্রকৃতির নিয়মে আপনা আপনিই সামাজিক স্বাধীনতা আসিয়া উপস্থিত হইবে । সুতরাং আর বিলম্ব করিও না—যত শীঘ্র পার স্বাধিকার লাভের জন্য সকলে দল বদ্ধ হও । শূদ্রত্বের সর্ব প্রকার বন্ধন সবলে ছিন্ন করিয়া ফেল । আচার ব্যবহারে কাজ কর্মে মনঃ প্রাণে শূদ্রত্বের গুদ্র ভাব পরিত্যাগ কর । শূদ্রত্ব—পশুত্ব ও ক্লীবত্ব ভিন্ন কিছুই নহে । যত সত্বর পার এই শূদ্রত্ব রূপ পশুত্ব ও ক্লীবত্ব হইতে মুক্ত হও । তোমরা ভীত হইও না, কায়মনোবাক্যে ভয়শূন্য হও । অভিজাত সম্প্রদায়ের বিকট মুখভঙ্গী তোমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিও না ; উহাদের স্বভাব চিরকালই এইরূপ । উহারা কোন প্রকার সংস্কারের পক্ষপাতী নহে, পরন্তু সর্ব প্রকার সংস্কার ও উন্নতির বিরোধী এবং শত্রু ।

উহারা চিরকালই সংস্কারক দল কর্তৃক পরাজিত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং উহাদের হান্নি তাম্বিতে ভীত ও বিচলিত হইবার কোনই কারণ নাই। এ জীবন যুদ্ধে ঐ দেখে পার্থ সারথি তোমাদের সারথি হইতে প্রস্তুত হইয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। আর কাল বিলম্ব করিও না—আর হীনের মত, অধমের মত সকলের পদতলে পড়িয়া থাকিও না। তোমাদের ঘৃণা লজ্জা মান অপমান বোধ কি অন্তঃকরণ হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে! যাহারা শৃগাল কুকুরের ছায়,—ঘৃণায়—অবমাননায় দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়, যাহাদের ঘর ছয়ার ত দূরের কথা—দেবমন্দিরেও তোমাদের ছায়া স্পর্শ করিতে দেয় না, পাছে তোমাদের স্পর্শে দেবতাব সহিত দেবমন্দির পর্য্যন্ত অপবিত্র হইয়া যায় এই অশঙ্কায় সর্বদা সর্ সর্—ছুবি ছুবি করে,—তাহাদের বাটীতে যাইয়া পাত্ৰা মাঝিতে—নিমন্ত্রণ থাইয়া কৃতার্থ হইতে তোমাদের ঘৃণা হয় না। যাহারা তোমাদের জলটুকু থাইতে নারাজ,—তোমাদের কূপের জল যাহাদের নিকট অস্পৃশ্য—সেই সব হৃদয়-হীন দাস্তিকগণের পা চাটিয়া তাহাদেরই ভাত থাইতে তোমাদের বিবেকে একটুকুও আঘাত লাগে না? মনুষ্য কি একেবারে লোপ হইয়াছে! শাস্ত্রের নামে অত্যাচারিগণের ঘৃণা অবমাননা—অত্যাচার অবিচার—আর কত কাল নীরবে ভোগ করিবে? পিতা মাতার শ্রাদ্ধে দাসদাসী বলিয়া সেই স্বর্গগত পিতৃমাতৃগণকে আর কত কাল অপমানের বোঝা বহাইবে। বাপ মা যাহাদের—দাস দাসী—তাহারা কি কখন বৈশ্য ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিতে পারে? বাবা মা যাহাদের দাস দাসী—তাহাদের সম্মান কি কখন বড় বলিয়া গর্ব করিতে পারে—না বড় হইতে পারে? ধিক্ ধিক্—মাগ্যবাদী ইংরেজ রাজত্বও এমন পশুর মত—দাসের মত—অত্যাচারী উচ্চ জাতিগণের পদতলে পড়িয়া আছে! ভগবানের সম্মান এমন হীনের মত পচিয়া গরিতেছে? উঠ উঠ—বক্ষ ক্ষীত করিয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াও।

তোমরাও যে মানুষ ? ভয় কি—তোমাদের পশ্চাতে ব্রিটিশ আইন সতত রক্ষার জন্ত নিয়োজিত আছে । যাহারা কুকুরের ছায় ঘৃণা করে, গৃহ স্পর্শ করিতে দেয় না, তোমরা ছুঁইলে যাহাদের কুয়ার জল অপবিত্র অস্পৃশ্য হইয়া যায়,—তোমাদের পূজিত দেবতাকেও যাহারা তোমাদের মতই ঘৃণা করে,—তোমাদের ব্রাহ্মণগণকে পর্য্যন্ত যাহারা পশুবৎ ঘৃণা করে—সেই সব জাতির বাটীতে যাইয়া—কুকুরের ছায় প্রসাদ পাইতে তোমাদের বিন্দুমাত্রও ঘৃণা বোধ হয় না ? ধিক্ তোমার বিদ্যা বুদ্ধিতে, ধিক্ তোমাদের ধন সম্পদে, ধিক্ তোমাদের লেখা পড়া শিক্ষায় ! যাহারা বলে—তোরা হীন নীচ, অস্পৃশ্য ইতর,—যাহারা বলে তোরা ছোট লোক—পতিত, অনাচরণীয় ; সম্রাটের দূত তাহারাই ! কে বলে তাহারাই সমাজপতি । অমৃতের পুত্রকন্যাগণ, এমন মৃতের মত পড়িয়া আছ—সামাজিকগণের নির্মম নিদারুণ অপমান প্রতিদিন মাথা পাতিয়া কেমন করিয়া বহন করিতেছ ! হে বিরাট—হে হিরণ্যগর্ভ—হে মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্ম—একবার স্ব স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া জাগ্রত হও—জাগ্রত হও ।

নবম অধ্যায় ।



নিম্নশ্রেণী ।

পাঠক ! ঐ যে শীর্ণদেহ জীর্ণবাস, যুগযুগান্তরের নিরাশাব্যথিত বদন, ক্ষুধাতৃষ্ণায় দীপ্তিহীন চক্ষুর কাতর দৃষ্টি, আশা উদ্যমবিহীন পরিশ্রমসহিষ্ণু, স্বজনোন্নতি অসহিষ্ণু, বলবানের পদলেখক শ্রমজীবী দেখিতেছ উহারা কে বলিতে পার ? উহারাই ভারতের নিম্নশ্রেণী । উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বসন নাই, গৃহের ছাদ নাই, মুখে উৎসাহ নাই, উহারাই নিম্নশ্রেণী । ব্রাহ্মণাদি অভিজাত জাতির যুগযুগান্তরের পেয়ণের ফলস্বরূপ আজি ইহাদের এই দশা—এই শোচনীয় পরিণাম ! প্রাণের বল নাই, মনের সাহস নাই, জীবনোন্নতির আকাঙ্ক্ষা নাই ; স্বাধীনতার স্পৃহা নাই । নাই, কিছুই নাই । তবে আছে কি ? আছে কতকগুলি ছাই আর ভস্ম, কতকগুলি শ্মশানক্ষেত্র । এই জঘন্য বুদ্ধি বা ভাষ্যকার ইহাদিগকে চলমান শ্মশান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ঘুরার চরম বিশেষণ—চলমান শ্মশান ! ইহাদিগকে দেখিয়া মনে হয় বুদ্ধি বা বিশেষণ প্রয়োগ স্বার্থকই হইয়াছে । চলমান শ্মশানই বটে । ইহাদের বিদ্যা নাই বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই অভিজ্ঞতা নাই, উৎসাহ নাই উদ্যম নাই, ঘৃণা নাই লজ্জা নাই, আছে কতকগুলি ছাঈ আর ভস্ম । শ্মশানক্ষেত্র নিশ্চল আর এগুলি চলমান এইটুকু পার্থক্য ! প্রকৃত যোগী সাধক ভিন্ন যেমন অধিকাংশ লোকই শ্মশানকে অপবিত্র বলিয়া মনে করে, শ্মশান স্পর্শে জ্ঞান করে, শ্মশানক্ষেত্রকে নিতান্ত হেয় জঘন্য মনে করে—এই চলমান শ্মশানগুলিকেও সাধারণ লোকে এইরূপ দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকেন ।

ভারতীয় হিন্দু সমাজের অজ্ঞাত পরন্তু অবজ্ঞাত মেরুদণ্ড, ভারতীয় জাতীয় জীবনের অজানিত শক্তি, জীবন-তরুর লুকায়িত মূলদেশ, হিন্দুর জাতীয় জীবন অট্টালিকার দৃঢ় নির্মিত ভিত্তি—নিয়ন্ত্রণীর কি ছুরবস্থা, কি অধঃপতন ! লক্ষ লক্ষ বৎসরের অত্যাচার অবিচার, লক্ষ লক্ষ বৎসরের পদাঘাত কষাঘাত, লক্ষ লক্ষ বৎসরের ঘৃণা অবমাননা, লক্ষ লক্ষ বৎসরের দৌরাত্ম উৎপীড়নে উহাদের দেহ মনঃপ্রাণ ক্ষত বিক্ষত, জর্জরিত । ইহাদের প্রতি যথেষ্ট ব্যবহার চালাইতে কোন ক্ষত্রিয় রাজা, কোন ঋষি নামধেয় ব্রাহ্মণ কবি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই । যুগ-যুগান্তরের অত্যাচারে ইহারা এক্ষণে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে । ভারতে অনেক সভা সমিতি আছে কিন্তু ইহাদের প্রতি উহার কয়টির সহানুভূতি ? ঘৃণায় ঘৃণায় উহাদের মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে । আর অত্যাচার ? অমন প্রজাবৎসল রামচন্দ্রকেও শূদ্র তপস্বীর শিরচ্ছেদ করিতে হইয়াছে । যেখানে যত ঘৃণা যত তাচ্ছিল্য সেখানে তত পশুত্ব তত দাসত্ব । ঘৃণায় মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের লোপ, দাসত্বের পূর্ণ বিকাশ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিতেন :—“যে নিজকে অধম ও বদ্ধ বদ্ধ মনে করে সে বদ্ধই হ’য়ে যায়, আর যে মুক্ত মুক্ত করে সে মুক্তই হ’য়ে যায় ।”

“He who thinks himself weak shall become weak”

‘তোরা নীচ হীন, তোরা মহা অপবিত্র ঘৃণিত, তোদের ছুঁলে আমাদের স্নান করতে হয়’—হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া এই কথা শুনিতে শুনিতে তাহাদের সত্য সত্যই ঐক্লপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে তাহার হীন নীচ । তাহারা মানুষ—তাহারা যে ভগবানের সন্তান, জগজ্জননী ভগবতীর স্নেহের তনয়, ঋষির বংশধর—একথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে । তাহারা জানে কাঠ কাটা, জল তোলা, গরু রাখা, ক্ষেত্রে কাজ করা, গোলাগী

করা, দাসত্ব করাই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য । এ ছাড়া তাহাদের আর কিছুই করিবার নাই । তাহারা যে অতি ছোট অতি যুগীত অতি হেয় অবজ্ঞাত মহাপাপী এ বিশ্বাস তাহাদের অস্থি মজায়—রক্তের প্রাতি কণায় মিশিয়া গিয়াছে । তাহারা জানে যে মহাপাপে তাহাদের নীচ কুলে জন্ম ; উচ্চ শ্রেণীর গালিগালাজ ছুর্কাক্য কুকথায়, উচ্চ শ্রেণীর অনবরত পদাঘাত ও অত্যাচারে তাহাদের পাপ দূরীভূত হইয়া থাকে । একদিন একটি চর্ম্মকারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ‘দেখু—তোমরা কত কাজ কর্ম্ম করিতে পার, দোকানদারী যুটেগিরি মাটি তোলার কাজ, মৎস্যের ব্যবসা ইত্যাদি কিন্তু তাহা না করিয়া তোমরা বিনা আহ্বানে ব্যাপারাদির বাড়ীতে সপরিবারে কেন যাও ? সারাদিন গালাগালিই বা কেন খাও ; শেষে সন্ধ্যা বেলা চিড়ামুড়ি লইয়া কোথাও বা ভগ্নমনোরথে গৃহেই বা ফিরিয়া যাও কেন ?’ এই কথার উত্তরে সে যাহা বলিয়াছিল তাহা কি মর্ম্মস্পর্শী—কি নিদারুণ !!

সে বলিল—“ঠাকুর মশায় ! আমরা কি চারিটা খাইবার প্রত্যাশায় যাই ? আমরা যাই আমাদের মহাপাপ ক্ষালনের জন্ত—মুচি জন্ম হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত । আমরা চারিটা খাইবার আশায় যাই না । এই দেখুন, মহামহা পাপের ফলস্বরূপ আমরা অতি নীচ মুচি কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, পাপের প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড ভোগ ! আমরা উচ্চ শ্রেণীর বাটীতে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দণ্ড ভোগের জন্তই স্বেচ্ছায় আগ্রহ করিয়া যাইয়া থাকি । আমাদের উপর যতই গলাগালি, অত্যাচার, মারপিট্ হইবে, আমাদের পাপ—মহাপাপ ততই দূর হইবে । দণ্ড গ্রহণ করিয়া মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত আমরা উচ্চ শ্রেণীর বাটীতে খাইতে যাইয়া থাকি ?” তাহা কি মর্ম্মভেদী বাণী, কি ভয়ানক বিশ্বাস ? এই সর্ব্বোন্নতি ধ্বংসী সংস্কারের ফলেই নিম্ন শ্রেণীর এই শোচনীয় পরিণাম । এক সমাজের বিশ্বাসের

কথা বলিলাম, এইকপ ভাবে প্রায় সমুদয় নিম্ন শ্রেণীর নিকট হইতে ঐ একই জবাবই পাইয়াছি ।

তাহারা যে মানুষ্য—একথা তাহারা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে । কথকের মুখে, যাত্রাগানে, গুরু পুরোহিতের বাচনিক, ব্যবস্থাপক পণ্ডিতমণ্ডলীর বক্তৃতায়, তীর্থক্ষেত্রে টোলে বিবাহবাসরে শ্রাদ্ধস্থলে সর্বত্র তাহারা হীন ছোট অপবিত্র এই কথা শুনিয়া শুনিয়া তাহাদের ঐ বিশ্বাসই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে ।

শিক্ষা দীক্ষায় তাহারা চির বঞ্চিত, পিতৃপিতামহ গত বংশানুক্রমিক গুণাবলীও তাহারা কিছু পায় নাই । যাহা শোনা—অম্নি শেখা, অম্নি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যাওয়া । কি ঘৃণা ! নিম্ন শ্রেণীদিগকে উচ্চ শ্রেণীর কি ভয়ানক ঘৃণা করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে পশু পক্ষী অপেক্ষাও অধিক ঘৃণা করা হইয়া থাকে । ঘরে বিড়াল গেলে, ছুৎ মৎস্ত মাংস প্রভৃতিতে মুখ দিলে, কিয়দংশ আহার করিয়া ফেলিলেও উহা নষ্ট হয় না ; আর একজন সাহা বা সুবর্ণ বণিক ঘরে গেলেই কিংবা বাহির হইতে একথানা হস্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দিলেই খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হইয়া যায় ? শুধু কি তাই, বিড়াল হয় ত বাহিরে কোন নীচ (?) শূদ্রভৃত্যের ভুক্তাহার ও উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া আসিল—পরক্ষণেই গৃহে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণের পাত চাটিতে লাগিল, অসাবধানে রক্ষিত ছুৎকের বাটীতে চুমুক দিল বা থোকার পাত্র হইতে থাবা দিয়া মাছখানি লইয়া গেল, ইহাতে কাহারও আহার নষ্ট হইল না, খাদ্য নষ্ট হইল না ।

শুধু কি বাঁচিয়া থাকিতেই অশুচি—“মরিলে কি সকল দোষ ঘুচিয়া যাইবে ? নিশ্চিত নহে । গরু বাছুর মরিলে ব্রাহ্মণ কায়স্থ কাঁধে করিয়া ভাগাড়ে ফেলিয়া আসিবে, কারণ তাহারা জানেন, স্নান করিলেই শুচি হইবেন, কিন্তু বাগ্‌দীর মৃতদেহ কেহ স্পর্শ করিবেন না । ব্রাহ্মণ কায়স্থ

বাগদৌর শব্দেই সৎকাব্যার্থ বহন করিয়াছেন কেহ শ্রবণ করিয়াছেন কি ?” (১)

কুকুর বিড়াল স্পর্শ করিয়া কয়জন লোক, কয়জন নির্ভাবান্ ব্রাহ্মণ জ্ঞান করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি, শূদ্র, সাহা স্পর্শ করিয়া স্বচক্ষে পুরোহিত ব্রাহ্মণকে জ্ঞান করিতে দেখিয়াছি। মানুষ কি তবে কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও ছেয় ঘৃণীত ? মানুষ কি কুকুর বিড়াল অপেক্ষাও অধম অস্পর্শীয় ? শূদ্র স্পর্শ করিলে জ্ঞান করিয়া শুচি হইতে হয়, কি ভয়ানক কথা ? যাহাদিগকে শ্রীগৌরঙ্গ আদি অবতারগণ বাহুপাশে আলিঙ্গন করিতেন, যাহাদিগকে অবতারপ্রতিম মহাপুরুষগণ বুকের ভিতরে টানিয়া লইতেন, যাহাদিগের উদ্ধারের জন্ত মহাপুরুষগণ সংসার স্ত্রী পরিজন ধন-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্যবুলি স্বন্ধে করিয়াছেন, যাহাদের ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন :—

“আয়ান্ত মুখ-বুধ-পাতকি-পুণ্যবন্তঃ

চণ্ডাল-বিপ্র-ধনহীন-সমৃদ্ধিমন্তঃ ।

নানাদরো ন চ ভয়ং নহি তত্র লজ্জা

সর্ব্বৈ সমাধিকৃতয়ঃ খলু মাতুরন্ধে ॥

—“আয়রে চণ্ডাল-বিপ্র-পাপি-পুণ্যবান্ !

আয়রে-দরিদ্র-ধন জ্ঞানী-বা অজ্ঞান !

নাহি তথা লজ্জা-ভয়-মান-অপমান,

মার কোলে অধিকার সবারি সমান ।” (২)

(১) কর্ণেল ইউ, এন, মুখার্জী প্রণীত “ধ্বংসোদ্ভূত জাতি” ।

(২) পণ্ডিত ভারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত “সমাজ সংস্কার” ।

যে মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন :—

“ওহে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত সর্ব পাপিগণ ।

আমার নিকটে এস পাবে পরিত্রাণ ॥”

সেই মহাপুরুষগণের চিব মেহের—চির আদরের জনগণকে আমরা কি ভীষণ ঘৃণাব চক্ষেই না দেখিয়া থাকি ? ইহার উত্তরে বলা হয়, “আমরা কি মহাপুরুষ যে উহাদিগকে আলিঙ্গন করিব ?” চমৎকার উত্তর ! এমন না হইলে কি ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, সমাজপতি হওয়া যায় ? মহাপুরুষ নহেন, পুণ্যবান্ নহেন, তাই বলিয়াই ঘৃণা করিতে হইবে ? মহাপুরুষ নও—পুণ্যবান্ নও, তবে কি পাপী ? পাপী হইলে ত ঘৃণা করিবার কিছুই থাকে না ! তাহারাও যাহা তোমরাও যদি তাহাই হও তবে আর ঘৃণা কেন ? তোমরা বড় ; কেন—কিসে বড় ? তোমাদের যে ক্ষিতি অপ্-তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতে দেহ নির্মিত, নিম্নশ্রেণীদের দেহও কি উহা দ্বারাই নির্মিত নহে ?—তোমাদের যে চক্ষু কণ্ঠ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহাদের তাহাই, তোমাদের যে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ এবং গন্ধ এই পঞ্চ বুদ্ধিস্রী, তাহাদেরও তাহাই, তোমাদের যে হস্ত, পাদ, উপস্থ, জিহ্বা এবং পায়ু এই পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয় তাহাদেরও তাহাই—আর তোমাদের যে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং প্রকৃতি তাহাদেরও তাহাই—তার পর সর্বোপরি—তোমাদের যে আত্মা তাহাদেরও তাহাই । আত্মাতে লিঙ্গ বয়স বা জাতিভেদ নাই । আত্মারূপী শ্রীভগবান্ সর্ব দেহে সর্ব স্থানে বিরাজ করিতেছেন । তবে বল তোমরা বড় কিসে ? শারীরিক বলে ? দেহের বল ত তোমাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর অনেক বেশী । তবে কি মানসিক বল ? তাহা তোমাদের মধ্যেও কাহারও কাহারও অধিক থাকিতে পারে এবং নিম্নশ্রেণী শূদ্রদের মধ্যেও কাহারও কাহারও অধিক আছে । বরিশালের কোন সত্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত

একবার নিম্ন জাতীয়গণের মধ্যে একটি জলন্ত ধর্মভাবের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছিলেন। বিষয়টি এইরূপ, একটি জেলের ছেলে নরহত্যা করে, উহার মাতা তাহা জানিত, গভর্ণমেন্টে পক্ষ হইতে জেলেনীকে (আসামীর মাকে) সাক্ষী নিরূপণ করা হয়। উহার মা হঠাৎ পড়িয়া কাটগড়ায় দাঁড়াইয়া পুল্লের অপরাধের কথা আত্মপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল। ম'র মুখে এই কথা শুনিয়া আসামী পুল্ল কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—“মা! তুমি কি আমাকে ভালবাসিতে না? আমার জীবন কি তোমার অভিপ্রেত নহে?” মাতৃদেবী তখন উত্তর করিলেন, “বাবা—আমি তোকে ভালবাসি, কিন্তু ধর্মকে যে আমি তোমার অপেক্ষাও বেশী ভালবাসি; তোমার জন্ত কেমন করিয়া সেই ধর্মকে নষ্ট করিব?” জানিনা—এরূপ ধর্ম-প্রাণা মহিলা ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির গৃহে কয়টি আছেন? তারপর বিদ্যা, বিদ্যাতেই বা তাহারা কম কিসে—? শিশুকাল হইতে স্নযোগ এবং অর্থ সাহায্য পাইলেই নিম্নশ্রেণীর মধ্যে হইতেও রত্ন জন্মিতে পারে। যদি বল—তাহাদের বিদ্যান-গণের সংখ্যা কত অল্প কত সামান্য? এটিও অতি অর্থোক্তিক কথা, যে স্নবিধা লাভ করিয়া ইহাদের অনেকে বিদ্বান ও উন্নত হইয়াছেন, সেই স্নযোগ ও স্নবিধা যদি অধিকাংশ সন্তানগণ লাভ করিতে পারিত, তবে আরও অনেকে তাহাদের মত উন্নত হইতে পারিত। জ্ঞানহীন মুর্থ পরহু ধনাঢ্য অভিভাবকগণের অজ্ঞতায় এবং দারিদ্র্যের জন্ত নিম্ন শ্রেণীর বালকগণ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইতেছে। তাহাদিগকে শিক্ষা দিলেই তাহারা শিক্ষিত হইতে পারে। বরং অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে নিম্ন শ্রেণীর সন্তান ব্রাহ্মণাদি উচ্চ শ্রেণীর সন্তানকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। বিগত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই, বহু নিম্ন শ্রেণী ছাত্র প্রতিযোগীতায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য সন্তানগণকে পরাজিত করিয়াছে ও

করিতেছে। পিতৃ পিতামহ-অর্জিত বংশানুক্রমিক বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয়ের ফল কোথায় দেখিতেছি ও কোথায় পাইতেছি? সংস্কৃত ভাষা ত ব্রাহ্মণ-গণের তথা কথিত এ-চেটিয়া বিদ্যা? বহু দিন হইল দেখিয়া আসিতেছি সংস্কৃত এম, এ, পরীক্ষায় শূদ্র নন্দন প্রথম স্থান অধিকার করিতেছে। শূদ্র ত দূরের কথা মুসলমান সন্তান পর্য্যন্ত প্রতিযোগী পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেছে। কৈ তোমার বংশানুক্রমিক বিদ্যার ফল? তবে বল—তোমরা কিসে বড়? তবে কি পৈতাম্বে তোমরা বড়? যদি বল হাঁ তাই বটে, তবে তত্বতরে বলা যায়—তাহাতেও তাহারা পশ্চাৎপদ নহে। ইতিমধ্যে অনেকে পৈতা লইয়াছেন ও অনেকে লইবার জন্ত যোগাড়াই করিয়াও তুলিয়াছেন।

অত্যাচারের ফল ত হাতে হাতেই পাইতেছি। নিয়ন্ত্রণের উপর দিয়া যে অত্যাচার গিয়াছে, ইউরোপের দাসত্ব প্রথা ভিন্ন, প্রাচীন ভারতে শূদ্র নিপীড়নের জায় একরূপ অমানুষিক অত্যাচার কস্মিন্‌কালে কোনও দেশে ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। বর্তমান কালেই কি সমুদয় অত্যাচার লোপ পাইয়াছে? পতিতা বেষ্টাকে আমাদের উচ্চ শ্রেণীর নরসুন্দরগণ ফৌরী করে কিন্তু মালী নমঃশূদ্র পাটনীর কণ্ঠকে নাপিত ফৌরি করিবে না পরন্তু সে যদি ধর্মভ্রষ্টা চরিত্রহীনা হইয়া বার-বিলাসিনী হয়, তখন তাহাকে ফৌরী করিতে আর আপত্তি নাই? কি ভয়ানক কথা! রামচন্দ্র মালীকে ফৌরী করিতে দিলাম না কিন্তু সে যদি কল্যা হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ করিয়া মালা ছিড়িয়া কল্যা পড়িয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ এবং মহম্মদ রোমজান খাঁ নাম ধারণ করে তবে আর তাহার নরসুন্দরের অভাব থাকিবে না। উচ্চ শ্রেণীর নরসুন্দর নন্দন তখন তাহাকে সেলাম দিয়া ফৌরী করিতে প্রবৃত্ত হইবে। মেয়েদের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা, আজ মুক্তা মালিনী বা সরলা নমঃশূদ্রাণী নাপিত পাইল না কিন্তু কাল যদি জনৈক মুসলমান

যুবকের সহিত নিকাহ বসে এবং বিবি খাতেমল্লিসা বা গহরজান বিবি নাম পরিগ্রহ করে, তবে আর নরসুন্দর মহাশয় ক্ষৌরী করিতে বিন্দুগাত্র আপত্তি করিবে না। এই ত হিন্দু-সমাজের অবস্থা। যত দিন সে হিন্দু ছিল, হিন্দুর দেবদেবী আরাধনা করিত, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের চরণ ধূলি লইত, যথাসাধ্য হিন্দু-আচার ব্যবহার প্রতিপালন করিয়া চলিত, ভগবানের নাম কীর্ত্তন, গঙ্গা স্নান, তীর্থ দর্শনাদি করিত—তত দিন সে নাপিত পায় নাই, কিন্তু যেই সে মুসলমান হইল বা কুলে কালী দিয়া বারবনিতালয়ে ঘর তুলিল অমনি নাপিত ক্ষৌরী করিবার জন্ত হাজির। এইরূপ অত্যাচারের ফলেই ভারতে ছয় কোটী মুসলমানের উদ্ভব। তোমার প্রতিবাসী মুসলমান মহম্মদালী খন্দকার ত আর আরব পারশ্ব বা আফগান দেশ হইতে আইসে নাই, তাহার পূর্ব পুরুষ তোমারই ধর্মাবলম্বী তোমারই জাতি ভাই তোমারই হিন্দু আত্মীয় ছিল, সামাজিক কঠোর অত্যাচারে ধর্মাস্তর পরিগ্রহ করিয়া সে আজ তোমার পর তোমার শত্রু (?) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঠান মোগল প্রভৃতি বৈদেশিক আক্রমণকারিগণের সহিত কয় সহস্র স্বজাতীয় মুসলমান সৈন্য আসিয়াছিল? কয় সহস্র? আর আজ তাহাদের সংখ্যা কত? সমাজপতিগণ! একবার এদিকে একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? অত্যাচারে জর্জরীত হইয়া—অসহ্য বোধ করিয়া নিয়ন্ত্রণের হিন্দু ভ্রাতৃগণ দলে দলে মুসলমান হইয়া গিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের একই পথে ব্রাহ্মণ ও পার্শ্বার চলিবার উপায় নাই। ময়মনসিংহ জেলাস্থ কোন ব্রাহ্মণ জমিদারের বাটীতে একবার একজন কায়স্থ ভদ্রলোক আহ্বার করিতে চাকরের অসাবধানতায় প্রদত্ত নিষ্ঠাবান্ উক্ত জমিদারের কাংসনির্মিত গ্যাসে জল পান করেন। ব্রাহ্মণের কাঁসার গেলাসে শুদ্ধ এঁটো হাতে জল পান করিয়াছে, সুতরাং সে গ্লাস কি আর পুনরায় ব্যবহার চলে? তিনি বাটীর চাকর চাকুরীগীদের না দিয়া

অল্প একটা লোক ডাকিয়া ঐ গ্লাস দান করিয়া দিলেন । বাটীতে থাকিলে যদি ভ্রম ক্রমে তিনি কখন উহার জল পান করিয়া ফেলেন এই আশঙ্কা । এই ঘটনায় তাঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু জিজ্ঞাসা করেন— “আচ্ছা, কায়স্থ, শূদ্র উহাতে জল পান করিয়াছেন জন্ত উহা দূষিত, নষ্ট ও অব্যবহার্য্য হইল । বাসনপত্র খালা ঘটি বাটী প্রভৃতি বাগদী চাকরাণীরা মাজিয়া যখন বাহিরে রাখিয়া দেয় এবং কুকুরাদি যখন উহা জিহ্বা দ্বারা চাটিয়া থাকে তখন তাহা জল দিয়া ধুইয়া লইয়া কিরূপে ব্যবহার চলে ? কায়স্থের জলপানের পর ত উহা বালী ছাই ইত্যাদি দ্বারা মার্জিত হইয়াছিল— তাহা যখন অব্যবহার্য্য হইল তখন কুকুরচাটিত হইবার পর জল দ্বারা ধুইয়া ঐ বাসনপত্র কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে ? তবে কি কায়স্থাদি শূদ্রজাতি কুকুর অপেক্ষাও হেয়, ঘৃণীত ও অস্পৃশ্য ?”

এইরূপ ভাবে শূদ্র সাধারণের ঘৃণা করিয়া করিয়া হিন্দুজাতি জগতের মৰ্কজাতির ঘৃণাই হইয়া পড়িয়াছে । স্বামী বিবেকানন্দ এক স্থানে লিখিয়াছেন “যে দিন হইতে হিন্দুজাতি স্নেহ যখন প্রভৃতি ঘৃণাসূচক শব্দাবলী প্রয়োগ করিতে আরম্ভ ও নাসিকা কুঞ্চিত করিতে লাগিল সেই দিন হইতেই হিন্দু-জাতির মরণ-ভেরী বাজিয়া উঠিল ।” পূর্বেও বলিয়াছি ঘৃণায় মনুষ্যত্বের অপলাপ ধর্ম্মের অপলাপ, ঘৃণায় উন্নতির অপলাপ দেবত্বের অপলাপ । এইরূপ ভাবে নিজেদিগকে ঘৃণা করিতে করিতে হিন্দুসমাজ-পতিগণ হিন্দু-সমাজকে ধ্বংসের মুখে আনিয়া উপনীত করিয়াছেন । নিম্নশ্রেণীর কোন প্রকার বিদ্যা নাই, বোধ-শক্তি নাই, জড়পিণ্ডবৎ পড়িয়াছিল, সমাজপতিগণ যেরূপ ভাবে উঠাইয়াছে নামাইয়াছে তাহারাও সেইরূপ ভাবে উঠিয়াছে নামিয়াছে । নিজেদের স্বাতন্ত্র্য কিছুমাত্র ছিল না । যেরূপ চালাইয়াছেন সেইরূপ ভাবে চলিয়াছে । পরন্তু সংখ্যায় ইহারা কোন কালেই অল্প ছিল না— আজিও নহে ।

“প্রত্যেক এক শত বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে ছয় জন ব্রাহ্মণ আছে। মোটামুটি হিসাবে ইহাদিগের সংখ্যা একাদশ লক্ষ হইবে। প্রত্যেক শতে পাঁচ জন কায়স্থ পাওয়া যায়। প্রত্যেক দুই শতে একজন ক্ষত্রিয় দেখা যায়। ইহাদিগের পূর্ব পুরুষেরা বহু বৎসর পূর্বে বঙ্গে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। কাজেই কাশ্যকুন্ডের ব্রাহ্মণদিগের স্থায় ইহারাও এক্ষণে বাঙ্গালী হইয়াছেন। বৈদ্যের সংখ্যা রাজপুতদিগের অপেক্ষাও অল্প। সমগ্র বঙ্গে হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ১২'৮ উচ্চ জাতি আছে।

“ইহাদিগের পর নবশাক ও অন্যান্য সংশুদ্ধ আছে। ইহাদিগের জন্ম উচ্চ শ্রেণীর আচরণীয়। ইহাদিগের মধ্যে বারুই, গন্ধবণিক, কৰ্মকার, কুস্তকার, মালাকার, মোদক, নাপিত, সৎগোপ, তানুলী, তন্তুবার, তিলি প্রভৃতি জাতি আছে। ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় ৩১ লক্ষ হইবে, বঙ্গের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে ইহারা শতকরা ১৬'৪ হইবে। ইহাদিগের মধ্যে সৎগোপের সংখ্যাই অধিক এবং মালাকারের সংখ্যা কম। সৎগোপ ছয় লক্ষ হইবে, মালাকার মোটে ৩৬ হাজার। নবশাকদিগকে সংশুদ্ধ বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহাদিগের পৌরহিত্য কার্য্য করিবার জন্য ব্রাহ্মণ আছে। তবে ইহাদিগের ব্রাহ্মণ সমাজে অপদস্থ এবং ইহাদিগের সহিত অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তেমন ভাবে আদান প্রদান বা আহাৰাদি করেন না। ইহাদের স্পৃষ্টজল অনাচরণীয় নহে।

“তাহার পরের দল সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ১৩'৪ হইবে। মাহিষ্যের সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ হইবে। ইহাদের মধ্যে কতক আচরণীয় ও কতক অনাচরণীয়। ব্রাহ্মণও পৃথক্। গোয়ালদিগের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ হইবে। ইহাদিগেরও ব্রাহ্মণ আছে এবং তাহাদিগকেও মিরাজ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া গণনা করা হইয়া থাকে। গোয়ালার স্পৃষ্টজল

ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা ব্যবহার করিয়া থাকে । এই শ্রেণীর পর বৈষ্ণব, যোগী, সরাক, সুরবর্ণবণিক, সাহা, সূত্রধর প্রভৃতি শ্রেণী । ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষ হইবে এবং বঙ্গের সমগ্র অধিবাসীর সংখ্যার মধ্যে ইহারা শতকরা ৮'৮ হইবে । ইহাদিগের মধ্যে সামাজিক অবস্থার বিশেষ ভারতম্য আছে । ধনবান্ সাহা বা সুরবর্ণ বণিক ধনাধিক্য হেতু উচ্চশ্রেণীর স্থায় আদর ও সম্মান পাইয়া থাকে । বৈষ্ণব ও যোগী হিন্দু সমাজের সহিত যেন দূর সম্পর্কিত । ইহাদিগের ব্রাহ্মণ নাই । অন্য জাতির ব্রাহ্মণ আছে এবং তাঁহাবা বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত । ইহাদিগের সকলেরই স্পৃষ্ট জলই কিন্তু অব্যবহার্য্য ।

“ইহাদিগের পর পরবর্ত্তী শ্রেণীর হিন্দু আছে । ইহারা চাঁষাতী, ধোবা, কালু, কপালী, নমঃশূদ্র, রাজবংশী । তৎপর পলিয়া, পাটনী, পোদ, গুল্লী, টিপ্‌বা, তেওর, বাগ্দী প্রভৃতি জাতি । ইহাদিগের সংখ্যা ৭৬ লক্ষ এবং বঙ্গের সমগ্র হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৩৯'৭ জন ইহারা হইবে ।

“হিন্দুদিগের মধ্যে রাজবংশীর সংখ্যা খুব অধিক । ইহাদিগের সংখ্যা ২০ লক্ষের অধিক হইবে,—তাহা হইলেই শতকরা ১১ জন হিন্দু এই জাতিভুক্ত । ইহাদিগের পরই নমঃশূদ্র । ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ হইবে । বাগ্দীরও সংখ্যা নিতান্ত সামান্য নহে—১১ লক্ষ হইবে । উত্তর বঙ্গে রাজবংশী জাতি অধিক দেখিতে পাওয়া যায় । পূর্ববঙ্গে নমঃশূদ্রদিগের সংখ্যাধিক্য পরিদৃষ্ট হয় । বাগ্দীজাতি সর্বত্রই সমান আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় । ইহারা সর্ববাদী সম্মত নীচজাতি । ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ জাতি, নবশাক, সূত্রধর পর্য্যন্ত ইহাদিগকে হেয় জ্ঞান করে । ইহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও ব্রাহ্মণ আছে বটে, কিন্তু এই সকল ব্রাহ্মণকে লোকে পতিত বলিয়া গণ্য করে । এই সকল জাতির জল অস্পৃশ্য ।

“ইহাদিগের অপেক্ষাও নিম্নশ্রেণীর লোক আছে। বাউরি, চামার, ডোম, হাড়ি, ভুঁইয়ালী, কেওরা, কোরা, মুচি প্রভৃতি। ইহাদিগের সংখ্যা ১৭ লক্ষ হইবে এবং বঙ্গের সমগ্র হিন্দু অধিবাসী সংখ্যার মধ্যে ইহারা শতকরা ৮।৯ সংখ্যা হইবে। মুচির সংখ্যা ৪ লক্ষের অধিক, হাড়ির ২।৭ লক্ষ, ডোম প্রায় দুই লক্ষ এবং চামার প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার হইবে। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ব্রাহ্মণ আছে। * * * ইহারা যে জন স্পর্শ করে, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর তাহা অব্যবহার্য্য। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা যে ঘরে বসে, ইহাদিগকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতেও দেওয়া হয় না।

“এক্ষণে উপরোক্ত তালিকাগুলি একত্রিত করা যাউক। যুক্ত বঙ্গে ১ কোটি ৯১ লক্ষ হিন্দু আছে। প্রত্যেক শতে ১৩ জন করিয়া ব্রাহ্মণ ও উচ্চ জাতি, কিঞ্চিদধিক ১৬ জন করিয়া নবশাক ও সংশূদ্র, ১৩ জন করিয়া তদধম জাতি, ১০ জন করিয়া এমন জাতি—যাহাদিগের জন আচরণীয় নহে—বাকী ৪৮ জন করিয়া একরূপ নীচ জাতি যে, তাহাদিগের পূজাদি করিবার জন্ত ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না।” (১)

নবশাক ও মাহিয়া জাতির ধর্ম্মাদি কার্য্য যে সকল ব্রাহ্মণ সম্পন্ন করাইয়া থাকে, তাহারা হীন ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য। এই নবশাক ও কৈবর্ত জাতি বঙ্গের সমগ্র হিন্দু অধিবাসীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হইবে। বাকী হিন্দুর যজন যাজন করিতে অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণই সম্মত হইয়া থাকে। যাহারা স্বীকৃত হয়, তাহারা বর্ণের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত। শতকরা যে ১৩ জন উচ্চ জাতির কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা শতকরা ৩০টী ভিন্ন জাতির সহিত একত্রে উপবেশন অপমানজনক

বলিয়া বিবেচনা করেন, বাকী জাতির সহিত সংস্পর্শও ইহাদিগের নিকট দোষাবহ হইয়া থাকে। শেষোক্ত জাতি যে জল স্পর্শ করে, অন্ত্যাত্ম জাতি তাহা গ্রহণ করা—ধর্ম বিগর্হিত কার্য বলিয়া মনে করে।

অনেকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, যে জাতিগত পার্থক্য কেন ঘটিয়া থাকে? কেন একজাতি উচ্চ এবং অন্য জাতি নীচ বলিয়া বিবেচিত হয়? অনেকের বিশ্বাস শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে ঐক্য হয়, কিন্তু এই বিধি ব্যবস্থার বিস্তারিত বিবরণ অনেকেই অবগত নহে। শাস্ত্রবিধি কি, তাহা জানিতে পারিলে অনেকের কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে। গড়লিকা প্রবাহের স্থায় পূর্বাপর ইহা চলিয়া আসিতেছে, অনেকে ইহাই 'মাত্র জানে। সাধারণতঃ বিশ্বাস বৃত্তি অনুসারে জাতি গঠিত হইয়াছে। অধিক সংখ্যক হাড়ি ও কেওরা শূকর পালকের কার্য, ডোমেরা শবদেহ বহনাদি, চর্মকার ও মুচি চামড়ার কাজ এবং রজকেরা বস্ত্রাদি ধোত করে। কিন্তু নমঃশূদ্র, পোদ বা রাজবংশীরা কেন নিম্নজাতি বলিয়া পরিগণিত হইল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।”

এক্ষণে ইহাদের জীবিকা নির্বাহক বৃত্তি আদির উল্লিখিত হইতেছে। “যুক্ত বঙ্গে একশত ব্রাহ্মণের মধ্যে ৪৮ জন কৃষিকার্য্য, ৩৪ জন বিদ্যাচর্চা অথবা শিল্প বাণিজ্য এবং ১৮ জন অন্ত্যাত্ম কার্য্য করিয়া থাকেন বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরা কখনই স্বহস্তে ভূমি কর্ষণ করেন না। এ সম্বন্ধে ভারতের অন্ত্যাত্ম স্থানের ব্রাহ্মণদিগের সহিত তাঁহাদের পার্থক্য আছে। তথাপি অনেকের নিকট ইহা বিশেষ অভিনব সংবাদ বলিয়া পরিগণিত হইবে যে, সমগ্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রায় অর্দ্ধেকাংশ কৃষিজীবী। অতি নীচ জাতি বাগদীদিগের কথাই ধরুন না কেন। পশ্চিম বঙ্গে ইহাদিগের সংখ্যাধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে শতকরা ৫০ জন

কৃষিকার্য্য, ২০ জন খাদ্যাদি বিক্রয়, ১৮ জন দৈনিক মজুরী এবং ১২ জন অন্ত্রাণ্ত রূপ কার্য্য করে।

“বাউরি আর একটা হীনজাতি। ইহাদিগের মধ্যেও শতকরা ৩৬ জন কৃষিজীবী, ৪৩ জন দৈনিক শ্রমজীবী, ৭ জন গো মেঘাদি পালক এবং বাকী অন্যান্য ব্যবসায়ী। একশত জন চামার ও মুচির মধ্যে ৩৩ জন শিল্পী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর কার্য্য করিয়া থাকে। পূর্ব্ব বঙ্গে ১০০ জন নমঃশূদ্রের মধ্যে শতকরা ৮২ জন চাষের উপর নির্ভর করে, এবং অবশিষ্ট ১৮ জন অন্যান্য কার্য্য করে। ১০০ জন রজকের মধ্যে শতকরা ৬০ জন জাতি ব্যবসায় এবং ৩১ জন কৃষকের কাজ করে। ১০০ জন কর্ম্মকারের মধ্যে ৩০ জন চাষ, ৪৭ জন লৌহাদির কার্য্য এবং ২৩ জন অন্ত্রাণ্ত কার্য্য করে। ১০০ জন কায়স্থের মধ্যে ৬৬ জন চাষ, ৮ জন বিদ্বদ্জনোচিত বা শিল্পাদি কার্য্য করে। শতকরা ৮৫ জন পদারাজ এবং ১২ জন রাজবংশী কৃষিকার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।”

“উপরিদিখিত তালিকা অনুধাবন করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, ব্যবসা বা বৃত্তির সহিত জাতি নির্ণয় বা জাতি বিচারের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই।” (১)

১০০ জন হিন্দু জাতির মধ্যে ৬ জন মাত্র ব্রাহ্মণ আছে ইহারা “দেব” উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন, বাকী ৯৪ জন “দাস” বলিয়া পরিচিত। নিম্ন জাতির লোক ব্রাহ্মণ দেখিলে দণ্ডবৎ করিয়া থাকে। এই দণ্ডবৎ অর্থে কাষ্ঠশূচের ভাষা; জীবিত জীবের ন্যায় ত নহেই—মানুষ ত দূরের কথা;—ভূমিতে আপতিত হওয়া।

* * * * “ইতর বা অন্যান্য জাতির সংস্পর্শে থাকিতে

(১) কর্ণেল ক্রিষ্ট উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত “ধর্ম্মসামুদ্র জাতি।”

হয় বলিয়া ব্রাহ্মণেরা সকল স্থানে সকলের সঙ্গে সমবেত হইতে পারে না। * * * * * পূজা কথকতা প্রভৃতি জাতীয় উৎসবে সকল জাতি উপস্থিত হইলেও জাতি-বিচারের পূর্ণ পরিচয় এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন হাড়ি, অথবা ডোগ, ইহারাও হিন্দু—পূজার দালানে উঠিলে কুকুরাদির স্থায় বিতাড়িত হইয়া থাকে। পূজাদি ব্যাপারে জাতি বিচার পূর্ণ মাত্রায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অজ্ঞতাশ্রযুক্ত ইতর জাতির আত্মসন্মান জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। যে সামান্য শিক্ষালোক তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে উচ্চজাতির নিকট ঐরূপ দুর্ব্যবহার পাইলেও তাহারা এখনও ক্ষুণ্ণ হয় না ;” * * *

“সমগ্র সাঁওতাল পরগণা এবং ছোট নাগপুর বিভাগ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুন্দর ক্ষেত্র বলিয়া মিশনারীদিগের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এবং ঐ সকল লোককে যে ভাবে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা হইতেছে তাহাতে অতি সঙ্গরহী সমগ্র সাঁওতাল পরগণা ও ছোট নাগপুর বিভাগ—যাহা আয়তনে আসামের অপেক্ষা বৃহত্তর এবং যুক্ত বঙ্গের প্রায় তুল্য হইবে— খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত জাতির দ্বারা অধ্যুষিত হইবে। পূর্ববঙ্গে গাড়া ও নাগারাও খ্রীষ্টধর্মাক্রান্ত হইতেছে।”

“ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগের প্রতি কিরূপ ভাবাবলম্বন করেন? কেহ ইহাদিগকে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিতে আহ্বানও করেন না, কেহ প্রতি-বন্ধকতাও প্রদান করেন না। উহারা হিন্দু বলুক আর নাই বলুক, তাহাতে ব্রাহ্মণদিগের কোনরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। এই অসভ্য জাতিরা হিন্দু হউক আর নাই হউক, ব্রাহ্মণদিগের নিকট সমভাবে অস্পৃশ্য। ইহাদিগের পৌরহিত্য কার্য্য করিতে ব্রাহ্মণেরা সম্মত হইবে না। যদি কোন ব্রাহ্মণ উহাদিগের পুরোহিত হয়, তাহা হইলে সে অমনি “পতিত” বলিয়া গণ্য হইবে এবং এমন কি উহাদিগের অপেক্ষাও তাহাকে অধিকতর

ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। সেই ব্রাহ্মণের ছোঁয়া জল কেহ গ্রহণ করিবে না।” * * * * ।

“শুদ্ধ যে ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগের সংস্পর্শে আইসে না তাহা নহে, কায়স্থ বৈদ্য এমন কি নবশাক পর্য্যন্ত ইহাদিগকে (হাড়ি ডোমকে) স্পর্শ করে না ; ইহাদিগের সহবাসেও দোষ ঘটিয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায়, ব্রাহ্মণেরা যে পথ প্রদর্শন করেন, অগ্ৰ্য্য জাতি তাহা অবলম্বন করিয়া থাকে।”

* * * “ব্রাহ্মণদিগের সহিত ইতর জাতির যেরূপ সম্বন্ধ সাহেবদিগের সহিত দেশীয়দিগের তদ্রূপ সম্বন্ধ। তুলনাটা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ না হইতে পারে। ব্রাহ্মণ ও ইতর জাতি এদেশে যতকাল আছে, সাহেব ও দেশীয় ততকাল নাই, কাজেই কতক বিষয়ে তুলনা না হইতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ইতর জাতিকে যেরূপ অবজ্ঞার চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, যেরূপ অবমাননাকর ব্যবহার, সহবাস পরিহার প্রভৃতি করিয়া থাকে, সাহেবেরাও তদ্রূপ করে। মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক অগণিত লোকের সহিত যুগযুগান্তর একদেশে বাস করিয়া কিরূপে স্বাভাব্য সংরক্ষণ করিয়া আসিতেছে, তাহা ভাবিয়া স্থির করা সুকঠিন।”

“উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ স্বধর্ম্মীর সহিত একত্র যোগদানে একান্ত অনিচ্ছুক। সহস্র বৎসর ধরিয়া আমরা এই সমস্ত সমধর্ম্মীর সহিত সম্মিলিত না হইবার জন্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছি এবং ইহাতে প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াছি। যতক্ষণ না উচ্চনীচ ভাব পরিস্ফুট হয়, যতক্ষণ না আমরা অগ্র বর্ণের সহিত স্বাভাব্য সংরক্ষণে সমর্থ হই, ততক্ষণ আমাদের মনে আনন্দ হয় না। আমরা এক্ষণে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহাতে বার জন হিন্দু বর্ণগত পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া সমভাবে সমক্ষে একযোগে সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে পারে না। অনৈক্য যেন আমাদের

জাতিগণ ধর্ম হইয়াছে—যেন আমাদিগের সামাজিক অবয়বের অস্থি মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছে ।”

“দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইতর জাতি বাগ্দির কথাই ধরুন। বাগ্দির সংখ্যা কায়স্থের অপেক্ষা কম নহে। প্রত্যেক জাতির শারীরিক ও মানসিক অভাবপূরণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু বাগ্দির পারত্রিক মঙ্গলের এবং মানসিক উন্নতি সাধনের প্রতি কাহারও দৃষ্টি আছে কি? সে কালের কোন ব্রাহ্মণকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, নিম্নজাতি বাগ্দির উপকারার্থ তিনি কি করিয়াছেন? তাহা হইলে ব্রাহ্মণ নিশ্চিতই বিস্ময়াবিত হইবেন। “বাগ্দি কি একটা মানুষ”—যে তাহাদের জন্ত কিছু করিবার প্রয়োজন আছে? সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণের মনে ইহাই উদিত হইবে। বাগ্দি যে হিন্দু, স্নেহ বা ঘবন নহে তাহা ব্রাহ্মণ স্বীকার করিবেন, কিন্তু তাহাতে কি হয়? সে যে বাগ্দি—হীনজাতি। বাগ্দির কল্যাণার্থ ব্রাহ্মণের যে কিছু কর্তব্য আছে, তাহা সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ ঠাকুরের মনোগম্যে কখন উদয় হয় নাই, কেননা ব্রাহ্মণের অত্যাচার অনেক কাজ আছে ত?

“বাগ্দির যে ধর্ম বা নীতি জ্ঞান শিক্ষা দিবার গুরু নাই, আমি তাহা বলিতেছি না। বাগ্দিজাতির পারত্রিক মঙ্গল সাধনার্থ কোন না কোন ব্রাহ্মণ নিয়োজিত আছে বটে, কিন্তু এই ব্রাহ্মণকে অত্যাচার ব্রাহ্মণেরা “পতিত” বলিয়া গণ্য করেন। অপরাধ তিনি বাগ্দিদের পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। শুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা কেন, অন্য জাতিও তাহাকে বাগ্দির দ্বারা অস্পৃশ্য বিবেচনা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ বাগ্দির ব্রাহ্মণ বাগ্দিদের দ্বারা অজ্ঞ ও দরিদ্র হইয়া থাকে। তিনি যে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন তাহা উচ্চ নীতি বা ধর্মমূলক নহে। বস্তুতঃ, নিজের অজ্ঞতাবশতঃ তিনি কিছুই শিক্ষা দিতে পারেন না। বাগ্দিরা কিন্তু এই ব্রাহ্মণ পাইয়া “হাতে স্বর্গ” পাইয়াছে বলিয়া মনে করে। যদি ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই

অবিসংবাদিতরূপে ইতর জাতির শিক্ষার ভার গৃহস্থ থাকিত তাহা হইলে ইতর জাতির কোনরূপ ধর্মজ্ঞানই হইত না । পুথের বিষয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, চৈতন্যের শিক্ষা হিন্দুর নিম্ন স্তরে পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করিয়াছিল । ১ কোটি ৯০ লক্ষ বঙ্গবাসী হিন্দুর মধ্যে অন্ততঃ ১ কোটি ৫০ লক্ষ চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে ।”

“বস্তুতঃ বাগ্দির ধর্মগুরু গোস্বামী বা ঠাকুর—মল্লয়াসমাজের হীন আদর্শ স্থল । এই বৈষ্ণব গুরু সকল জাতির লোকই হইতে পারে ; কারণ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে জাতিবিচার নাই । ইহাদিগের শিক্ষা বা সঙ্গতি শিষ্যদিগের অপেক্ষা বিশেষ অধিক নাই । শিষ্যের নিকট হইতে অর্থাৎ লাভের প্রত্যাশায় দরিদ্র বাগ্দির গৃহে গুরুর পদার্পণ হইয়া থাকে । পুরুষাত্মক্রেমে গুরুর ইহাই পেশা । এই ব্যবসা যে ভাল চলে না এবং ইহাতে অর্থলাভও যে হয় না তাহা বলাই বাহুল্য । বাগ্দিশিষ্যের বাটীতে গুরু আহার করেন না, এমন কি একত্রে উপবেশন পর্য্যন্ত করেন না । আর ধর্ম বা নীতি শিক্ষাদানের কথা ? গুরুর নিজেরই তাহার বিশেষ অভাব, সুতরাং শিক্ষা দান করিবেন কি ? ইতর জাতিদিগের মধ্যে যে দয়া দাক্ষিণ্য সম্পন্ন ধার্মিক ও নীতিবান লোক নাই, আমি তাহা বলিতেছি না, তবে উহা গুরুদত্ত শিক্ষার ফল নহে । নিজেদের পরিমার্জিত ধর্ম বুদ্ধি বা জ্ঞানের পরিণাম ।”

“ইতরজাতীর আভ্যন্তরীণ জীবনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে অনেক হিন্দুই তাহা বলিতে পারিবেন না । ভদ্রলোকে এ বিষয়ে কখনই মস্তিষ্ক চালনা করেন না । প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছুপেপাড়া, হাড়িপাড়া, ডোমপাড়া আছে, সম্ভ্রান্ত লোকে এ পল্লীতে প্রায়ই গমন করেন না । কারণ বাগ্দি প্রভৃতি জাতির সমস্তই অম্পৃশ্য, তাহাদিগের দেহ, তৈজসাদি, আহাৰ্য্যাদি, এমন কি ছায়া পর্য্যন্ত অম্পৃশ্য ও সংক্রামক । ইহাদিগের জাতিগত কার্য্য

লইয়া সম্ভ্রান্ত জাতিরা অতি সামান্তরূপ সংস্পর্শে কখন কখন আইসেন,—
তদ্ব্যতীত ইতরদিগের সহিত বিশেষ সংস্রবই রাখা হয় না। উৎসর্বাদিতে
সকলের শেষ ভাগে—যেখানে কাহারও সহিত সংস্রব নাই—ইহারা উপস্থিত
হইতে পারে। বিবাহাদি ক্রিয়া কলাপে কোন নীচ কার্য্য করাইবার প্রয়োজন
হইলে ইহাদিগকে দূরে কদর্য্যস্থানে অপেক্ষা করিতে বলা হয়। ইতরজাতিরাও
পুরুষানুক্রমে তাহাদিগের নির্দিষ্ট স্থানাদি জানে—কাজেই কোনরূপ
গোলযোগ ঘটে না। * * * * ইতর জাতির যদি কোন লোক
পীড়িত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিবাসী স্বজাতিই তাহার পরিচর্যা
রত হইয়া থাকে। কে কবে শুনিয়াছেন, ভদ্রলোকে ইতরজাতির দ্বারে
দ্বারে ঘুরিয়া রোগীর সেবাদি করিয়া থাকেন।” * * * *
* * * * ।

বিদ্যাচর্চার কথা আর কি বলিব—। “বাগ্‌দীদিগের মধ্যে হাজার
করা ১৭ জন পুরুষ লেখা পড়া জানে। যাহাদিগের শিক্ষাদির পরিমাণ
এরূপ, তাহারা কিরূপ লোক হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।
তাহারা যে অধঃপতিত জাতিভুক্ত অধঃপতিত লোক, তাহা সহস্র বৎসর
ধরিয়া তাহারাই বুঝিয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ ইহাদিগের চিত্ত গভীর—
মর্শস্পর্শী। ইহারা আবহমানকাল হইতে দরিদ্র—ভীষণ দরিদ্র। উদর
পূর্ণ আহার কদাচ ঘটিয়া থাকে। ইহারা অলস, অমিতব্যয়ী ও অবিশ্বাসী।
ইহাদিগের জ্রোলোক ও শিশুদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়। ইহাদিগের
মস্তকাচ্ছাদনের স্থান—জীর্ণ শীর্ণ কুটীর—কখন পড়িয়া যায় স্থির নাই।
এরূপ দরিদ্রতা সত্ত্বেও ইহারা অত্যন্ত অলস। যদি ঘরে দিনান্তে আহার
যুটিবার সংস্থান থাকে, তাহা হইলে ঘরের বাহির হইবে না। যদি দৈনিক-
মজুরী পেশা হয় এবং কাজ করিতে যাইবার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে
কেহ কাজ করাইবার জন্ত ডাকিতে আসিলে গৃহাভ্যন্তরে লুকাইয়া থাকে,

পরিবারকে বলে—“সে গৃহে নাই—কর্মদাতাকে যেন এই কথা বলা হয়।” “কাজে লাগিলে” যতদূর ঠকাইতে পারে, নিয়োগকারীকে ততদূর ঠকাইবার চেষ্টা করে। কার্যে নিযুক্ত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে। কেহ দেখিলে তাকুট সেবন বা কথোপকথন করিতে থাকিবে। তাহার পর নিজের ছুঃখের গল্প, কার্যের কাঠিন্যের কথা এবং নানারূপ পীড়ার কথা উত্থাপন করিয়া সময় নষ্ট করিবে।”

ইহারা যেমন অলস, তেমনি অমিতব্যয়ী। যদি দৈনিক তিন আনার পয়সা উপার্জন করে, তাহা হইলে স্ত্রীকে ছয় পয়সা দিবে এবং ছয় পয়সার তাড়ি পান করিবে। মত্তাবস্থায় ঘরে আসিয়া যদি মনোমত আহাৰ্য্য না পায়, তাহা হইলে স্ত্রীর মস্তক চূর্ণ করিতে উদ্যত হইবে। যখন অনশনে বিশেষ ক্লিষ্ট হয় এবং “হাতে কাজ কর্ম” কিছুই থাকে না, তখন তন্দ্রা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। উচ্চ জীবনের কল্পনাও তাহার মনোমধ্যে কখন উদিত হয় না। আত্মসম্মানের কথা? সে কথার অর্থও সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কারণ সে যে জাতিতে বাগ্দী, ইতরজাতি ভুক্ত। যাহা কিছু পাপজনক—নীচ, তাহারই প্রতি শব্দ ইতর জাতি। তাহার স্বজাতির লোক ছাড়া সকলেই তাহাকে পরিত্যাগ করে। স্বজাতির মধ্যে “বেরাদারী” আছে,—অন্য জাতির সহিত বেরাদারী ভাব ও থাকিতেই পারে না। সে যখন বাগ্দী কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তখন হইতেই উচ্চাভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা, আত্মসম্মান, স্বাবলম্বন প্রভৃতির অর্থ তাহার কাছে কিছুই নাই। অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য সে কলিকাতায় যায় না কেন? ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। সে বলিবে কলিকাতা অনেক দূর—রেলগাড়ীর ভাড়া নাই, সেখানে থাকিবার খরচ চাই; জানা শুনা লোক কেহ নাই,—স্বতরাং সেখানে গিয়ে কেমনে কাজ পাইবে? কতক পরিমাণে কথা সত্য, কোন হোটেল প্রভৃতি স্থানে গিয়া সে জাতির পরিচয় দিলে তাহাকে কেহ

খাইতে বা থাকিতে স্থান দিবে না । ভদ্রলোকের বাড়ীর চাকরেরা যদি জানিতে পারে সে বাগ্দী, তাহা হইলে তাহার তাহার সম্পর্কে কোন কার্যই করিবে না । কাজেই যেখানে পূর্বপুরুষ কাটাইয়া গিয়াছেন, সেইখানেই থাকাই শ্রেয়ঃ । সত্য বটে, দিন ক্রমেই অচল হইয়া আসিতেছে, কিন্তু উপায় কি ?

“গরু বাছুর মরিলে ব্রাহ্মণ কারস্থ কাঁধে করিয়া ফেলিয়া আসিবে কিন্তু বাগ্দীর মৃত দেহ কেহ স্পর্শ করিবেন না ।”

এখন দেখুন বাগ্দীর জীবন কিরূপ ? শারীরিক অবস্থায় সে রুগ্ন ; অভাব, অনাহার, পান-দোষ ও অন্ত্রান্ত্র ছুকার্য্য তাহার স্বাস্থ্যকে একেবারে ভঙ্গ করিয়া ফেলে । মানসিক অবস্থায় পশুদির অপেক্ষা সে শ্রেষ্ঠ কিম্বা শতকরা ৯৮ জন নিরক্ষর । নীতিজ্ঞানও তথৈবচ ; ইহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত—বিধ্বস্ত । বহু বৎসরের অবনত অবস্থা ইহাদিগের হৃদয় হইতে সমৃদ্ধি সগুহকে বিনষ্ট করিয়াছে । *

* ২৫ বৎসর পূর্বে পুঞ্জীয় লেপ্টেন্যান্ট কর্ণেল যুথোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গদেশের অবস্রাত জাতিদের শোচনীয় দুর্দশা দেখিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন—ভগবৎ কৃপায়, দেশে শিক্ষা বিস্তার সংবাদ পত্রাদি প্রতিষ্ঠান ফলে—তাহার অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । অবস্রাত জাতিদের উচ্চ শিক্ষিত নেতৃমণ্ডলী স্ব স্ব সমাজে জাতীয় সভা সমিতি প্রতিষ্ঠা, জাতীয় গ্রন্থ প্রচার ও সংবাদপত্র, মাসিক পত্রাদি পরিচালন দ্বারা সমাজে দ্রুত পরিবর্তন আনয়ন করিতেছেন । হাওড়া নিবাসী, ভারতবর্ষ সপ্তাহিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাপ্রাণ ক্রীষক বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয় পশ্চিম বঙ্গের ২০ লক্ষ বাগ্দী বা ব্যগ্রকজিয় জাতিদের পরিচালনা ও নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া অল্প দিনের মধ্যে তৎসমাজে যে পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন :—

“বাগ্দী বা ব্যগ্রকজিয় জাতি,—পশ্চিমবঙ্গে এই জাতির সংখ্যা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয় ; তথায় ইহারা প্রায় বিশ লক্ষাধিক । ইহারা শক্তিসমান, ভেদহীন ও সরল প্রাণ জাতি । কৃষি

যে সকল কথা বাগ্দিগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, তাহা নিম্নশ্রেণীর সকল জাতির পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য । মুচি, কেওড়া, বাউড়ি, তেওর * * * * চণ্ডাল চামার, ডোম, হাড়ি, প্রভৃতি জাতি—যাহাদিগের সংখ্যা সমগ্র হিন্দু সমাজে শতকরা ৫৮ জন হইবে—সমাবস্থাপন্ন । ইহাদিগের পরম্পরের মধ্যে কেবল ধর্ম ব্যতীত আর কিছুই মৌসাদৃশ্য নাই । এমন কোন উৎসব বা সামাজিক ব্যাপার নাই—যে উপলক্ষে ইহারা পরস্পরে মিলিত হইতে পারে । যদি কখন কোন ঘটনায় ইহারা সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে এক জাতি অন্য জাতির সহিত বসে না, ভিন্ন ভিন্ন জাতি পৃথক ভাবে স্থানাধিকার করে । কখন কখন এক জাতির কোন লোকে অন্য জাতির পেশা অবলম্বন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু উভয় জাতির মধ্যে

বৃত্তি ইহাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় । ইহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তি অধুনা বাবসা এবং শিল্প কার্যাদির দ্বারাও জীবিকা অর্জন করিয়া থাকে । অনেকে এজাতিকে পশ্চিম বঙ্গের বেকরুও স্বরূপ বলিয়া থাকেন । ইহারা না থাকিলে তথায় তথাকথিত উচ্চ জাতিদিগের দিন চলা ভারস্বরূপ বোধ হইত এবং দক্ষিণ হস্তের কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত নিজেদিগকে গুরুতর অসুখসাধ্য কর্মে লিপ্ত হইতে হইত । দেশীয় সম্রের আবশ্যক হইলে এখনও এই জাতির মধ্যে হইতে উহা সংগৃহীত হয় । ইহারা ক্ষত্রিয়োচিত দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন করে, কোন কোন স্থলে ক্ষত্রিয়ের স্থায় উপবাস ধারণ করে ও ক্ষত্রিয়ের স্থায় সেনাপতি, সিংহ, মলপতি, পাত্র, মিজ, মহাপাত্র, মালিক প্রভৃতি উপাধি ধারণ করে । এ কারণ অনেকে মনে করেন ইহারা প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির বংশধর ।

গত দুই বৎসর কাল ইহারা সমিতি আদি সংস্থাপন করিয়া পূর্ণ ঐক্য বলে দিন দিন বলীয়ান ও শক্তিমান হইয়া উঠিতেছে । সদাশি পান হইতে একেবারে বিরত হইয়া দিন দিন আচার ও নিষ্ঠাবান হইয়া উঠিতেছে । ইহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে এবং দ্রুত শিক্ষার প্রসার বর্দ্ধিত হইতেছে । বহুল পরিমাণ পাঠশালা, নৈশ বিদ্যালয় এবং হরিসভা আদি স্থাপিত হইয়াছে । ইহাদের অধিকাংশই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী । সন্ধ্যার সময় ইহাদের পক্ষীতে গমন করিলে হরিনাম জপে কর্ণযুগল পরিতৃপ্ত হয় ।”

বিবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। সামাজিক হিসাবে ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব লইয়াও ঈর্ষা ঘেষের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এবংবিধ ঈর্ষাদি প্রদর্শনের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ অন্য কিছু নাই, এই সকল জাতির একত্রে সমাবেশ প্রায়শঃ ঘটে না। তথাপি এই ইতর জাতির মধ্যে এক জাতি অন্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই ভাব বিদ্যমান আছে—বেশ বুঝা যায়।”

“ধোপা, মাহিয়া, (জেলে কৈবর্ত) কপালী, নমঃশূদ্র, রাজবংশী প্রভৃতি শ্রেণীর আপনাদিগের মধ্যেই আবার প্রাধান্য ও হীনতা আছে। কোন কারণবশতঃ কোন লোক জাতি বিগহিত কোন কার্য করিলে—তাহার স্বজাতি তাহাকে অধঃপতিত ভাবে জাতিচ্যুত করিয়া থাকে। অপরাধের গুরুত্ব লঘুত্ব আদৌ বিচার করে না। পূর্ব বঙ্গে সে দিনের হাঙ্গামায় রাজবংশীরা মুসলমানদিগের দ্বারা প্রহৃত হয়। যাহারা নিগৃহীত হইয়াছিল, তাহাদিগকে অন্য রাজবংশীরা জাতিচ্যুত করে। নীচ জাতির সহিত একঘাটে স্নান করিলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের জাতিচ্যুতি ঘটয়া থাকে। বিগত জামালপুরের হাঙ্গামায় যে সকল হিন্দু রমণী মুসলমান কর্তৃক অত্যাচারিত হইয়াছিল, তাহারা জাতিচ্যুত হয়—পিতৃকুল ও পতিকুল হইতে পরিত্যক্তা হয়,—অবশেষে নিরাশ্রয় অবস্থায় খৃষ্টানদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। উচ্চ স্তরের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত। কর্মকার, কুস্তকার, মালাকার, মোদক, পবামণিক, সদগোপ, তন্তুবাগ, তিলি অথবা মাহিয়া অম্পৃশ্য নহে। ব্রাহ্মণ সমাজে ইহাদিগের নির্দিষ্ট কার্য আছে—কাজেই স্থানও আছে, ইহাদিগের ব্যতীত সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না, কাজেই ইহাদিগকে পরিবর্জন অসম্ভব। তথাপি ইহারা ‘দাস’ অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের ভূত্য আখ্যাত্ত। অম্পৃশ্য জাতি অপেক্ষা ইহারা অধিকতর সুবিধা বা ক্ষমতা পাইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে বটে, কিন্তু যথাযোগ্য স্থানে থাকিতে

বাধা। ব্রাহ্মণদিগের সহিত একত্রে আহার বিহারের কথা ত দূরে—উপবেশন পর্য্যন্ত করিতে পারে না। ভিন্ন শ্রেণীর নবশাকেরা কদাচ একত্রিত হয়। ইহাদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পেশা আছে। অল্পশ্রু জাতির প্রাতি ঘৃণা ইহাদের মধ্যে সাধারণ ভাবে বিদ্যমান আছে। ইহাদিগের যজ্ঞাদি ব্রাহ্মণ করে বটে, কিন্তু ঐ সকল যাজকও অন্যান্য ব্রাহ্মণের চক্ষে হীন ও অবনত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

“ইহাদিগের প্রত্যেক শ্রেণী স্বতন্ত্র, স্বাধিকৃত। এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর সহিত একত্রে আহারাদি অথবা কার্যাদি করে না। এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর মধ্যে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহার সংবাদ রাখে না, পরস্পরের মধ্যে সাহায্যাদি বা সহযোগিতা তিল মাত্র নাই, প্রত্যেক শ্রেণী অন্য শ্রেণী অপেক্ষা এক্রপ স্বতন্ত্র যে ভিন্ন দেশবাসী হইলেও এতদপেক্ষা অধিকতর স্বাভাব্য বা সংস্রব শূন্যত। পরিলক্ষিত হইত না। স্বজাতির মধ্যেও একতা পরিলক্ষিত হয় না। সকলেই স্ব স্ব স্বার্থ সংরক্ষণার্থ ব্যস্ত, অন্তের ইষ্টানিষ্টের প্রাতি দ্রাক্ষপও করে না। জাতিগত ব্যবসা অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত ইহাদিগের আবশ্যক মত মূলধন নাই—শিক্ষাও নাই। ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণীর বিষয় এ অধ্যায়ে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, নিম্নশ্রেণীর শোচনীয়তা প্রদর্শনের নিমিত্ত তুলনা করিয়া তাঁহাদের কথাও কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে।

“তাহার পর ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চ জাতির কথা। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ২৪ লক্ষ হইবে, সমগ্র বাঙ্গালী হিন্দুর প্রায় এক-অষ্টমাংশ। মনে করুন, দুইজন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ হইল। ইহাদিগের মধ্যে আবার শ্রেণী বিভাগ আছে—যথা রাঢ়ী, বৈদিক, বারেন্দ্র। ‘উভয়েই যদি রাঢ়ী শ্রেণীর লোক হয়েন, তাহা হইলেও গোত্রের কথা উত্থাপিত হইবে। গোত্রও প্রায় বার প্রকার আছে। তাহার পর গোত্রের মিলন হইলেও ‘মেলের’ বিচার

আছে । মেল প্রায় বিংশতি প্রকার আছে । ‘মেল’ এক হইলেও কাহার সন্তান, কি গাঁই, এ সকল প্রস্নও উপস্থাপিত হইতে পারে । ‘স্বভাব’ কি ‘ভঙ্গ’ ইহাও জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে । ভঙ্গ হইলে পুরুষ নির্ণয় করিতে হয় ।

বৈদ্য ও কায়স্থ মধ্যেও ঐরূপ বিভাগ আছে । কলিকাতার সান্নিধ্যে হাড়িদেরও তিন শ্রেণী হইয়াছে । এক শ্রেণী ধাত্রীর কার্য্য করে, এক শ্রেণী শূকর চড়ায় এবং এক শ্রেণী সাহেবদের বাবুর্জির কার্য্য করে । ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যেরূপ রাঢ়ী, বৈদিক ও বাবেজ্র শ্রেণী সকলেই স্ব স্ব শ্রেণীর প্রাধান্য দিয়া থাকেন, হাড়িরাও তদ্রূপ স্ব স্ব শ্রেণীকে প্রধান বলিয়া গণ্য করে ।” “আরও একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় আছে । একশত জন ব্রাহ্মণের মধ্যে ৬৪ জন লিখিতে পড়িতে জানে, একশত জন বৈদ্যের মধ্যে ৬৫ জন লেখা পড়া জানে । কায়স্থদিগের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে বলিয়া উহার অপেক্ষা কম লোকে লিখিতে পড়িতে জানে, এরূপ অনুমান হয় । পূর্বে প্রত্যেক শ্রেণীর ইষ্টানিষ্ট সেই শ্রেণীর লোকের হস্তেই চ্যুত ছিল । এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর শুভাশুভ সম্বন্ধে চিন্তা করিত না । এক্ষণে আর সে ভাব নাই—উচ্চ বর্ণের মধ্যে অনেকটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে ।”

“পূর্বে বলিয়াছি ব্রাহ্মণদিগের জাতিগত ব্যবসা যজন যাজন । শত-করা ৮০ জন আপনাদিগের জাতিগত ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন । বৈদ্য ও কায়স্থদিগের জাতিগত ব্যবসা কি একথা ঠিক করিয়া বলা কঠিন । বর্তমান সময়ে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ২টী বিষয় সকলের মধ্যে সমভাবে প্রচলিত আছে দেখা যায় । প্রথমতঃ বিদ্বৎজনো-চিত ব্যবসা ইহাদিগের এক চেষ্টা ; দ্বিতীয়তঃ যে বৃত্তি অবলম্বন করিবার ইহাদিগের ইচ্ছা, সেই বৃত্তিই ইহারা গ্রহণ করিয়া থাকে—তাহা সংস্কার বা আচার অনুমোদিত হউক আর নাই হউক । কোন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থ

মহিলা কোন ধাত্তো কার্য্য নিপুণা অশিক্ষিতা মালী নমঃশূদ্র বা হাড়ি জাতীয়া জীলোকের সহিত একাসনে বসিবেন না কিন্তু তাঁহার পুত্র যদি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে ধাত্তীবিদ্যায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হয়—তবে তিনি নিজেকে ধাত্তা মনে করেন এবং কতদূর স্মখী হন । ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চ বর্ণের অনেক পিতামাতা অভিভাবক নানাপ্রকার ত্যাগ স্বীকার ও প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া নিজ নিজ সন্তানকে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি তথাকথিত স্লেচ্ছরাজ্যে স্লেচ্ছ (!) সংসর্গে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন না । কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইঁহারাই আবার আপনাদিগের সন্তানগণকে স্বদেশে নিজের গ্রামে নবশাকের সন্তানগণের সহিত একত্রে বসাইয়া শিল্পশিক্ষা করিতে দিতে সম্মত হন না । কিন্তু কালধর্ম্মের প্রভাবে আস্তে আস্তে এ ভাব দেশ হইতে ক্রমে তিরোহিত হইতেছে । শ্রীরামপুর উইভিং কলেজে ৪৫টী ছাত্রের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ—উচ্চজাতির বালক ।

এক্ষণে শিক্ষাগত সংস্কারের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক ।

“বঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু উপাধিধারীর সংখ্যা দশ হাজারের অধিক হইবে না । বারজন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন গ্রাজুয়েট হয় । এই হিসাব ধরিলে গ্রাজুয়েটের সংখ্যার দশগুণ অধিক ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়, স্থির করিতে হইবে । ইঁহার উপর গৃহে শিক্ষাপ্রাপ্ত অথবা বাঙ্গালা শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা যদি ৪০ সহস্র যোগ করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বশুদ্ধ ১ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক পাওয়া যায় । হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা ১ কোটি ৯০ লক্ষ হইবে । তাহা হইলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক ১২৭ জনের মধ্যে ১ জন লেখা পড়া জানা লোক আছে । ১৮১৭ সালে বাঙ্গালীদিগের দ্বারা বঙ্গের প্রথম বিদ্যালয় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় । স্মরণ্য এক শত বৎসরের শিক্ষাফলে যে উহা হইয়াছে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে ।

“একটু নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিলে হিন্দুর শিক্ষা সম্বন্ধে গৃঢ়তর আরও আবিষ্কৃত হইতে পারে। এক সহস্র বৈদ্যজাতীয় পুরুষের মধ্যে ৬৪৮ জন দেখা পড়া জানে, এক সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে ৬৩৯ জন, এক সহস্র প্রকৃত কার্য়স্বের মধ্যেও ঐকুপ সংখ্যক লোক লিখিতে পড়িতে পারে। ইহারা উচ্চ জাতি। গন্ধবণিক জাতীয় নরনারীর মধ্যে হাজার করা ৩১৮ জন, কাঁসারীর মধ্যে ২১৮ জন, ময়রার মধ্যে ২৪৮ জন, স্তবর্ণ বণিকের মধ্যে ৩২৩ জন দেখা পড়া জানে। ইহারা প্রধানতঃ নবশাক। নবশাকের মধ্যে সকল জাতি ঐকুপ উন্নত নহে, কুমারদিগের মধ্যে হাজার করা ৩৪ জন মাত্র লিখিতে পড়িতে জানে।

“তার পর অধম জাতির কথা ধরুন। জেলিয়াদিগের মধ্যে হাজার করা ৪৩ জন, ধোপাদিগের মধ্যে ২৬ জন, তেওরদিগের মধ্যে ২৮ জন, নমঃশূদ্দের মধ্যে ৩৩ জন, কাওরাঁদিগের মধ্যে ৩১ জন, বাগ্দিদিগের মধ্যে ১৬ জন, ডোমদিগের মধ্যে ১২ জন, হাড়িদিগের মধ্যে ১০ জন, চামারদিগের মধ্যে ৬ জন এবং বাউরিদিগের মধ্যে ৪ জন লিখিতে পড়িতে পারে। হিন্দু মুচিদিগের মধ্যে হাজার করা ৮ জন।”

“এখন মোট হিসাব দেখা যাউক। বাঙ্গালী হিন্দু ৫০টি জাতিতে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে শতকরা ১৩ জন ব্রাহ্মণ ও উচ্চ বর্ণ * * * * ইহারা যে কেবল অবশিষ্ট শতকরা ৮৭ জন হিন্দুর অপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করে, তাহা নহে, সর্ববাদি সম্মতিক্রমেও ইহারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অন্যান্য জাতির প্রতি ইহাদিগের যে কোনরূপ কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে, তাহা ইহারা স্বীকার করে না।

“তাহার পর নবশাক বা শিল্পী জাতি বা চাষী গোয়াল ও মাহিষ্যের কথা। প্রত্যেক জাতি সামাজিক ও ব্যবসায় হিসাবে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানাধিকার করে। তাহারা যে ব্রাহ্মণের জাতি, তাহা স্বীকার করে এবং উচ্চবর্ণের

গ্রাম ইত্যাদি জাতিদিগকে ঘূণার চক্ষে অবলোকন করে। দেশের শিল্পাদি কার্য্য এক সময়ে ইহাদিগের হস্তেই ছিল। এখন ইহাদিগের অতি অল্প সংখ্যক লোকেই আপনাদিগের বৃত্তি পালন করিয়া থাকে। ইহারা উচ্চ জাতির সহিত মিশিতে পারে না। আপনাদিগের মধ্যে কদাচ মিলিত হয়; নিম্নজাতির সহিত ত একেবারেই মিলিত হয় না।

“তৎপরে নিম্নশ্রেণীর কথা—ইহার মধ্যে অস্পৃশ্য জাতি আছে। হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৫৮ জন এই জাতির অন্তর্গত। ইহারা আবার ৩০টা পর্য্যায় ভুক্ত—প্রত্যেকে স্বতন্ত্র এবং প্রধান। ইহাদিগের মধ্যে দুইটা জাতি (সুবর্ণ বনিক ও সাহা) অর্থশালী ও ক্ষমতাবান, এমন কি উচ্চবর্ণ অপেক্ষা এই দুই জাতি কোন অংশে হীন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। অবশিষ্ট ২৮টা জাতির সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ হইবে। বাকী ৪২টা জাতি সহায়সম্পত্তিহীন, ঘৃণিত, পরিত্যক্ত, অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

তবে কি কোন বিষয়েই এই জাতিসমূহের মধ্যে সমতা নাই? হাঁ আছে বই কি? “প্রত্যেক জাতির মধ্যে প্রত্যেক লোকই স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত। অজ্ঞতা, অমূঢ়তা ও অবিশ্বাস-পরবশ হইয়া সকলেই আপনাকে অন্নের সহিত সংশ্লবশূন্য বিবেচনা করে, প্রতিবেশীর প্রতি দীর্ঘাহেতু একজন অন্নের সহিত সম্মিলিত হয় না। (১)

দারিদ্র্যই নিম্নশ্রেণীর সর্বপ্রকার অবনতির মূলভূত কারণ। এই দারিদ্র্যের জন্তই তাহারা সমস্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে পারে না। “সমুদয় অনর্থের মূল এই দারিদ্র্য। নিধন অবস্থায় গল্পের চিত্তবৃত্তি নিচয়ের অবনতি ঘটে, সমাজের সম্বলশক্তি বিনষ্ট হইয়া যায়, বাহ্য বলের

ক্লাসের সহিত পরীক্ষাকারিতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জীবন সংগ্রাম তীব্রতর হইলে নীচতা, মিথ্যাচরণ, অসাধুতা প্রভৃতি দোষের প্রাবল্য ঘটে, বুদ্ধি বৃত্তির বিশিষ্টরূপ বিকাশ বা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্কৃতি হয় না, অধ্যাপক হক্‌সলি, কিড্‌ ও রোমানিন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহাগোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।”

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার ধন ঐশ্বর্যের সহিত ভারতবর্ষের দারিদ্র্য তুলনা করিয়া বেদনাবিক্তপ্রাণে কোন শিষ্যকে এইরূপ লিখিয়া ছিলেন। * * * * * “দ্বিতীয় দরিদ্র লোক। যদি কারুর আমাদের দেশে নীচকুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এদেশের সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, Opportunities আছে। আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎ মাতৃ হবে। আর সকলে দরিদ্রের সহায়তা করিতে ব্যস্ত। গড় ভারতবাসীর মাসিক আয় ২৭ টাকা। সকলে চোঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতে দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে? ক’জন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্ত প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান্ আমরা কি মানুষ! ঐ যে পঞ্চবৎ হাড়ি ডোম তোমার বাড়ীর চারিদিকে, তাদের উন্নতির জন্ত তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে এক গ্রাস অন্ন দেবার জন্ত কি করেছ, বলতে পার? তোমরা তাদের ছোঁওনা, দূর দূর কর; আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফিরছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদদলিত গরীবদের জন্ত কি করছেন? খালি বলছেন, ছুঁয়োনা, আশ্রয় ছুঁয়োনা। এমন সনাতন ধর্মকে কি ক’রে ফেলেছে। এখন ধর্ম কোথায়? খালি ছুঁমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা।” (১)

স্বামীজি বলিতেন, আয়লণ্ডের গুধাতুর কৃষক যখন আমেরিকার স্বাধীন মাটিতে পদার্পণ করে, তখন তাহার কেমন ভয় ভয় চাহনি, বাধ বাধ কথা, যেন চলিতে বলিতে তাহার কেমন একটা আড়ষ্টভাব । কেন এমন হয় ; তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে, আইরিশ কৃষক দেশে থাকিতে উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের নিকট গুনিয়াছে যে, সে গরীব নীচ আইরিশ কৃষক ; তাহার জীবনের কোন উচ্চ লক্ষ্য নাই ; শুধু ছুভিক্ষ এবং দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া উচ্চশ্রেণীর সেবা করাই তাহার ধর্ম । জীবনের প্রথম হইতেই এই সকল উৎসাহহীন কথা গুনিয়া গুনিয়া আইরিশ কৃষকের জীবন শুকাইয়া গেল ; সে আর মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিল না, স্বদেশে বসিয়া সে শুধু এই লাভ করিল যে, তাহার জীবনের কোনও উচ্চ আদর্শ থাকিতে পারে না ।

তাই সে যখন আমেরিকায় উপস্থিত হইল, তখন সে ভয়ে ভয়ে চলিতে লাগিল । কিন্তু সেই স্বাধীনতার লীলাভূমিতে কে তাহার নিকট হইতে মুক্তির ভারতা গোপন করিয়া রাখিবে ? আমেরিকার মাটিতে পা দিয়াই সে শুনিল—জগদীশ্বর মানবের পিতা এবং পৃথিবীর নরনারী সকলেই তাঁহার সন্তান ! কেন তবে আইরিশ কৃষক তুমি ভয়ে ভয়ে চল ? তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ ; আমার ছায়া তুমিও শিক্ষালাভ কর এবং পরিশ্রমী হও, তাহা হইলে তোমার দুঃখের নিশ্চয় অবসান হইবে । যেই সে এই সহানুভূতির বাক্য শুনিল, সেই তাহার চেহারা ফিরিয়া গেল ; তাহার আড়ষ্ট ভাব দূরে চলিয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে সে একজন সাহসী কর্তব্যপরায়ণ পরিশ্রমশীল আমেরিকান হইয়া গেল ;—দেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্ত সেও জীবন দিতে শিক্ষালাভ করিল । সহানুভূতি এবং প্রেম এমনি করিয়াই মানুষকে বড় করিয়া তুলে ।

“এই আইরিশ কৃষককে যেমন এতদিন আয়লণ্ডের উচ্চশ্রেণী মাথা

তুলিতে দেয় নাই, আমরাও তেমনি আমাদের দেশের অগণ্য লোক-
দিগকে আজ বহু শতাব্দীর মধ্যে মানুষ হইতে দিই নাই। নিরক্ষর শ্রম-
জীবী যদি তাহার প্রদত্ত টাকার রসিদ অথবা দাখিলাখানি পড়িবার চেষ্টা
করিয়াছে, অগনি আমরা—ভদ্রলোকেরা কক্ষস্বরে তাহাকে বলিয়াছি—
“এ্যাঃ—কৈবর্তের পো আবার লেখা পড়া শিখেছে।” মুচি যদি ভুলক্রমে
আমার ছায়া স্পর্শ করিয়াছে, অগনি আমার ব্রাহ্মণ্য গর্বে দারুণ আঘাত
লাগিয়াছে এবং সেই হতভাগ্য মুচিকে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দারুণ নির্যাতন
ভোগ করিতে হইয়াছে।

“চামার যদি পেটের জ্বালায় বাড়ীর ছাদে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং
ক্ষুধাতুর কণ্ঠে বলিয়াছে—‘মা! আমি অভুক্ত, উপবাসী, আমাকে ছ’মুঠা
খাইতে দাও’—অগনি আমরা আমাদের উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন তাহাকে
দিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার পূর্বে তাহাকে হাজার বার সম্বাহিয়া দিয়াছি
যে, তুই মুচি, এখান হইতে দূর হইয়া গিয়া ঐ দূরে বাগানের কাছে গাছ
তলায় ঘাইয়া অপেক্ষা কর। এখানে এঁটো কাঁটা যাহা কিছু দিবার দেওয়া
যাইবে”। (১)

বিগত ১৩২৪ সনের ৩২তম জাতীয় মহাসমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা
র্যানি বেসান্তও তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন—“* * * উপেক্ষিত জাতি-
গণকে অবহেলা করা হইয়াছিল। তাহারা দেখিতেছে যে গ্রীষ্ঠান অথবা
মুসলমান হওয়া তাহাদের পক্ষে লাভজনক। তাহাতে তাহাদের সামাজিক
মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এই যে ব্যাপার, ইহার ভিতর বিপদ প্রচ্ছন্ন ভাবে
রহিয়াছে। * * * মাতৃভূমির প্রত্যেক ভক্ত সন্তানের এখন এই সমুদয়
উপেক্ষিত সন্তানগণকে জননীর সাধারণ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসা
একান্ত কর্তব্য।”

(১) “নিগৃহীতের অভ্যুত্থান,” সম্মীক্ষণী, ১০ই চৈত্র ১৩১৪।

“আর এক ধাগ দেশের অন্তরত শ্রেণীগুলি সম্বন্ধে । এই Depressed class এর কথা যখন ভাবি, তখন বিষয়ে অভিভূত হইয়া পড়ি । মানুষের বিধি ব্যবস্থা মানুষকে কত হীন করিয়া ফেলিতে পারে । ইহারা সভ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও সকল সুফল হইতে বঞ্চিত । ইহাদের সেবা ছাড়া সমাজ চলিবে না,—অথচ পদাঘাত ব্যতীত ইহাদের অন্ত কোনও প্রাপ্তি নাই । মানুষের ঘৃণিত স্বার্থপরতা ইহা অপেক্ষা আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না । ইহাদিগের শিক্ষা দানের বিরুদ্ধে যখন যুক্তি শুনি—‘তাহা হইলে আমাদিগের চাকর মিলিবে না’—তখন দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বলিতে হয়—‘ছোট’ নাগপুর অপেক্ষা ‘বড়’ নাগপুরেই—এই সব হামবড়াদের মধ্যেই—ধর্ম প্রচারের কত বড় ক্ষেত্র রহিয়াছে । শিক্ষা ও সভ্যতার আবরণের নীচে একি অমানুষিক হীনতা ।

* * * প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পরম পুরুষ আপনাকে প্রকাশ করিবার অবকাশ খুঁজিতেছেন, মানবাত্মায় যে ব্রহ্মের প্রকাশ, তাহাই শ্রেষ্ঠ প্রকাশ । যে রীতি নীতি আচার পদ্ধতি সেই প্রকাশে বাধা উৎপন্ন করে তাহার বিরুদ্ধে অনন্তকালব্যাপী সমর ঘোষণা করিতে হইবে । এক কথায় বলিতে গেলে,—মানুষ এমন অনেক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে, যাহার চাপে অন্তরস্থ ব্রহ্ম নিষ্পেষিত । ইহাই বাস্তবিক ব্রহ্মহত্যা । যাহা মানুষের মনুষ্যত্ব হরণ করে,—মানুষকে তাহার ব্রহ্মসত্ত্বান্বয়ের দাবী হইতে বঞ্চিত করে, তাহার বিপক্ষে—‘দেশভক্ত’ কখনও সংগ্রাম করিতে বিরত হইতে পারে না । মানুষকে মানুষ হইতে দাও—“(১) তাহাদের হাত ধরিয়া তোল,—উঠাও । তাহাদের পদদলিত করিয়া—আত্মহত্যা ও স্বদেশহত্যা করিও না ।

(১) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্. এ, লিপিত “জাতীয় জীবনে ব্রহ্ম সমাজের শিক্ষা”
বৈশাখ, ১৩২০ অব্যভারত ।

অবজ্ঞাত শ্রেণীর প্রতি উচ্চ জাতির দারুণ অত্যাচারের শোচনীয় পরিণাম উপলব্ধি করিয়া এবং “ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্ত কি করা উচিত” এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—

“আমার মনে হয়, দেশের ইতর সাধারণ লোককে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির একটি কারণ। যত দিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যত দিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতির আন্দোলন করা হউক না কেন কিছুতেই কিছু ফল হইবে না। ঐ সকল জাতিরা আমাদের শিক্ষার জন্ত, (রাজকররূপে) পয়সা দিয়াছে—আমাদের ধর্ম লাভের জন্ত শারীরিক পরিশ্রমে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু ঐ সকলের বিনিময়ে তাহারা চিরকাল লাখিই খাইয়া আসিয়াছে। তাহারা প্রকৃত পক্ষে আমাদের ক্রীতদাস স্বরূপ হইয়া আছে। যদি আমরা ভারতের পুনরুদ্ধার করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমাদেরকে তাহাদের জন্ত কার্য অবশ্য করিতে হইবে।” (১)

আমাদের দেশের তথাকথিত উচ্চ জাতিরা তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় বলিয়াছেন,—“যাহারা বর্তমান বাঙ্গালার ৪ কোটি ৬০ লক্ষের মধ্যে ৪ কোটি, যাহারা দেশের সার্বস্বত্ব; যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাটি কর্ষণ করিয়া আমাদের শস্য উৎপাদন করে; যাহারা ঘোর দারিদ্র্য মধ্যেও মরিতে মরিতে বাঙ্গালার নিজের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে, যাহারা সর্বপ্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া আজিও বাঙ্গালীর ধর্মকে অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, যাহারা আজিও

শুদ্ধচিত্তে সবল প্রাণে জন্মে জন্মে বাঙ্গালার মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয় ; মস্জিদে মস্জিদে প্রার্থনা করে, যাহাদের জন্ত বাঙ্গালী বাঙ্গালী, যাহারা বাঙ্গালার জলের সঙ্গে এক হইয়া, বাঙ্গালী জাতির জাতিত্বকে জানে কি অন্ত্রানে সাগ্নিক অগ্নির মত জ্বলাইয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগকে আমরা বিলাতী শিক্ষার মোহে আইন আদালতের প্রভাবে, জমিদারের খাজানা স্থায় কি অস্থায় করিয়া বাড়াইবার জন্ত, শত প্রলোভন দেখাইয়া, শত অত্যাচার করিয়া একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারি নাই, যাহারা বাস্তবিক বাঙ্গালা দেশের একাধারে রক্তমাংস প্রাণ, তাহারা বড় কি আমরা বড় ? কোন্ সাহসে, কিসের অহঙ্কারে তাহাদের জল স্পর্শ করি না, কাছে আসিলে ঘৃণিত কুকুরের মত তাড়াইয়া দিই। এত অহঙ্কার কিসের ? এত দাঙ্গিকতা কেন ? আমরা হিন্দু হিন্দু বলিয়া চীৎকার করি, আক্ষালন করি, সেই আমরা যে দিনে দিনে হিন্দুধর্মের যে মর্মস্থান সেখানে ছুরিকা আঘাত করিতেছি !— বর্ণাভিমান জইয়া এমনই করিয়া মরণের পথে ভাসিয়া যাইবে। ঐ যে মা ডাকিতেছেন—সাবধান।” (১) ভরসা করি ক্ষমতালোলুপ, জাত্যভিমানী, দাঙ্গিক, স্বার্থপর “উচ্চবর্ণের” কণ্ঠকুহরে সভাপতি মহাশয়ের বাণী প্রবেশ করিবে। আমরা যেন বুঝিতে পারি যে, যদি আমরা জগতের অগ্রগামী জাতিসমূহের সহিত একাসনে উপবেশন করিতে ইচ্ছা করি, তবে সর্বাগ্রে দেশের কোটি কোটি অস্পৃশ্য নরনারীকে মনুষ্যত্বের অধিকার দিতে হইবে। কাহাকেও বঞ্চিত করিলে চলিবে না। জনসাধারণের অভ্যুদয়ই ভারতের উন্নতির একমাত্র পথ। ‘নাশ্তঃ পশ্চা বিদ্যাতে অয়নায়।’

(১) ১৩২২ সনের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাল্লাসনের সভাপতির অভিপ্রায়ণ ।

দশম অধ্যায় ।



জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা, — ‘পৃথীরাজ মহাকাব্যের’
জীবন্ত শিক্ষা ।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দী । ইন্দ্রপ্রস্ত বা দিল্লীর বৃদ্ধ অধিপতি অপুত্রক
অনঙ্গপাল দৌহিত্র পৃথীরাজকে রাজ্য সিংহাসন অর্পণ করিয়া বাণপ্রস্ত
অবলম্বনপূর্বক বদরিকাশ্রমে গিয়া ইষ্টদেব আরাধনা করিতে মনস্থ করিয়াছেন ।
নৃপতির দুই কন্যা, জ্যেষ্ঠা কনোজ রাজমহিষী স্তন্দরী, কনিষ্ঠা আজমীর
রাজ্ঞী কমলা । জয়চন্দ্র স্তন্দরীর ও পৃথীরাজ এই কমলার পুত্র ।
অনঙ্গপাল প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করিয়া পাত্র-মিত্রের সমক্ষে নিজ করে
পৃথীরাজকে আপনার সিংহাসনে বসাইলেন । ইহাতে অত্যন্ত কোপাবিষ্টা
হইয়া জয়চন্দ্রের জননী হঠাৎ সভামধ্যে আসিয়া পৃথীরাজের প্রতি পিতার এই
প্রকার স্নেহাধিক্য দর্শনে অতিশয় বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

শুনিলু একি সংবাদ ?

কি করিলু অপরাধ ?

না পারি বুঝিতে কোন্ দোষে ;

জ্যেষ্ঠের না রাখি মান,

কনিষ্ঠেরে রাজ্যদান

করিলেন কি হেতু কি দোষে ।

রাজা বলিলেন—বৎসে ! হরস্ত তুরকগণ, আর্য্যাবর্ত আক্রমণের
আয়োজন করিতেছে । এই সময় রাজ্য ভাগ করিয়া দিলে অনিবার্য্য বলহানি
এবং প্রজারাও অসন্তুষ্ট হইবে ।

জয়চন্ড্রের পরবর্তী দেশদ্রোহিতার বিষ-বীজ আজ এইখানে সঞ্চারিত হইল । এই হিংসানলে শুধু পৃথ্বীরাজ নহে — বিরাট বিশাল হিন্দুজাতি ও হিন্দুস্থান ভারতবর্ষ যে ভবিষ্যতে দগ্ধ হইবে এই তাহার সূত্রপাত হইল ।

“ওদিকে গজনী নগরীতে বীরবর মহম্মদ ঘোরী
নিজ পাত্র-মিত্র লয়ে, দক্ষিণে কুতব
নবীন যৌবন কাস্তি উজলিছে তনু,
উৎসাহে প্রদীপ্ত মুখ, বীর দর্পে ভরা ।
বামে বসি’ হামজবী, গস্তীর মুরতি,
ললাটে চিস্তার রেখা । মধ্যে উভয়ের
সাধু ভক্ত মৈনুদ্দীন, করে জপমালা,
বিলম্বিত শ্মশ্রুজাল স্পর্শে নাভিদেশ,
প্রশান্ত বদন কাস্তি ! দাঁড়য়ে অদূরে,
সম্মুখে বিনত শির, রাজদূতত্রয় ।

সম্বোধিয়া দূতগণে জিজ্ঞাসিলা ঘোরী,
মধুর গস্তীর ভাষে ;—হিন্দুস্থান মাঝে
ছিলে সবে এতদিন ; কি দেখিলে সেথা ?
কেমন সে দেশ বল ; সম্পদ, বিভব,
লোকের প্রকৃতি, ধর্ম, যা’কিছু দেখেছ,
বল বিস্তারিয়া সবে, অগ্রে বল, আলি ।”

সম্মুখে নোয়ায়ে শির, ভূমি স্পর্শ করি,
আরস্তিলা আলি ;—কি কহিব, “জাহাপনা” !
অদ্ভুত অপূর্ব দেশ । বিশ্বস্রষ্টা যেন
সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে তারে নিরূপণ করি,

গড়েছেন ধরাধামে । অসীল আকাশ,
 সমুজ্জল, দিবাভাগে, তপন-কিরণে ;
 জ্যোতির্ময়, নিশাকালে, নক্ষত্রনিকরে ;
 দীপ্তিমান চন্দ্রালোকে । তুয়াব-বাটিকা
 না জানে সে দেশে কেহ । মধুর পবন
 বহে সেথা সংবৎসর ; স্রোতস্বতী যত
 অমৃত-সলিলে পূর্ণ । তরুলতাগণ
 ফলে, ফুলে শোভায় । নাহি জানি নাগ,
 আশ্বাদে, সৌরভে কিন্তু চিত্ত বিমোহিত ।
 বিশাল সে দেশ ; কোথা গিরি স্মগহান,
 গগনে তুলিয়া শির, আছে বিবাজিত ;
 কোথা বনভূমি, পূর্ণ-ভীষণ স্বাপদে ;
 কোথা রম্য উপবন, পুষ্পে স্রোভিত,
 মুখরিত বিহগের মধুব সম্মীতে ।
 যোজন—যোজনব্যাপী ক্ষেত্র স্নিগ্ধ-শ্রাম
 শোভে কোথা ; কোথা নদী বহে কলকলে ।
 থনি-গর্ভে জন্মে মণি ; সাগরে মুকুতা ;
 নারী সেথা অরূপমা । সমৃদ্ধা নগরী ;
 ফলে শস্যে পূর্ণ পল্লী । কি ক'ব অধিক,
 স্বর্গ স্বর্গ বলে লোক, স্বর্গ, হিন্দুস্থান ।”

কহিলেন ঘোরী ;—

“কহ দূত । কহ শুনি, কোন্ কোন্ স্থান
 দেখিয়া এসেছ তুমি ।” নিবেদনা দূত ;—
 “এসেছি হেরিয়া প্রভো । যমুনার তীরে

প্রাচীন নগরী দিল্লী, পূর্ণ ধনে, জনে ;
জয়স্তুভে দেবালয়ে, সুরম্য প্রাসাদে
অনুপম ধবা গাবো । দেখেছি কনোজ,
অবস্থিত গঙ্গাতটে ; নানা দেশজাত
পণ্য-জব্যো পরিপূর্ণ । দেখেছি আজমীর,
মরু সিদ্ধ-বক্ষে রম্য, শ্রাম দ্বীপ সম
শোভাময় । হেবিয়াছি মথুরা নগরী,
বারাণসী পুণ্যতীর্থ উভয় হিন্দুর ;
আর (ও) কত শত স্থান । হিন্দুস্থানে গিয়া
এসেছি যা' নিরখিয়া বর্ণিবার নয় ।”

“কি দেখেছ, এবে, বলহ, হানিফ্ !”
সম্বোধি দ্বিতীয় দূতে কহিলেন ঘোরী ;—
“কোন্ বেশে ছিলে সেথা ?” উত্তরিল দূত ;—
“মৌলী সন্ন্যাসীর বেশে । করেছি ভ্রমণ
তীর্থে তীর্থে, গ্রামে গ্রামে, নগরে, প্রান্তরে ;
দেখিয়াছি রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ।
পশি' কভু যজ্ঞশালা, কভু দেবালয়ে,
হেরিয়াছি ধর্ম, কর্ম, আচার হিন্দুর ;
শুনিয়াছি শাস্ত্র পাঠ । হ্রীং, ক্লীং, ওঁ ।
কিন্তু জাঁহাপনা । আমি না পারি বুঝিতে
কেন বিশ্বস্রষ্টা, হেন মনোহর দেশে,
এ হেন অধম জাতি করিলা সৃজন,
• ধর্মহীন জ্ঞানহীন ! এক, অদ্বিতীয়
ভুলি' পরমেশে আছে মূর্তিপূজা লয়ে ।

অদ্ভুত তা'দের ধর্ম ; কেহ পূজে শীলা,
 কেহ নদী, কেহ তরু । কেহ আঁখি মুদি'
 করে মহা শূন্ত ধ্যান । বিচিত্র তা'দের
 মনোভাব, পুজারীতি । কহে কোন জন
 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' ; আবার কেহ বা
 নৃত্য করে নরবলি করিয়া প্রদান ।
 কেহ শাক্ত, কেহ শৈব, বৈষ্ণব কেহ বা ;
 কেহ পূজে বুদ্ধে, কেহ পূজে জিন দেবে ।
 নাহি হিতাহিত জ্ঞান ; মুক্তিলাভ তরে
 কেহ ডুবে নদী জলে ; গিরিশৃঙ্গ হ'তে
 পড়ে কেহ লক্ষ দিয়া, রথচক্র তলে
 হয় কেহ নিষ্পেষিত ; বক্ষে বিঁধে শূল ;
 বিদারে রসনা বাণে । নির্গম নির্ভর ;
 পুত্রে দেয় ভাগাইয়া সাগরের জলে ;
 দগ্ধ করে, অবিভেদে, মাতায়, স্ত্রীতায়,
 ঝাঁধি' চিতা কাঠে, তা'র মৃত পতি সনে ;
 বাজায় দাগামা, যদি করে আর্তনাদ ।
 বলে সবে হিন্দু মোরা, কিন্তু পরস্পর
 জাতি ধর্মদ্বেষে, নিত্য, রত বিসংবাদে ;
 নাহি সখ্য, নাহি প্রেম । উচ্চবর্ণ, যদি,
 চামার, চণ্ডাল আদি হীন জাতি নরে
 স্পর্শে কভু, স্নান করি গুচি হয় তবে ।
 নহে বুদ্ধিহীন তা'রা ; তর্কে স্নানিপুণ ;
 রচিয়াছে বহু গ্রন্থ । কিন্তু নাহি জানি,

কেন হেন গতিভ্রান্ত । ব্যথিত অন্তর,
হিন্দুর হৃদয় হেরি' । * * * নীরবিলা দূত ।

* * কহিলেন ঘোরী ;—

“কি তুমি দেখেছ সেথা, বল, জাঁহান্নর !”
কহিল তৃতীয় দূত ;—“সত্য, জাঁহাপনা ।
হিন্দুস্থান সমদেশ নাহি এ ধরায় ।
কিন্তু যে ফণীর শিরে থাকে মহামণি,
দন্ত তা'র বিষে ভরা । নিরখি' তা'দের
বল বীর্য, বুঝিয়াছি বীর হিন্দুজাতি ;
চুর্কি সমরক্ষেত্রে । বুঝিয়াছি আর (ও)
ধর্মপ্রাণ হিন্দু ; হ'ক ধর্ম তাহাদের
ভ্রমাত্মক, তবু প্রাণ দিবে তা'র তরে ।
প্রজী সেথা রাজভক্ত ; রাজার আদেশে
অনলে, গরলে, জলে না ডরে মরিতে
আছে জাতিভেদ সত্য, কিন্তু হিন্দু নামে
এক সূত্রে বাঁধা সবে । না বুঝি', না ভাবি'
হিন্দুস্থান আক্রমণ উপযুক্ত নয় ।
দেখিয়াছি হিন্দুস্থানে আছে তরু এক,
বট নামে ; মহা বাহু করিয়া বিস্তার,
আবরিয়া রাখে গ্রাম ; শাখা হ'তে তা'র
স্বল্প সূত্র সম মূল, পরশিয়া ভূমি,
ক্রমে হয় মহাতরু ; আকর্ষিয়া রস,
রহে সজীবিত, মূল বৃক্ষ ধ্বংস হ'লে ।
তেমতি এ হিন্দু জাতি ধরে, জাঁহাপনা !”

অপূৰ্ণ জীবনীশক্তি ; হ'ক মূলচ্ছেদ,
 উৎপাটন, শাখা তবু ঝহিবে বাঁচিয়া ।
 কি কাজ বিবাদে তবে হেন শত্রু সহ ?
 কি ফল প্রতিমা ভঙ্গে, লুণ্ঠনে, পীড়নে ?”
 “পার কি বলিতে তুমি সমর-কৌশল
 কিরূপ হিন্দুর ? অশ্ব, গজ, পদাতিক
 শিক্ষিত কেমন ? অসি, শূল, ধনুর্বাণ
 কোন্ অস্ত্রে পটু তা'রা ? উত্তরিল দূত ;—
 “নহি যোদ্ধা আমি প্রভো ! বর্ণিব তথাপি
 দেখিয়াছি যাহা ; হিন্দু বলী গজ বলে ।
 সঁচল পর্বত সম গজযুথ যবে
 হয় যুদ্ধে অগ্রসর । নাহি শক্তি কা'র (৩)
 রোধিতে তা'দের বেগ ; প্রতিদ্বন্দ্বি সেনা
 চূর্ণ হয় দণ্ডমাত্রে । দেখিয়াছি আর (৩)
 শরক্ষেপে অদ্বিতীয় হিন্দু পদাতিক,
 অব্যর্থ-সম্মানী সবে । বিশ্বাস আগার
 না পারিবে মুসলমান আঁটিতে হিন্দুরে
 গজে, পদাতিক সৈন্তে । দ্বিতীয় রক্তম
 জাঁহাপনা ! করুন তা' উচিত যা' হয় ।”

ইঙ্গিতে বিদায় করি' রাজদূতগণে
 কহিলেন তবে ঘোরী ;—“শুনিলে ত সবে,
 যা কহিলা দূতগণ ? কিবা যুক্তি বল ?”
 * কহিলা কুতব, হিন্দু নহে বীর্যহীন
 সত্য ; কিন্তু অন্ধপ্রায় ভ্রমে, কুসংস্কারে ।

কাসিম দেবলপুরী আক্রমিলা যবে,
 ঘোষণা করিল হিন্দু ; মন্দির চুড়ায়
 যাবৎ পতাকা এক রহিবে উড্ডীন,
 না পারিবে শত্রুসৈন্য প্রবেশিতে পুরে ।
 কৌশলী কাসিম, শুনি', ধ্বজ লক্ষ্য করি,
 হানিলা অজস্র অস্ত্র ; ছিড়িল পতাকা ;
 নিরাশা-পীড়িত হিন্দু হ'ল পরাজিত ।
 ব্যবহারে শিশু তা'রা । আলোর-ভূপতি,
 দাহির দৈবজ্ঞে ডাকি' জিজ্ঞাসিলা তা'রে ;
 কোথা শুক্রগ্রহ এবে করিতেছে স্থিতি ?
 কি হ'বে যুদ্ধের ফল ?' দৈবজ্ঞ কহিল ;
 'সম্মুখে তোমার শুক্র, পশ্চাতে তা'দের,
 যুদ্ধে তা'রা হবে জয়ী । কহিলা ভূপতি ;
 'কর কিছু প্রতিকার ।' ডাকি স্বর্ণকারে
 শুক্রের স্তব্ধ মূর্তি করায়ৈ নির্মাণ
 রাজার পশ্চাতে বাঁধি' অশ্বের পর্যাণে,
 দিল পাত্রমিত্রগণ ; কহিল বুঝারে ;—
 'পশ্চাতে যখন শুক্র, যুদ্ধে হ'বে জয় ।'
 নির্বোধ দাহির, নাহি বুঝি' নিজ বল,
 পশিল সমরে ; বুঝি সিংহের বিক্রমে
 মুসলমান—অসিঘাতে প্রাণ দিল শেষে ।
 জানে প্রাণ দিতে হিন্দু ; কিন্তু নাহি জানে
 শৃঙ্খলা, সমরনীতি ; স্বভাবে সরল ;
 দেখে দিন, দেখে ক্ষণ, শুভাশুভ যোগ ।

নাহি বুঝে, ব্যাধি—বহি—সমর—সঙ্কটে,
 ক্ষণমাত্র কালক্ষেপে ঘটে সর্বনাশ ।
 না জানে পুরুষকার, দৈব, দৈব করি,
 নয়ন থাকিতে অন্ধ ; হোঁচটে, হাঁচিতে,
 কাক শৃগালের রবে গণে পরমান ।
 অল্পে হয় বিশৃঙ্খল ; নাগক অভাবে,
 ভাঙ্গি বাহ, মেঘ সম করে পলায়ন ।
 আস্থাহীন নিজ বলে ; চিনে মাত্র রাজা ;
 নিরাশ নিজ্জীব হয় রাজার পতনে ।
 দাহির, অনঙ্গপাল হস্তা আরোহিয়া
 এসেছিল যুদ্ধে দৌড়ে ; তীক্ষ্ণ শরাঘাতে,
 অলস্ত কন্দুকে করী গেল পলাইয়া,
 বিধ্বস্ত বিপুল সেনা হইল নিমেঘে ।
 শুনিয়াছি আছে লেখা শাস্ত্রে তাহাদের,
 মুসলমান হিন্দুস্থান আক্রমিবে যবে,
 হ'বে তারা পরাজিত ; সাম্রাজ্য তুর্কের
 প্রতিষ্ঠিত হবে সেখা । হিন্দু, শাস্ত্রভীরু,
 আছে চিন্তাঘিত হ'য়ে ; প্রবেশিলে মোরা,
 হিন্দুস্থানে, নিরাশায় হ'বে পদানত ।”

এইরূপ আশা উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া

* * কহিলেন ঘোরী ;—

“নাহি অভিলাষ মোর মায়ুদের সম,
 ঝটিকার বেগে পড়ি’, ঝটিকার প্রায়,
 হ’তে পুনঃ অন্তর্হিত । বাহ্য সংস্থাপিতে

স্থায়ী রাজ্য হিন্দুস্থানে । কুতব ! তোমারে
 দিহু এ কার্যের ভার ; কর আয়োজন ;
 দেশ দেশান্তর হ'তে আনো সেনাদল ।
 শুনেছ ত জাঁহান্দর যা' कहिल এবি ?
 গজসৈন্তে, পদাতিকে হিন্দু বলবান্ ;
 কিন্তু নাহি চিন্তা তাহে । সুবিদিত তব,
 রণক্ষেত্রে মত্ত গজ ঘটায় বিপদ,
 শত্রু মিত্র উভয়ের ; পায় যদি ত্রাস,
 না মানে অঙ্কুশ, করে উভে বিদলিত ।
 পদাতিক শ্রান্ত হয়, রণক্ষেত্র যদি
 হয় দীর্ঘ, সুবিস্তৃত ; 'না পারে সহিতে
 দূর পর্য্যটন-ক্লেশ, লৌহ বর্মভার ;
 চালনায় শ্লথ গতি । অশ্ব আমাদের,
 পরিশ্রমী, দৃঢ়কায়, তুষ্ট অল্লাহারে ;
 উল্লম্বনে, সস্তরণে, গিরি আরোহণে
 সুদক্ষ, অভ্যাস গুণে । অশ্ববলে মোরা
 গজ, পদাতিক দুই করিব বিজয় ।
 কর আয়োজন তুমি ; বুঝিলে সময়,
 শ্রোন যথা পড়ে গিয়া কপোত মাঝারে,
 পড়িব হিন্দুর দেশে । প্রকৃতি তা'দের
 বুঝেছি উত্তম আমি । বীরত্বে, বিক্রমে
 যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী তা'রা ; ধরে বহু গুণ ।
 কিন্তু জাতি-জাতি-বৈরে নিত্য জর্জরিত,
 ভ্রষ্ট সত্য ধর্ম হ'তে ; পতন তা'দের

অনিবার্য । শিলাখণ্ড বাঁধা পরস্পর,
 রোধ করে স্রোতবেগ, তরঙ্গ উত্তাল ;
 কিন্তু অনাবদ্ধ হ'লে, উলটি' পালাট,'
 হয়, ক্রমে, রেণু শেষ ; হিন্দু বটে দৃঢ়,
 বন্ধন না আছে কিন্তু তাহাদের মাঝে ।
 শত জাতি, শত ধর্ম, শত রাজ্য যথা
 ধ্বংসে রত পরস্পর, কেমনে তথায়
 বন্ধন, মিলন হবে ? কিন্তু মোরা সবে
 এক জাতি, এক ধর্মী, এক ভূপতির
 আঙ্গাধীন ; মোরা যবে হ'ব অগ্রসর,
 স্রোত-মুখে বালুসম যাবে ভাসি তা'রা ।
 আর (ও) শুন গুঢ় কথা ; মূঢ় হিন্দু জাতি
 গৃহচ্ছিন্ন প্রাশান্তিতে না হয় বিমুখ ।
 চিরদিন এই রীতি শুনিতেছি আমি ;
 যখন (ই) বিদেশী কেহ প্রবেশে ভারতে,
 স্বদেশ—স্বধর্মজোহী হিন্দু কোন জন
 আসি, গুরু লয় তার । সিকন্দর বীর
 পশিলা পঞ্জাবে যবে, তক্ষশিলাপতি
 অশ্ব, অর্থ, খাদ্যসনে শিবিরে তাঁহার
 পাঠাইয়া দিল দূত । সুলতান মামুনে,
 লয়ে অশ্ব সৈন্য, ছুটে শিবানন্দ রায়
 করিল সাহায্য দান । প্রবেশিলে মোরা
 হিন্দুস্থানে, সাহায্যের না হ'বে অভাব ।
 জ্ঞান সবে হিন্দুস্থানে ঈশ্বর্য্যে, গৌরবে

অগ্রগণ্য দিল্লী । আমি পেয়েছি সংবাদ,
বিবাদের বিষ-বীজ হয়েছে রোপিত
দিল্লীরাজ্যে । বৃদ্ধ রাজা গেলে তীর্থবাসে,
বাধিবে বিবাদ ঘোর ভ্রাতায়, ভ্রাতায় ;
একে করি' হস্তগত নাশিব অপরে ।
দিল্লী যদি একবার হয় অধিকৃত,
ইসলাম প্রভু হ'বে স্থাপিত ভারতে ॥”

এদিকে মাতামহ পৃথ্বীরাজকে দিল্লী বা হস্তিনাপুরীর সিংহাসন দান করার
জন্তু জয়চন্দ্র ক্ষোভে রোষে হিংসা ঘেঁষে জর্জরিত হইয়া কেমন করিয়া
পৃথ্বীরাজকে জব ও তাহার সর্বনাশ করিবেন এই চিন্তা করিয়া এক রাজসভায়
যজ্ঞের আয়োজন করিলেন । লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল— এ যজ্ঞে
ভারতের সমুদয় নরপতিই আগমন করিবেন, শুধু পৃথ্বীরাজ দিল্লীর প্রাধান্ত
রক্ষার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ স্বীকার করিবেন না । এই সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া
গুরু তুঙ্গাচার্য জয়চন্দ্রের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—

জয়চন্দ্র ! করিহু শ্রবণ
সেনাগণ ব্যস্ত তব, যুদ্ধ আয়োজনে ;
ছিলাম প্রবাসে, বৎস ! যুদ্ধ কার সনে ?
“যুদ্ধ হ'বে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ সনে,
তাই, সেনাগণ মম বড় আয়োজনে ।”
কহিলেন গুরু,—“কিবা অপরাধ তা'র ?
করেছে সে কোনরূপ ক্ষতি কি তোমার ?”
উত্তরিল জয়চন্দ্র ;—“ক্ষত্রিয়ের মান
ক্ষতি হ'তে বড় ; তুচ্ছ তা'র কাছে প্রাণ । . .

মাতামহ, বসি' দিল্লী-রাজসভাতলে,
 বলেছেন ;—দিল্লী রাজ্য সমর্থ, সবলে ।
 অধম ভিক্ষুক প্রায় গণি' মোরে মনে
 চাহিলেন তুষিবারে অর্থ বিতরণে ।
 এর চেয়ে কিবা, দেব ! হ'বে অপমান ?
 রাঠোর দুর্বল হ'ল, সবল চৌহান ?
 জননীর উপরোধ করিয়া স্মরণ
 করি নাই, এত দিন, কৃপাণ গ্রহণ ।

তাই, দেব ! করেছি মঙ্গল,
 রাজস্বয় মহাযজ্ঞ করি' উদ্‌যাপন
 লব সার্বভৌম পদ । ভারত মাঝার
 কলিযুগে রাজস্বয় হয় নাই আর ।
 পৃথ্বরাজ যজ্ঞে যদি লয় নিমঙ্গল,
 কোশলে উদ্দেশ্য মোর হইবে সাধন ।
 রাঠোর প্রাধান্য যদি করে সে স্বীকার,
 না রহিবে তা'র প্রতি বিদ্বেষ আমার ।
 কিন্তু শুনি লোকমুখে, দক্ষ ঈর্ষানলে,
 না আসিবে ছুরাচার রাজস্বয়-স্থলে ।
 প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে মোর যজ্ঞ-উদ্‌যাপনে
 দিবে বাধা ; তাই আমি ভাবিয়াছি মনে,
 দ্বারপাল-মূর্তি তা'র করায় গঠন
 বেত্রকরে সভাস্থলে করিব স্থাপন ।
 হেরি' তা'রে অল্প দৃষ্টে লভিবেক বোধ,
 শক্তি থাকে, আসিলা, সে ল'বে প্রতিশোধ ।

বিনা প্রতিবাদে যদি সহ্যে অপমান,
কে দুর্বল, কে সবল হইবে প্রমাণ ।

তখন ব্যথিতচিত্তে তুঙ্গাচার্য বলিলেন—এই ঘোর সঙ্কটসময়ে ভ্রাতৃভেদ, জাতিদ্বেষ্টা কি কখনও কল্যাণকর হইবে । তীর্থপ্যাগটন উদ্দেশ্যে হিন্দুলাজে গিয়া যে সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছি তাহাতে মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই । ভারতবর্ষে তুর্ক-রাজ্য স্থাপন উদ্দেশ্যে গজনীরাজ মহম্মদ ঘোরী মহা আয়োজন করিতেছে ।

গুরু আমি তব, মোর গুন উপদেশ,
ভুলে যাও অভিমান, জিঘাংসা, বিদ্বেষ ।
সম্মিলিত হও বীর পৃথ্বীরাজ সনে,
শিখাও সংগ্রাম-নীতি মিলি' দুইজনে
রাঠোর-চৌহান-দলে । যদি ছত্ৰাশন
মিলে বায়ু সনে, তা'রে কে করে দমন ?
ঝটিকার বেগ যথা রোধে মহোধর,
তেমতি দাঁড়াও দৌহে বন্ধপরিকর ।
প্রতিপদে যবনেরে বাধা করি' দান,
দাও বলি স্তম্ভ, স্বার্থ, বলি দাও প্রাণ ।
নিরখিয়া যবনের হউক বিদিত,
হিন্দুত্ব ধূলায় নয়, শিলায় গঠিত ।
রুদ্ধ হ'ক তুরকের পূর্বমুখী গতি,
মগধ, মিথিলা, বঙ্গ পা'ক অব্যাহতি ।
শত্রু করগত প্রায় জন্মভূমি যা'র
সাজে কি এ তুচ্ছ দ্বেষ্টা, অভিমান তা'র ?

কি লাক্ষ্মীনা পর সেবা বুঝিবে তখন,
 দাসত্ব শৃঙ্খল কণ্ঠ দীড়িবে বধন ।
 আত্মীয়-কলহ যদি তৃপ্তি এত হয়,
 করিও পশ্চাতে ; এবে, উপযুক্ত নয় ।
 হিন্দু হ'ক, বৌদ্ধ হ'ক, চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ
 এ সময় রক্ষা নাই বিনা সম্মিলন ।
 দিল্লীস্থরে অপমান করি' অকারণ
 কেন জালাইবে সর্বগ্রাসী ছতালন ?
 কি করিলা যুদ্ধিষ্ঠির পড়ে নাকি মনে ?
 সমাপিলা যজ্ঞ, তুমি' রাজা দুৰ্য্যোধনে ।
 অগ্রে যদি হ'ত কুরুক্ষেত্র আয়োজন
 তা' হ'লে কি হ'ত রাজসূয় উদ্‌যাপন ?
 ভ্রাতৃভেদে কতু কার (ও) হয় নাই হিত,
 উভয়ে পাইবে ধ্বংস, জানিও নিশ্চিত ।”

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না । পরম হিতৈষী গুরুর উপদেশবাক্য নিষ্ফল হইল । জয়চন্দ্রের মন একটুকুও নরম ও পরিবর্তিত হইল না । কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর ও রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে ভারতবর্ষের রাজ্যবৃন্দকে নিমন্ত্রিত করিলেন এবং পূর্বকথিতমত পৃথীরাজের মূর্তি নির্মাণপূর্বক দ্বারদেশে দ্বারপালরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । সমস্ত সংবাদ শুণ্ডচরমুখে অবগত হইয়া পৃথীরাজ স্রীমৎ বিশ্বস্ত অমুচর ও সহচরগণ সহ আসিয়া ছদ্মবেশে নিজ প্রতি-মূর্তি-পাশে অবস্থান করিতে লাগিলেন । যথাসময়ে নানালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া রাজকন্যা সংযুক্তা সভামধ্যে আনীতা হইলেন । ভাট একে একে সমস্ত রাজপুত্রগণের বর্ণনা করিতে লাগিলেন । সংযুক্তা কাহারও কণ্ঠে মালা অর্পণ না করিয়া

যথায়, সভার প্রান্তে, জনতার মাঝে,
 দ্বারপাল-বেশী নিজ প্রতিমূর্তি পাশে,
 উপবিষ্ট পৃথ্বীরাজ, আসিলা কুমারী ।
 * * * * * সখী-কর হ'তে
 ল'য়ে অর্ঘ্য, লয়ে মালা নৃপতিনন্দিনী
 পূজি দ্বারপাল-মূর্তি, অর্ঘ্য সমর্পিয়া,
 কণ্ঠে পরাইয়া মালা, নগিলা সম্মুখে ।
 আতঙ্কে বিশ্বয়ে লোক নিরঞ্জে নয়নে,
 'পাণ্ডু রাজ্যেশ্বর', ধরি' সংযুক্তার কর,
 তুলি' অশ্বপ'রে তাঁরে, পার্শ্বে বসাইয়া
 কশাঘাত করি বাজি দিলা ছুটাইয়া
 গঙ্গাতীর পানে । আসিলেন গঙ্গাতীরে ।
 সান্ত্বনিয়া সংযুক্তায় করে ধরি' বীর
 তুলিলেন তরী'পরে । অগনি ইঙ্গিতে
 লৌহ-দৃঢ় শত বাহু আকর্ষিলা বলে
 বহিরা, ছুটিল তরী বাটিকার বেগে ।
 অমুকুল স্রোত, বায়ু হইল সহায়,
 অদৃশ্য হইল তরী মুহূর্তের মাঝে ।

একে জলন্ত অনল, তাহাতে ঘুতের আহুতি । জয়চক্রের পৃথ্বীরাজ-
 বিদ্বেষ-বহ্নি দাবান্লিতে পরিণত হইল ।

চল, হে পাঠক ! তবে, ত্যজি' আর্য্যভূমি,
 যাই পুনঃ ফিরি' সেই গজনী নগরে,
 নিরখি সেথায় ঘোরী, ল'য়ে মস্ত্রিগণে,
 চূর্ণিতে হিন্দুরে রক্ত কোন্ আয়োজনে ।

কহিলেন ঘোরী—

“ভেদনীতি আমাদের হইবে সহায় ;
 হিন্দু, বৌদ্ধ মাঝে আছে তীব্র ঘেযানল ;
 অনভ্যস্ত বৌদ্ধ রণে, অস্ত্র ব্যবহারে,
 মরিবে সহজে ; হিন্দু না রক্ষিবে ত’রে ।
 উচ্চবর্ণ জন কত মাত্র হিন্দুস্থানে,
 অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, শূদ্র গুনি অগণন ;
 লাক্ষিত, দলিত এই নীচ জাতি যা’রা
 বুদ্ধিহীন, বীর্যহীন মেঘ সম তা’রা ।
 না আছে দৃঢ়তা, ধৈর্য্য, না আছে সাহস,
 শৃঙ্খলা, সমরনীতি না পারে বুঝিতে ;
 পদাঘাত ভয়ে আসি’ অসি ধরে রণে ;
 কি শক্তি তা’দের যুবো আমাদের সনে ?
 শাস্ত্র, বিধি হিন্দুগণ রচিয়াছে বহু ;
 কিন্তু এই স্থলতত্ত্ব ভাবে নাই তা’রা ;
 দেহের প্রত্যঙ্গ যদি সবল না রয়
 সে দেহ বলিষ্ঠ, দৃঢ় কখন (ও) কি হয় ?
 পক্ষু, জড়প্রায় রাখি’ অসংখ্য মানবে
 কেমনে সমাজবপু হ’বে বলবান ?
 ভগ্ন যা’র গেরদণ্ড হ’ক না সে বীর,
 পারে কি দাঁড়াতে কভু উচ্চ করি শির ?
 হ’ক দীন, হ’ক দাস তবু মুসলমান
 জানে রাজা, মন্ত্রী হ’তে অধম সে নয় ;
 প্রতিপদে হীন নীচ করিয়া শ্রবণ

নহে ভগ্নোৎসাহ, নহে সঙ্কুচিত মন ।
 আজ যে দারিদ্র্য-বশে নীচ কার্যে রত
 অশ্বপাল, চর্মকার, ভূতা, ভারবাহী ;
 সেও ভাবে যদি তা'র গুণ কিছু রম্য,
 রাজত্ব, মন্ত্রিত্ব তা'র অসম্ভব নয় ।
 বীৰ্য্য, বুদ্ধি নীচজনে মসূলিম-সমাজে
 করে উচ্চ ; আত্মাদরে দৃষ্ট তাই তা'রা ;
 হিন্দুর যে নীচ, রহি' নীচ চিরদিন,
 হতমান, স্বল্পায়াসে হইবে অধীন ।
 মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণ শাসে হিন্দুস্থান,
 অত্র যা'রা রাজতন্ত্রে অজ্ঞ, উদাসীন ;
 কোথা পাবে ক্ষুণ্ণ তা'রা, কোথা পাবে বল ?
 পলা'বে সঙ্কটকালে ত্যজি রণস্থল ।
 আছে রাজপুত জাতি বটে বীৰ্য্যবান,
 সম্মিলিত হ'লে তা'রা অজেয় সমরে ;
 কিন্তু গ্রামে, গ্রামে তা'রা রাজা জনে, জনে ;
 সর্বের সার্বভৌম, হবে মিলন কেমনে ?
 নাহি সখ্য, নাহি মৈত্রী রাজপুত মাঝে ;
 অগ্নে রুপ্ত, হানে অসি বক্ষ পরস্পর ;
 ক্ষতিগ্রস্ত, জঁর্ষাপন্ন, লাঞ্চিত বিজিত,
 বহু শত্রু চৌহানের আছে হিন্দুস্থানে ;
 * * * * *
 শত্রুর যে শত্রু তা'রে মিত্র ভাবি' মনে
 পৃথীরাজ-শত্রু সনে হইবে মিলিত ;

উচ্চ, নীচ যে যা' হ'ক, পুরুষ কি নারী,
 যথাযোগ্য কার্যে সব কোরো সহকারী ।
 থাকে শত্রু রাজা, তা'র যাইবে সভায়,
 থাকে শত্রু সাধু, তা'র যাইবে আশ্রমে ;
 যাইবে শ্মশানে ; শুনি শত্রুধ্বংস তরে
 ভ্রাস্ত হিন্দু শব লয়ে পূজা সেথা করে ।
 পৃথীরাজ শত্রু মাঝে শ্রেষ্ঠ ছুইজন,
 কনোজের রাজা আর জম্মু-অধিপতি ;
 হয়েছে নৃসিংহদেও পদে গোব নত,
 তুমি গিয়া জয়চন্দ্ৰ কোরো হস্তগত ।

কত দিন যায়—একদিন চৌহানের রাজপুরী আজগীরে পাত্রমিত্র গুরুদেব
 সহ পৃথীরাজ রত্নধচিত স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্ট । এমন সময় গজনী হইতে
 ঘোরীর দূত তাহাদের আগমনবার্তা নিবেদন করিল । অন্ত্যান্ত বহু কথাবার্তা
 বাকবিতণ্ডার পর গজনীর দূত—

নতশিরে হামজবী कहিলেন তবে ;—

* * * জানাইব আমি

বলেছেন প্রভু যাহা ; কর্তব্য নির্ণয়
 করিবেন হিন্দু-রাজ । আদেশে প্রভুর
 কোরাণ, কুপাণ আমি আনিয়াছি সাথে ;
 রাখিছু উভয় এই । লইলে কোরাণ
 মদিনানিবাসী এই সেথ মহামতি
 করিবেন দীক্ষাদান । লইলে কুপাণ
 লক্ষ অশ্বারোহী, লক্ষ পদাতিক সহ,
 ঘিরিবে আজমীর, দিল্লী ;—যথা অভিরুচি ।

* * * *

কহিলেন পৃথীরাজ ; আষাঢ় প্রথমে
 নবীন নীরদ যেন গর্জিল গগনে ;—
 “শুন, দূত ! লহ গ্রন্থ, দাঁও তরবারী ।
 কহিও প্রভুরে তব, জন্ম জন্মান্তরে
 থাকে যদি পুণ্য, নরজন্মে হিন্দুকুলে ;
 পারে বুঝিবারে হিন্দুধর্মের মহিমা ।
 হেন ধর্মভ্যাগ আমি করিব স্বেচ্ছায় ।
 ধিক মোরে । শত ধিক এ হেন প্রস্তাবে !
 না ছাড়িব ধর্ম আমি । কহিলে যে দূত,
 আছে বহু শত্রু মোর, মিথ্যা তাহা নয় ।
 কিন্তু প্রাণাত্যয়ে আমি দণ্ডিতে হিন্দুরে
 না ডাকিব মুসল্মানে । মুষিক যদিপি
 করে উপদ্রব, তবে, কোন্ গৃহী, বল,
 ডাকে কালসর্পে তা’র বিনাশের তরে ?
 এই ধনুর্বাণ, এই মহাখড়্গ মোর
 অক্ষম কি শত্রু জয়ে ? তাই তুর্যকের
 লইব আশ্রয় আমি ? ব্যর্থ বাহুবল ।
 কহিলে যে তুমি, দূত ? প্রভু তোমাদের
 না চান অপর কিছু, চাহেন কেবল
 প্রভুত্ব-স্বীকার ; কিন্তু প্রভুত্ব পরের
 করে যে স্বীকার, কিবা রহে তাব মাঝে ?
 কি পার্থক্য, পরাধীনে পালিত বৃষভে ?
 করি রজ্জুবদ্ধ প্রভু চালায় উভয়ে ।

যতক্ষণ র'বে শ্বাম স্বধর্ম, স্বদেশ,
 স্বাধীনতা ছাড়িব না, ছাড়িব না কভু ।
 এই মোর জন্মভূমি, গাতৃস্বরূপিনী
 রাজোয়ারা, স্মৃথধাম, নন্দন সদৃশ
 আজমীর দিব আমি তুরকের করে ?
 পুণ্যতীর্থে, তপোবনে বৈকুণ্ঠ সদৃশ
 যে দেশ, সে দেশ আমি করিব অর্পণ
 শত্রুভয়ে ? নিজ দেশে পরদাস হয়ে
 করিব জীবন পাত ? দিক সে জীবনে ।
 লইলাম তরবারী, কহিও প্রভুরে,
 হইবে সাক্ষাৎ দৌহে সমর-প্রাঙ্গণে ।
 নির্ভয়ে কহিও দূত প্রভুরে আপন,
 বিনা দোষে বক্ষে কার (ও) হানিলে ছুরিকা
 শতধারে পড়ে তাহা ঘাতকের বৃকে ;
 পাতকের প্রায়শ্চিত্ত বিধি বিধাতার । (১)"

তারপর পৃথীরাজের সঙ্গে ঘোরীর মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল । মহম্মদ ঘোরী
 সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইলেন । ইহাই বিখ্যাত থানেশ্বর বা
 তিরোরীর যুদ্ধ । যুদ্ধে হারিয়া—

বসিয়াছে মল্লসভা ঘোরীর শিবিরে ;
 ভূপতির মূর্তি হেরি' ত্রস্ত, অধোমুখ
 দলপতি কয়জন । কঠোর ভাষায়
 কহিছেন ভূপ সম্বোধিয়া তা' সবার ;—

(১) মহম্মদ ঘোরীর সম্বন্ধে এ কথা বার্ষ হয় নাই । গঙ্গরবিগের হস্তে তিনি অতি
 নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইরাছিলেন ।

* * * *

সত্যধর্ম হিন্দুজাতি শিখে নাই কভু ;
বুঝে নাই মানবের স্রষ্টা ভগবান ;
তাই, রচি জাতিভেদ, মোহে অন্ধ প্রায়,
একে অন্বে পশুসম লাঞ্ছে অবজায় ।
অন্ত্যজ, অম্পৃশ্য জাতি যা'রা হিন্দুস্থানে,
শুনিয়াছি, মনস্তাপে জর্জরিত তা'রা ;—
মোরা গিয়া ভাই বলি' করিলে আহ্বান
দলে দলে আসি' সবে হ'বে মুসলমান ।
শুনেছি ধর্মের নামে মূঢ় হিন্দুগণ
পাপাচার, কদাচার করে শত শত ;
বুঝাইলে শাস্ত্রবাক্য করে যুক্তিদান,
আমাদের প্রতियুক্তি করাল কুপাণ ।

* * * *

কহিল কুতব ;—“প্রভো ! সন্দেহ কি তায় ?
পাপ বিনা, হ'য়ে তা'রা, বীর, বুদ্ধিমান,
হ'বে কেন মতিভ্রান্ত ? কেন আকরণ
করিবে স্বজাতি ধ্বংসে অন্বে নিমজ্ঞ ।
মুসলমানে মুসলমানে সত্য ঘটে বাদ,
কিন্তু মোরা যুদ্ধ করি নিজেদের মাঝে ;
অন্য ধর্মী শত্রু কভু না করি আহ্বান ;
হিন্দু ডাকে 'ভাগ্যে মোর কাটো, মুসলমান !'
কহিলেন ঘোরী ;—‘সত্য বুঝেছ, কুতব !
জাতিবৈর-পাপে ধ্বংস হ'বে হিন্দুজাতি ;

এদিকে তারা গিরি-শিরে রাজগুরু তুঙ্গাচাণ্য শিষ্যসহ উপবিষ্ট । বিশাল
হিন্দুজাতির ভাবী পতনের আশঙ্কায় অতিশয় চিন্তাধিত—

আচার্য্য, উন্নীলি' নেত্র, জিজ্ঞাসিলা ধীরে ;—

“কহ, বৎস । গজনির কি সংবাদ এবে ।”

বিনয়ে কহিলা শিষ্য ; মহা আয়োজন

করিছে তুরকদল নানাদেশ হ'তে

সৈন্ত, অস্ত্র, তুরঙ্গম করিছে সংগ্রহ ।

কঠোর প্রতিজ্ঞ বীর মহম্মদ ঘোরী

তীব্র অপमानে

করেছে প্রতিজ্ঞা তা'রা মরিবে এবার,

তবু না ছাড়িবে যুদ্ধ ।” কহিলেন গুরু ;—

“দেখ বৎস । কি পার্থক্য হিন্দু মুসলমানে ।

পরাজিত জয়পাল, অভিমান ভরে,

পশিলা অনলে ; আর পরাজিত ঘোরী

করিয়াছে প্রাণপণ জিনিতে হিন্দুরে ।

* * * *

“বল এবে, অস্ত্র যাহা পেয়েছ সংবাদ ।”

নিবেদিলা শিষ্য ;—“দেব ! করিছে শ্রবণ,

ছদ্মবেশে আসি বহু যবনের চর

আমাদের বলাবল লয়েছে সন্ধান ।

শুনিলাম, বহু রাজা হিন্দুস্থানবাসী,

চৌহানের জয়লাভে হয়ে ঈর্ষান্বিত,

করিয়াছে বাক্যদান সাহায্যের তরে

বলেছেন জয়চন্ড, পৃথ্বীরাজ যবে

পশিবেন রণক্ষেত্রে, রাঠোর সৈনিক,
হ'য়ে সন্মিলিত জম্মু সেনাদল সনে,
আক্রমিবে ভীমবলে দিল্লীর বাহিনী ।

এই সমস্ত শুনিয়া গুরু তুঙ্গাচার্য্য বলিতে লাগিলেন—

তথাপি ভরসা আছে, হিন্দুগণ যদি
রহে সন্মিলিত, এই তুরক বাটিকা
চ'লি যা'বে, শক-ছুন বাটিকার প্রায় ।

দেখিয়াছ তুমি, যবে বহে মহাবড়,
কত তরু কত শাখা যায় ভগ্ন হ'য়ে,
কিন্তু বেণুপুঞ্জ, বন্ধ প্রেমে পরস্পর
অভিন্ন অচ্ছিন্ন রহে । হিন্দুও তেমতি

রহিবে অভেদ্য, যদি বাঁধা থাকে প্রেমে ।
বল বৎস ! শুনি এবে, কোথা কোথা তুমি
গিয়াছিলে ; মনোভাব কি বুঝিলে কা'র ?”
কহিলেন শিষ্য ;—“দেব ; ইহল বাসনা,
বুঝিতে, প্রথমে, যত সাধারণ লোক
কি ভাবে দেশের কথা, কি চাহে তাহারা ।

এই উদ্দেশ্যে বার্তিকী-পূর্ণিমা দিবসে গঙ্গা-গাওকী সঙ্কমে লক্ষ লক্ষ লোক
সমবেত যোজনাস্তব্যাপী প্রকাণ্ড মেলাস্থলে উপনীত হইয়া—কহিলাম আমি—

“শুন, দেশবাসি । মহা শঙ্কট সময়
উপস্থিত প্রায় । ম্লেচ্ছ তুরকের সেনা,
শুনিয়াছ, সোমনাথ ভেঙ্গেছিল যাবা,
আসিছে আবার । যথা পড়ে পদ্মপাল,

পত্র, পুষ্প, ফল কিছু না রহে যেখানে ।

ভোগতি এ তুর্কদল পড়িবে যথায়

উচ্ছিন্ন করিবে দেশ । এ সময় কেহ

রহিও না উদাসীন ; নিজ নিজ ভূপে

করিও সাহায্য দান । রাজার বিপদে

প্রজার বিপদ সদা রাখিও স্মরণে ।

ডাকিবেন যবে রাজা সাহায্যের তরে

দাঁড়াইও অঙ্গ ল'য়ে । দেবী দেশগাতা,

বাস্তভূমি বলি' যারে পূজা কর সবে,

ডাকি'ছেন নির্বিশেষে রাজা, প্রজা সবে ।

আসি' যদি তুর্কদল বসে সিংহাসনে,

শ্বেচ্ছ-পদ-সেবা ভাগ্যে ঘটিবে সবার ।

(কহে তারা পরস্পরে—)

“কে তুর্কক ? কেন আসে ?” কৃষি একজন,

গ্রামের মণ্ডল বলি বোধ হ'ল তারে,

কহিলা সে নমি মোরে—

“সন্ন্যাসী ঠাকুর ।

কি বলিছ ? কেন হেন দেখাইছ ভয় ?

আসিবে তুর্কক-সেনা, কি ক্ষতি মোদের ?

সেবার না ডরি মোরা ; অভ্যস্ত-সেবার ।

রাজা, রাজমন্ত্রী, রাজ-গুরু-পুনোহিত,

সেনাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, অশ্ব-হস্তিপাল,

সৈনিক, গ্রহরী সেবা নাহি করি কা'রে ?

সবে আমাদের প্রভু, সবে চাহে সেবা ;

কি লাজ তুর্ক-রাজে সেবি যদি তবে ?
 জন্মে ছাগ মাংস দিতে ; নর দেয় বলি,
 ব্যাঘ্র করে বিদারিত, গ্রাসে অজগর,
 এই মাত্র ভেদ ; কিন্তু মৃত্যু প্রতিস্থলে ।
 পিতৃ পিতামহ হ'তে গুণিতেছি মোরা,
 যে হ'ক সে হ'ক রাজা, আমরা কৃষক
 সকলের ভক্ষ্য । মোরা কি জানি যুদ্ধের ?
 নহি রাজপুত, নহি অস্ত্রের অভ্যাস ;
 বহি ভার, করি ভূমি । রাজার প্রহরী
 ধরে আসি', যা'ব যুদ্ধে যা' জানি করিব ।
 হন জয়ী মহারাজ, দিব পূজা, বলি ;
 জয়ী হ'য়ে তুর্করাজ বসে সিংহাসনে,
 দিব কর ; বাস্তব মাতা থাকুন মস্তকে ।”

ব্যথিত অন্তরে,

উত্তীর্ণ হইয়া গঙ্গা, আসিলাম আমি
 পুষ্পপুরে (পাটলীপুত্র—পাটনা)

হেরিলাম শ্রীহীনা, মলিনা

এবে পুরী । নেত্রের ধারা বহিল স্রবণে,
 কোথা সে যবনজয়ী চন্দ্রশুণ্ড ভূপ,
 কোথা সেই সার্বভৌম অশোক নৃপতি ।
 দেখিলাম বৌদ্ধধর্মী, পালবংশোদ্ভূত
 নৃপ এক অধিষ্ঠিত রাজসিংহাসনে ।
 জিজ্ঞাসিলা ভূপ ;—

“বিপ্র । কি প্রার্থনা তব ?”

কহিলাম আমি ;—

“মূপ ! দেবী দেশমাতা,
 আসমুদ্র-হিমাচল বক্ষ প্রসারিয়া
 রহেছেন যিনি ল’য়ে আমা সবাকারে,
 বিপন্না, ব্যাকুলা এবে । আমিছে তুরুক
 চির-অধীনতা-পাশে বাঁধিতে তাহারে ।
 ধর্মভেদ, জাতিভেদ ভুলি’ এ সময়
 পশুন সংগ্রাম ক্ষেত্রে । বীর পৃথীরাজ
 স্বদেশ, স্বধর্ম তরে প্রাণ আপনার
 করেছেন যুদ্ধে পণ । হিন্দু, বৌদ্ধ সবে
 হয় যদি সম্মিলিত, কখন (ও) যবন
 না পারিবে প্রবেশিতে আর্য্যাবর্ত মাঝে ।
 কিন্তু যদি পরাজিত হন দিল্লীশ্বর,
 কনোজ, গগধ, বক্ষ না র’বে স্বাধীন ।
 পাষণ-প্রাচীর যদি ভাঙ্গে স্রোতবলে
 বালুবন্ধ সেথা কভু পারে কি রহিতে ?
 বসে যদি তুর্করাজ দিল্লী সিংহাসনে,
 দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধ হ’বে আর্য্য ভূমি ;
 তাই দেশমাতা মোরে দেছেন পাঠায়ে ।”
 হাসিয়া কহিলা রাজা ;—

“বুঝেছি ব্রাহ্মণ !

চৌহানের চর ভূমি ; এসেছ কৌশলে
 সেনা, অর্থ বল মোর করিতে নিয়োগ
 চৌহানের শত্রু জন্মে ; বসিতে আমারে

দিল্লীর সামন্তপদে ; বুথা এ প্রয়াস ।
 নহি অর্কাটীন আগি, নহি অবিবেকী,
 না আছে বিবাদ মোর তুরকের সাথে,
 চৌহানের পক্ষ ল'য়ে, তবে অকারণে,
 কেন খাঁটাইব তায় ? ভুলি নাই মোরা,
 অহিংসক বৌদ্ধ প্রতি যত অত্যাচার
 করিয়াছে হিন্দুগণ । আছে মর্মে গাঁথা
 বোধি-দ্রুম উৎপাটন, পদাঙ্ক ভঞ্জন,
 সজ্জারাম ধবংস । তবে, লজ্জাহীন হ'য়ে,
 বৌদ্ধের সাহায্য হিন্দু চাহে কোন্ মুখে ?
 কেমনে ভুলিলে, বিপ্র ! সজ্জারাম হ'তে
 শম-গুণাবিত মহাস্থবিরে কতই
 ডাকি' তর্কযুদ্ধে তব সমধর্মিগণ,
 শ্রায়, সত্য অতিক্রমি' লভিয়া বিজয়,
 করিয়াছে বিদলিত হস্তিপদতলে,
 বধিয়াছে অঙ্গচ্ছেদি' কুঠার আঘাতে,
 চূর্ণিয়াছে উদুখলে ? অরিলে সে কথা
 ঝরে নেত্রে অশ্রুধারা, বহে তপ্ত শ্বাস ।
 নীরবে সহেছে বৌদ্ধ ; কিন্তু বিধাতার
 শ্রায়দণ্ড, এতদিন, ছিল উত্তোলিত,
 পড়িবে এবার ; তাই আসিছে তুরক ।
 বসে যদি তুর্করাজ দিল্লী-সিংহাসনে,
 কি ক্ষতি মোদের তাহে ? সমান উভয়,
 পার্থক্য না হেরি মোরা তুমারে, তুরকে ।”

আসিলাম আমি দেব । পুণ্য ত্রিবেণী-সঙ্গমে
কহিলাম একদিন ;—

“নমঃ সাধুগণ !

আসিছে তুরক সেনা । এ সঙ্কট কালে
কাতরা ভারত-মাতা ডাকেন সবারে,
দীনা, অশরণা হয়ে । আপনারা সবে
মাতার স্নপুত্র ; নিজ নিজ শিষ্যগণে
বলুন বুঝায়ে, দেশ, ধর্মরক্ষা তরে,
হইবারে সম্মিলিত । বসিলে তুরক
আর্য্যাবর্তে, আর্য্যধর্ম না থাকিবে আর ।”

রহিলা নীরবে সবে । সাধু একজন,
শিরে কুণ্ডলিত জটা, ভস্মাবৃত তনু,
জিজ্ঞাসিলা ডাকি’ মোরে ;—

“কে ভারত-মাতা ?

কা’রে উদ্ধারিতে তুমি কহিছ সবায় ?”
কহিলাম আমি ;—

“তিনি দেবী দেশমাতা ;

যাঁর অঙ্কে আশৈশব লালিত আমরা,
মিলিবে অন্তিমে ভস্ম যাঁর দেহ সনে,
বন্ধজাত-শাস্ত্রসে জীবন মোদের
বাঁচান সতত যিনি, জননী যেমতি
স্তন-দুগ্ধ দানে স্নতে, শুন, সাধুগণ ।
তিনিই ভারত-মাতা ; রক্ষুন তাঁহারে ।”
কহিলেন সাধু ;—

“মোরা সংসার-বিরাগী

সন্ন্যাসী, সম্বন্ধহীন পৃথিবীর সনে ;
কি ক্ষতি মোদের যদি আসে তুর্ক সেনা ?
নাহি আমাদের গৃহ, নাহি ধন, ভূমি,
কি লইবে তা’রা ? মোরা রয়েছি যেমন
রহিব তেমন (ই) । রবে চন্দ্র, সূর্য্য, তারা,
রবে তরুশূল, রবে পর্ব্বত কন্দর ;
তৃপ্ত, স্তব্ধ র’ব তাহে । শিষ্য, ভক্তজনে
রক্তপাতে উত্তেজনা কবির কি হেতু ?
কোন্ পক্ষী সাধু তুমি ? শুন নাই কভু
বন্ধমূল কর্ম্ম ? হয়ে মুক্তি মার্গগামী
লব কি বন্ধন বৃথা কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে ?
রাজ্য, ধন, দারা, পুত্র অনিত্য সকল,
ধর্ম্মমাত্র নিত্য ; ত্যজি’ পূজা, পাঠ, যোগ .
বিসর্জ্জিব নিত্য কিসে অনিত্যের তরে ?”

কহিল সন্মোখি মোরে সাধু অগ্র জন ;—

“মায়া বিজৃম্বিত বিশ্ব ; কেবা রাজা, প্রজা ?
কেবা জেতা, কেবা জিত ? অভিন্ন উভয় ।
মোহবশে মাত্র নর করে ভেদ জ্ঞান,
দ্বৈত অদ্বৈতের মাঝে ; জয়, পরাজয়,
অসত্য, অনিত্য এই জগতের মাঝে,
তুল্য দুই ; না বিচারি’ মুঢ় তব গুরু
বৃথা শিক্ষা-দীক্ষা-দানে বক্ষিয়াছে তোমা’ ।”
ব্যথিল হৃদয় মম । ‘সাধু সাধু’ বলি,

সমবেত্ত সৰ্বজন প্রশংসিলা তাঁরে ;

বুঝি' অভিপ্রায়, আমি লইলু বিদায় ।

বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি' কহিলেন গুরু ;—

“বৃথা পাঠ, বৃথা পূজা, বৃথা জপ, ধ্যান,

মানব মানবহিতে উদাসীন যদি ।

অজ্ঞতার হীনতার দুর্ভেদ্য তিমিরে

কোটি কোটি নর, নারী সমাচ্ছন্ন যথা,

সে দেশে কি আত্মত্যাগ মত্ত মাত্র লয়ে

নিষ্কর্মা রহিবে জ্ঞানী ? নিজে নারায়ণ,

অবতারি' নররূপে, ধর্মরক্ষা তরে,

প্রচারিলা কর্মযোগ যে দেশের মাঝে,

প্রণোদিলা মহারণে বীর ধনঞ্জয়ে,

হায় রে দুর্ভাগ্য ! সেথা নাহি বুঝে লোক

কর্ম, ধর্ম কি সম্বন্ধ ! থাকে ধর্ম যদি

পূজা পাঠে, আছে ধর্ম রূপে প্রাণদানে

স্বদেশ, স্বজাতি তরে । বিধির আদেশে

করে কর্ম নর, তবে, কোন্ কর্ম হীন ?

বাজা পালে প্রজা, ভূমি কর্ষে কৃষিজন ।

যুদ্ধে যোদ্ধা, মলাকর্ষী বহে মলভার ;

দেখ ভাবি' কা'র কর্ম পারো বর্জিবারে ।

হ'ক গুরু, হ'ক লবু, যে কর্মের মাঝে

জীবের কল্যাণ, তাই বিধাতৃ-বিহিত ;

তা'ই ধর্মমূল । হায় ! অনিত্য সংসার,

এ অসত্য, প্রচারিত নকি অশুভমাগে ;

অস্থি, মজ্জা মাঝে পশি' ভারতবাসীর,
 হরিতেছে গল্পযত্ন ! এই যে সংসার,—
 রূপ রস গন্ধগন্ধী এই বস্তুগতী,
 বিধির অপূৰ্ণ সৃষ্টি, পূর্ণ জীব, জড়ে ;
 স্নেহে পুত, প্রেমে স্নিগ্ধ, সমৃদ্ধ সংঘমে ;
 নহে মায়া মরীচিকা—পুণ্য কৰ্মভূমি ।
 লভি' কৰ্মোদ্ভিদ নব, বিধির বিধানে,
 প্রেরিত এ কৰ্মভূমে কৰ্ম সাধিবারে ;
 বহে বন্ধমূল কৰ্ম ; কৰ্ম মুক্তিপ্রসূ ।
 আসি' এ সংসার মাঝে, যুগ যুগান্তের
 হ'য়ে কৰ্মফলভোগী, উচিত কি কভু
 ধৰ্ম্মালোকে কৰ্মত্যাগ ? দেখ বিচারিয়া
 ভ্রষ্ট ধৰ্ম্ম, লুপ্ত বিধি এ ভারত হ'তে ;
 আছে মাত্র স্বাধীনতা ; বীর্যের প্রশস্তী,
 গল্পযত্ন সহচরী । কু-শিক্ষার বশে,
 কৰ্মে দোষারোপ করি', তা'ও যার যদি
 কি আর রহিবে তবে ? ভ্রান্ত আৰ্য্যসূত,
 বুঝিল না মোহবশে জাতি-পরিণাম,
 তাই হেন উদাসীন । কি কহিব আর ?
 বল, এবে, অণু কোথা গিয়াছিলে তুমি ।”
 নিবেদিল শিষ্য ;—

“আমি দেবের আদেশে,
 ত্যজি আৰ্য্যবৰ্ত্ত, লজ্জি' বিক্ষাচল ভূমি,
 প্রবেশিছ দাক্ষিণাত্যে । কি বলিব, দেব !

শতগুণ ঔদাসীন্য হেরিলু তথায় ।
 তুর্কের বিক্রম, বল, হিন্দুধর্ম-দেষ
 না ভাবে, না বুঝে লোক । হগেছে বিস্মৃত
 সোমনাথ-ধ্বংস । গর্বের কহে কোন জন ;—
 ‘কা’র শক্তি বিদ্যাগিরি পারে লজ্জাবারে ?
 মরিবে তুরক যদি প্রবেশে এ দেশে’ ।
 কেহ কহে ;—‘জাতিগর্বের আখ্যাবর্ত্তবাসী
 অবজ্ঞা, উপেক্ষা করে দাক্ষিণাত্যজনে ;
 ‘কিঙ্কিধ্যানিবাসী বলি’ করে উপহাস ।
 যদি হয় নিগৃহীত তুরকের করে
 কি ক্ষতি মোদের তাহে ? ভাঙ্গুক গরব ।’
 এইরূপে নানা জন কহে নানা কথা ;
 উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য, পূর্ব, পশ্চিম
 সর্বদেশে সমভাব ; উদাসীন সবে ।
 স্বদেশ বলিলে বুঝে গ্রাম আপনার ;
 স্বজাতি বলিলে বুঝে নিজ সম্প্রদায় ;
 সীমাবদ্ধ ভক্তি, প্রেম এ ছ’এর মাঝে ;
 ভারত সন্তান বলি’ নাহি বুঝে কেহ ।
 রাজা ভাবে নিজ রাজ্য ; প্রজা ভাবে নিজ
 শাস্ত্রক্ষেত্র ; ভাবে শ্রেষ্ঠী নিজ ব্যবসায় ।
 আসমুদ্র-হিমাচল স্বদেশ সবার,
 আচঙাল-দ্বিজ সবে স্বধর্মী, স্বজাতি,
 একের বিশ্ববংসে হ’বে ধ্বংস সকলের,
 সে কথা বারেক কা’বু(ও) না পড়ে স্মরণে ।

দেশমাতা শব্দ আমি কহিতাম যবে,
 নির্ঝাঁক, বিস্মিত লোক রহিত চাহিয়া ।
 একদিকে তুরকের সঙ্কল কঠোর,
 ধর্মোৎসাহ, সুবিপুল যুদ্ধ-আয়োজন,
 অন্য দিকে আমাদের শৈথিল্য, জড়তা,
 ধর্মালস্য, অপকর্ষ সময় প্রলয়
 দেখি', শুনি' সদা মোর শঙ্কা হয় মনে,
 অনিবার্য দাস্ত, দৈন্ত ভারত-মাতার ।”
 সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি' কহিলেন গুরু ;—
 “বুঝিলাম, বৎস ! দৈববলে প্রতিকূল ।
 যবনের আয়োজনে নাহি ছিল ভয় ;
 ভয় এই দেশব্যাপী ঐদাস্তে হিন্দুর ।”

একাদশ অধ্যায় ।

নিপীড়িতের নিদ্রাভঙ্গ ।

যুগ যুগান্তের নিপীড়িত, পদদলিত, অবজ্ঞাত শ্রেণীর মর্মান্বল হইতে এক অভিনব আৰ্ত্তনাদ উঠিয়াছে—“আমরা আর হীনের মত, অধমের মত সকলের পদতলে পড়িয়া থাকিব না” । সে মর্মান্বিত আৰ্ত্তনাদ মানবের কি কথা—দিক্দিগন্ত কাঁপাইয়া প্রেমময় ব্রহ্মাণ্ডপতিব স্বর্গ সিংহাসন পর্য্যন্ত নড়াইয়া দিয়াছে, সে তপ্ত বক্ষের করুণ আৰ্ত্তনাদ বিশ্বশ্রষ্টার হৃদয় টলাইয়া তুলিয়াছে, সে তপ্ত অশ্রু স্রীহরির প্রাণ গলাইয়া দিয়াছে । যাহারা স্মরণ-তীত কাল হইতে—তথা কথিত অভিজাতবর্গের ও উন্নত শ্রেণীর শ্রীচরণ-পাশাণযন্ত্রের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া পশুর মত পড়িয়া থাকিত ; নীরবে তপ্ত বক্ষের উষ্ণ অশ্রুধারায় মুখ বুক ভাসাইয়া দিত, নিজ নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বিধাতাপুরুষের কেবলই নিন্দা করিত, নব্যযুগের প্রাণ স্পন্দনে, নবীনযুগের সঞ্জীবন সুধাপূর্ণ মলয়ানীলের সুখস্পর্শে তাহারা আজ অত্যাচারী হিন্দু সমাজের ভিত্তিমূল কাঁপাইয়া তুলিয়াছে । বিংশ শতাব্দীর আগরণের আহ্বান, চৈতন্য লাভের বার্ত্তা আজ তাহাদেরও কর্ণমূলে প্রবেশ করিয়াছে । তুই ছোট আমি বড়, তুই নীচ আমি মহৎ, তুই অধম আমি উত্তম, তুই ক্ষুদ্র আমি বৃহৎ, তুই অম্পৃশ্য আমি পবিত্র, তুই শূদ্র আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া এতদিন যাহাদিগকে অবিচার ও অত্যাচারে নিপীড়িত করিয়া পদতলে দলিত করিয়াছি, বর্ণাশ্রমধর্ম ও চতুর্ভুজ-বিভাগের ভুয়া কথার প্রলোভনে এতদিন যাহাদিগকে পোষা কুকুরের মত পায়ের তলে দাঁবাইয়া রাখিয়াছি, ধর্মের নামে, শাস্ত্রের নামে, ঋষিগণের নামে, এমন কি পুণ্য প্রেমময় ভগবানের নামে পর্য্যন্ত নিজেরা

শাস্ত্র ও শ্লোক রচনা করিয়া অত্যাচারে অত্যাচারে যাহাদিগকে চলমান শ্মশান সদৃশ করিয়া তুলিয়াছি—আজ তাহারা সমুদয় অত্যাচার অবিচার বুঝিতে পারিয়া—ভগবৎ কৃপাবলে বলীয়ান হইয়া—জগতের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। কার সাধ্য ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ইহার গতিরোধ করিতে পারে। বেদ বেদান্ত পুরাণ সংহিতার নামে আমরা যাহাদিগকে পশুচিত অত্যাচারে জর্জরিত করিয়াছি—আজ তাহারা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া নিজেরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃত রহস্য উদ্ভাবনে সক্ষম হইয়াছে, কে আর তাহাদিগকে শাস্ত্রের কুটার্থ করিয়া অন্ধতমসায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে সক্ষম। সমাজ জননীর সমুদয় সন্তান, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মুর্থ, উত্তম অধম নির্বিশেষে চতুর্দিক হইতে—সমাজের প্রতি কেন্দ্র হইতে—প্রতি অন্ধকার কোণ হইতে—নূতন নূতন অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষায়, নব নব শক্তি সঞ্চয়ের বাসনায়, নূতন নূতন আশার উদ্দীপনায় উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং যেখানেই বাধা পাইতেছে সাগরাভিমুখিনী তটিনীর স্রাব সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া ভীমবলে জাগিয়া উঠিতেছে। বাধা যত গুরুতর হইতেছে জাগিবার আকাঙ্ক্ষা, উত্থানের কাগনা ততই বলবতী হইতেছে। এ বিশ্বই ভগবানের পবিত্র লীলাক্ষেত্র। এখানে অবিচার অত্যাচার অশ্রায় অসত্য বত কাল চলিতে পারে? তাই অত্যাচারী ব্রাহ্মণ্যকরসজাত অত্যাচারী ক্ষত্রিয় রাজ্য অকালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। যুগধর্ম অঘটন ঘটাইতে চিরদিনই সিদ্ধহস্ত। এই যে অক্লান্ত শ্রেণীর জাগরণ, ইহাও যুগধর্মের অন্ততম কারণ। এই যে সমাজব্যাপী আন্দোলন—এই যে সমাজব্যাপী আলোড়ন, আলোচনা—যুগধর্মই ইহার মূলীভূত কারণ। সুতরাং ইহাকে আর তাচ্ছিল্য করিবার অথবা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই। বারুদের ক্ষণস্থায়ী আগুন বলিয়া ইহাকে আর ধিড়প করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। ইহা অন্ধকার রজনীর ক্ষণ বিদ্যুৎঝলক নহে। বসন্ত ঋতুর আগমনে যখন মলয় মারাত্ত মারা

দেশের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়—তখন যে শুধু ঐশ্বর্য্যশালী ধনবানের কুসুম উদ্যানের পুষ্প তরু গুল্ম লতামঞ্জরীই মঞ্জরিত হইয়া উঠে—তাহা নহে—ছাই ভস্ম শবাস্থিপূর্ণ শাশানেও তখনও কুসুমগুচ্ছ স্তবকে স্তবকে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে এবং নানাবিধ জঞ্জাল পরিপূর্ণ ঘৃণিত আস্তাকুড়েও তরু গুল্ম লতা পল্লব গজাইয়া উঠে । প্রকৃতির ইহাই সনাতন নিয়ম । ইহার বিরুদ্ধে কোন শক্তিই কার্য্য করিতে সক্ষম নহে । যে উন্নতিভাভের আকাঙ্ক্ষায় মানব উন্নাস্তের মত জ্ঞান বিজ্ঞান মথিত করিয়া মারা বিশ্ব ছুটিয়া বেড়াইতেছেন,—পরিব্রাজকরূপে কত দেশ-দেশান্তর পাহাড় পর্ব্বত সাগর মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ধরিত্রী দেবীকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছেন—সে আকাঙ্ক্ষা সে উচ্চাভিলাষ কি অন্ত্যন্ত ভ্রাতৃবর্গের হৃদয়ে নব চেতনার সঞ্চার না করিয়া থাকিতে পারে ? উন্নতি ও জাগরণের সেই অমৃতস্রাবী বাঁশরীর স্বর দীন দরিদ্র অনাথ কাল্পাণ অক্ষম দুর্ব্বলের ভগ্ন কুটীর ছায়ায়ও যে আসিয়া পড়িয়াছে । সুতরাং ঐ যে দরিদ্র অজ্ঞ কৃষক উন্নতির জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—নীরবে অত্যাচার সহিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে—ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই । ইহাতে তাহাদিগকে দোষ দিতে পার না,—অথবা “চাষা বেটারা কি সব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে” বলিয়া বিক্রপ করা উচিত নয় । ইহা এ যুগের যুগমাহাত্ম্য । তুমি আমি নগণ্য রাম শ্রাম,—২।৪ জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা ১০।২০ জন অত্যাচারী জমিদার ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াও কিছু করিতে পারিবে না—পারিতেছে না । এ উত্থানের—এ জাগরণের পশ্চাতে অলক্ষ্য প্রেমময়ের ইঙ্গিত কার্য্য করিতেছে । মানুষের কি সাধ্য ভগবানের কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে পারে ? অনন্ত শক্তিশালী বিশ্ব সত্ত্বাটের স্নেহানীষ ধারা নিয়ত যাহাদিগের মাথার উপর বর্ষিত হইতেছে—শ্রায়পরায়ণ ইংরেজরাজ যাহাদিগকে তুলিবার জন্ত সর্ব্বদা যত্নবান্ আছেন—ভারতের সমুদয় জননেতা যাহাদিগকে হাত

ধরিয়া তুলিবার জন্ত কত ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, হৃদয়হীন গর্বিত সমাজপতি তাহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কি করিতে পারিবে ? বৈশাখের দারুণ ঝড়ে যেমন শুষ্ক পত্র উড়িয়া যায়—বিরুদ্ধবাদিগণের শক্তিহীন উচ্চ চীৎকার ধ্বনিও তেমনি অনন্ত আকাশে মিলিয়া যাইতেছে ;—কোনই অনিষ্ট করিতে পারিতেছে না ।

আমাদের এখন নিতান্ত কর্তব্য—এই নব জাগ্রত উন্নতি তৃষ্ণা বা শক্তি সামর্থ্যকে স্নেহের চক্ষে দর্শন করিয়া ধাতু দুর্লা দ্বারা অভিনন্দিত করা—যুগযুগান্তের ঘৃণা বিদ্বেষ অপ্রীতি অনৈক্য হৃদয় হইতে ভ্রাতৃত্বের পুত গন্ধাকিনী ধারায় মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া বাহুপাশে বক্ষে টানিয়া লওয়া, দূরে পরিত্যক্ত ভ্রাতৃগণকে আপনার করিয়া লওয়া ; এই ভদ্র ইতর, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচের মিলনের উপরই সমাজ ও দেশের সমুদয় কল্যাণ নির্ভর করিতেছে । এতদ্ব্যতীত আমাদের জাতীয় দুর্গতির অবসানের অন্য পথ নাই ।

বহুশত বৎসর হইতে আমরা—অভিজাতবর্গ নানাপ্রকারে এই মহৎ প্রাণ নিরক্ষর শ্রমজীবী ও চাষা নামক বিশ্বের ভরণপোষণকারী, সৃষ্টিরক্ষক, সৃষ্টিপালক বিরাট মানবমণ্ডলীকে “ছোটলোক” বলিয়া পদতলে দলিত করিয়া—দাবাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম । তাই সেই সর্বশক্ত্যাধার ভগবানের বিরাট মূর্ত্তি জনসাধারণ কারাকক্ষে অবস্থিত শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তিহীন সিংহের মত আমাদের পদতলে থাকিয়া আমাদের চৈদ্রিতে আমাদের পদসেবা করিয়াছে, আমাদের জাকুটি জ্রভঙ্গে পরিচালিত হইয়াছে—এতদিন তাহারা প্রকৃত মানুষের স্থায় জগতের সমক্ষে মাথা তুলিতে সমর্থ হয় নাই । অবাধ বিদ্যা প্রচারের মহিমায় আজ তাহাদের সমুদয় দৌর্বল্য, সমুদয় দৈন্ত্য অবসাদ খুচিয়া গিয়াছে । ইংরাজ রাজত্বে, সার্বজনীন শিক্ষা প্রচারে তাহাদের যুগযুগান্তের মালিষ্ঠ মুছিয়া গিয়াছে । আশায় তাহাদের বক্ষঃস্থল

প্রসারিত হইয়া উঠিয়াছে—হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছে । বিদ্যা শিক্ষারূপ গুরুতর অপরাধে জিহ্বাচ্ছেদ, শরীর ভেদের “দয়াল দণ্ডের” অবসান হইয়াছে । কার সাধ্য এই উন্নতি স্রোত বাধা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখে । রাজ আইনে শিক্ষার স্রোত বন্ধ করিয়া মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির হস্তে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার দরুণই ভারতের সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে । দেশশুদ্ধ লোক আইনের বলে মূর্থ থাকিয়া গেল—কয়েকজন মাত্র ব্রাহ্মণ অজ্ঞানাজ্ঞর ভারতগগনে জোনাকী পোকার স্থায় মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল । ভারতবর্ষের পতনের ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ । জ্ঞান বিস্তারের উপরই এবং জ্ঞান বৃদ্ধিতেই মানুষের সর্বপ্রকার উন্নতি । জ্ঞানের উপরই মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উন্নতি নির্ভর করে । প্রত্যেক ব্যক্তি বা ব্যষ্টি উন্নত হইলেই সমষ্টি বা সমগ্র দেশবাসী উন্নত হইতে পারে । অবজ্ঞাত প্রেীড়িত জাতির উত্থানও এই শিক্ষা ও জ্ঞানলাভের উপর নির্ভর করিতেছে ।

সমগ্র হিন্দুস্থানে সত্য, ধর্মের পবিত্র আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে । মিথ্যা ও শঠতার পাপাক্রকার আর কতকাল তিষ্ঠিতে পারে ? আর মিথ্যা প্রতারণায় কতকাল লোকের চক্ষু ঢাকিয়া রাখা চলে ? ছুঃখের অমানিশা রজনী প্রভাত হইয়াছে । সাহ্য, প্রেম ও শিক্ষার বিজয় পতাকা লইয়া রাজা রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দ আজ প্রভাতের কলকণ্ঠ বিহঙ্গের কাকলী ধ্বনির মধ্যে প্রতি গৃহ দ্বারে সমাগত । পরম হিতৈষীরূপে অতিথী-দ্বয়কে বরণ ডালা সাজাইয়া ধাতু দুর্বাদলে গাল্য চন্দনে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়া লও । হে বিরাট—হে সমাজরূপী হিরণ্যগর্ভ ! আর কতকাল ছুঃখ ছুঃখের ক্ষীরোদ সাগরে যোগনিদ্রারূপ মোহনিদ্রায় অচেতন থাকিবে । ঐ যে তোমার নাভিকমলোৎপন্ন স্বকর্মোত্তর মধু কৈটভরূপ অবিদ্যা ও অপ্রেম অসুর সমাজ দেহরূপী কমলযোনিীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে । উঠ উঠ

নিদ্রিত বিরাট—, আর কতকাল স্থঃখ সাগরে মোহনিদ্রায় ঘুমাইয়া থাকিবে । জাগ, উঠ, অনন্ত সম্মুখ সম্মুখানরিত দৃষ্টি লইয়া সম্মুখে অগ্র সর হও । হিংসায় বিদ্রোহ, স্বার্থপরতা ও অপ্রেমে হিন্দুসমাজ গরিতে বসিয়াছে, ভুবিতে বসিয়াছে । অভিনব আদর্শ লইয়া সমাজ সমক্ষে উপনীত হও দেখি ! তোমাদের দেখাদেখি এ পতিত জাতির হিংসা বিদ্রোহের দারুণ বহি—প্রেমের বারিধারায় নির্ধাপিত হউক । উথিষ্ঠত জাগ্রত । উঠ জাগ । তোমাদের তুলিতে ও উঠাইতে কত কত মহাপ্রাণ নরনারীর উদ্ভব হইয়াছে । প্রেমাবতার শ্যামসিংহ ও শ্রীচৈতন্যদেবের পদরঞ্জে এ দেশের ধূলিকণা পর্য্যন্ত পবিত্র হইয়াছে । তোমরা উঠ, জাগ, মানুষ হও—প্রেমিক হও ইহাই তাহাদিগের প্রার্থনা ও কামনা ছিল । প্রার্থনা পরিপূরণে বিমুখ করিও না । বিংশতি কোটি নরনারী পরস্পর প্রেম মন্দাকিনী নীরে স্নান করিয়া জাতীয় কল্যাণসাধন যজ্ঞে হাত ধরাধরি করিয়া ব্রতী হও । সহস্র যুবক ত্যাগ ব্রত গ্রহণ করিয়া বিংশতি কোটি নরনারীর কল্যাণ সাধনে তৎপর হও । সমাজসেবা ভগবৎ সেবারই নামান্তর । তোমাদের আদর্শ সমাজের জড়তা, অবনাদ অপসারিত হউক । সমাজের গতি পরিবর্তিত হইয়া যাউক । প্রতি গৃহ হইতে দেব শিশুসকল, আবিভূত হউক । নন্দনের পারিজাত পুষ্প তোমাদের গৃহে গৃহে ফুটিয়া উঠুক । প্রেম-গঙ্গা তোমাদের গৃহ পরিষ্কৃত শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া দিক্ । সকলো একপ্রাণ, একমন হও । করিসংকীর্ণনের মধুর বাজারে প্রতি সন্ধ্যায় গ্রাম গ্রামান্তর মুখরিত হইয়া উঠুক । সমুদয় অপ্রেম মনোমোহিনী—সংকীর্ণন বশ্যই ভাসিয়া যাইবে । নিজদিগকে কখনও হীন, অপদার্থ ও দুর্বল ভাবিও না । বিশ্বসম্রাটের সন্তান কেন মরার মত, অধমের মত সকলের পদতলে পড়িয়া থাকিবে ? তোমার অপমানে যে পিতারই অপমান । ভয় কি ? বল বল—

“যিনি মহারাজা বিশ্ব ঋষি প্রজা জাননারে মন আমি পুত্র তাঁর।

সামান্য ত নহি রাজপুত্র হই, পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার ॥

আমার পিতার রাজ্য সমুদয়, আমাকে কেবা দিতে পারে ভয়,

এ ভব সংসার পিতার পরিবার পিতার রাজ সিংহাসন হৃদয় আমার ॥

পিতার ভালবাসায় সবে ভালবাসে বৃক্ষগণ নানা ফল ফুলে তোষে

বায়ু বহে গায়, জলদ জল ধোয়, (তাইতে) রবি শশি নাশে অন্ধকার ॥

বিশ্ব সম্রাটের পুত্রের একি জড়তা, একি ভ্রান্তি। চেয়ে দেখ জ্ঞান বিজ্ঞান জগতে কি যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে? এখনও কি তোমাদের নিদ্রা লাজে? শত শত শতাব্দীর অজ্ঞতার মধ্য হইতে নিপীড়িত, পদাঘাতে জর্জরিত, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারী যুবা বৃদ্ধ এমন কি অন্ধ খঞ্জ, মুক বধির পর্য্যন্ত বিধাতার অলক্ষ্য আদেশে—মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমাদের কি এখনও জড়তা শোভা পায়? শীত ধাতুর দারুণ হিমালী-সঙ্কচিত শুষ্ক-বিটপী শ্রেণী যেমন বসন্তের মলয়-হিল্লোলে নবজীবন লাভ করিয়া সতেজ হইয়া উঠে, যুগ যুগান্তের অত্যাচার নিষ্পেষিত, বিগুস্ত প্রাণও তেমনি বিংশ শতাব্দীর নব চেতনার সঞ্জীবন-স্পর্শে নব জীবন লাভ করিয়া সতেজে বক্ষ বিক্ষারিত করিয়া জগতের সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। পদাহত ধূলিকণা পর্য্যন্ত যখন অত্যাচারীর শিরোদেশে মস্তকোপরি উত্থিত হইয়া থাকে, তখন বিধাতার অপূর্ণ সৃষ্টি মানব সম্ভ্রান চিরকাল অবিচার অত্যাচার সহিয়া সহিয়া মড়ার মত পড়িয়া থাকিবে ইহা কি কখন সম্ভব? হিন্দু-সমাজের অবজ্ঞাত শ্রেণীর কি কথা, এই নব জাগরণের যুগে আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত নব জীবন লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। জাগরণের চিহ্ন সারা বিশ্বজগৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মাছুষের কি কথা তরু, গুল্মলতা, পাতা, মাটি, পাথর পর্য্যন্ত এ জাগরণে জাগিয়া উঠিয়াছে। সমাজের কেন্দ্রে কেন্দ্রে, পল্লীর গৃহে গৃহে, রাজবাটে গোচারণ মাঠ

শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্ত মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়াছে । সে শঙ্খের মধুর শব্দে কোটি কোটি প্রকৃতিপুঞ্জ — কুন্তকর্ণের মহা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া চক্ষু মেলিয়া তাকাইয়াছে । কেহই আর নিদ্রায় নাই । বৃন্দা বিপিন বিহারী শ্যামল সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের ভুবন মনোগোহন বাঁশরীর তানে মর্ত বৃন্দাবনের ব্রজাঙ্গনাগণ যেমন করিয়া শরতের চাঁদিমা রজনীতে রাস রসোৎসবে নিভৃত নিকুঞ্জে সমবেত হইয়াছিলেন,—দীন বৎসল করুণাময়ের অলক্ষ্য বংশীনাदे এবার তেমনি নিপীড়িত প্রকৃতিপুঞ্জ সাম্যমৈত্রী ও জাগরণের পবিত্র পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইয়াছে । কার সাধ্য ইহাদের গতিরোধ করে । আজ দেশ শুদ্ধ লোকে সকলেই আপন আপন গ্রাঘ্য অধিকার কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবার জন্ত একত্র দলবদ্ধ হইয়া গভীর আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়াছে । কার সাধ্য এ আন্দোলনে বাধা দান করিয়া ইহাদিগকে দাবাইয়া রাখে । কে এমন ভ্রান্ত শ্রীভগবানের কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হয় । এ আন্দোলন কখনও ব্যর্থ হইবার নহে । কোন কালে কোন দেশে কখনও হয় নাই । এ আন্দোলন কখনও নিরর্থক উত্থিত হয় নাই, নিরর্থক হইবার নহে । এ আন্দোলন মূলে দীন বৎসল নারায়ণের অদৃশ্য সংক্লেত দেদীপ্যমান বলিয়া মনস্বীগণ উপলব্ধি করিয়াছেন ।

সমুদয় অবজ্ঞাত সমাজ শ্রীভগবানের আদেশে গা বাড়ী দিয়া উঠিবার আয়োজন করিয়াছে । ভগবানের কৃপাশক্তি বা করুণার ইঙ্গিত না পাইলে সমাজের চির অবজ্ঞাত চির ঘণাজাতি সকল এমন করিয়া হিন্দুসমাজ শরীর, বর্ণাশ্রম ধর্মের বিশাল অট্টালিকা কাঁপাইতে সমর্থ হইত না । উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে অধঃ উর্ধ্বে সমুদয় দিকে শ্রীহরির কল্যাণময়ী বাণী উত্থিত হইয়াছে । সে কল্যাণ-বাণী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বনিত করিয়া— মুখরিত করিয়া নিপীড়িত হৃদয়ের অন্তর তারেও বাজিয়া উঠিয়াছে ।

তোমাদের মুষ্টিমেয় জন কয়েকের ক্ষীণকণ্ঠের চীৎকার ধ্বনি, “ধর্ম গেল, ধর্ম গেল” রব মোটেই সেখানে পছন্দিবার উপায় নাই। কোটি কোটি জন সংখ্যার তুলনায় জনকয়েক অত্যাচারী অভিজাত ব্যক্তি বিধাতা পুরুষের কার্যের বিরুদ্ধে জনর্থক দণ্ডায়মান হইয়া দণ্ডা চীৎকার করিয়া শক্তি ক্ষয় করিয়া মরিতেছে। ঐ যে বৈদ্য ব্রাহ্মণ হইবার জন্ত—নমঃ-শুদ্ধ দ্বিজ হইবার জন্ত, কায়স্থ, রাজবংশী পৌর, বাণমাল, পৌদ প্রমুখ জাতিসমূহ কেহবা ক্ষত্রিয়, কেহবা পদারাজ, কেহ বা বল্লভ ব্রাহ্ম ক্ষত্রিয় কেহবা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় হইবার জন্ত, ঐ যে তন্তুবায় কৰ্মকার, বারুজীবো, সুবর্ণ বণিক, সচ্চাষি, মাহিষ্য, সৎগোপ, সাহা, কপালী, পাটনৌ, বৈশ্য হইবার জন্ত জড়প্রায় সমাজ শরীর, কম্পায়িত করিয়া গভীর আন্দোলন তুলিয়াছে ইহা কি মানুষের চেষ্টায়—মানুষের প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া মনে কর? ভুল, তোমাদের বড় ভুল। ইহা মানুষের শক্তিতে মানুষের অনুপ্রবেশ কদাচ সম্ভব নহে। ইহার মূলে ভগবৎ প্রেবণা—ভগবৎ ক্রিয়া বিদ্যমান! শত শত শতাব্দীর অবিচার ও অত্যাচারের ফলে, শত শত শতাব্দীর পেষণ ও নির্যাতনের ফলে, শত শত শতাব্দীর বঞ্চনা প্রতারণার ফলে, শত শত শতাব্দীর পীড়ন ও পদা-ঘাতের ফলে—আজি এই নব জাগরণের সূত্রপাত—নবজীবনের আবির্ভাব,—নবচেতনার উদ্ভব। এই অবিচার ও অত্যাচার দমনের প্রতিকার পস্থা দীনবৎসল—ভগবানই প্রতি মানব হৃদয়ে জাগাইয়া দিয়াছেন। শ্রীহরির স্নেহবিজড়িত প্রেমমাথা আহ্বান বাণী, জাগরণ ধ্বনি, তাহাদিগের কণ্ঠমূলে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। মানুষের কি সাধ্য—সমাজপতির কি শক্তি—ইহার গতিরোধ করিতে পারে? যুনি ধ্বির নাম লইয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ অত্যাচারী ব্রাহ্মণ, লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয় রাজা ইহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া ছুই পা দিয়া দলন করিয়াছে, ইহাদের ধন অর্থ,

কুসংস্কার ও অজ্ঞতায় আচ্ছাদিত করিয়া মনের স্মৃতি যথেষ্টরূপে শোষণ করিয়াছে, মনের আনন্দে স্বার্থপরতার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া ইহাদিগের হৃদয় রুধির, বক্ষের শোণিত, স্মৃতি সংহিতাদি শাঙ্গের দোহাই দিয়া মনের স্মৃতি পান করিয়াছে । মানবরূপী নারায়ণের জীবন্ত প্রতিমাকে “চলমান শাসান”, “জঘন্য প্রভব হি সঃ” বলিয়া অভিহিত করিয়াছে । বেদান্তের যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ সাগরের তরঙ্গস্বরূপ, চিৎস্বরূপ ঈশ্বরের কিরণকণা, প্রজাপতি ব্রহ্মার সন্তান—নারায়ণের যাহারা জীবন্ত বিভূতি—এমন সব লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানব সন্তানকে হীন বৈশ্য শূদ্র—স্বপচ চণ্ডাল নামে নির্দেশ করিয়া তাহাদিগকে ছই পা দিয়া দলন করা হইয়াছে ।, অত্যাচারিগণ ভুলিয়া গিয়াছিল তাহারা কি মহাপাপব্রতে ব্রতী হইয়া অনন্ত নরকেব পথ পরিষ্কার করিতেছে । জানিত না এ পাপের কি ভীষণ প্রায়শ্চিত্ত, কি কঠোর দণ্ড ভবিষ্যতের জন্ত প্রস্তুত হইতেছে । প্রায় সহস্র বর্ষ হইল সেই প্রায়শ্চিত্ত চলিয়াছে । যে অত্যাচারের প্রতিকার কল্পে নরনারায়ণ সারথীবশে ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া কৃষ্ণগতপ্রাণ ভিখারী পাণ্ডবগণের প্রতি দারুণ অত্যাচারী দুর্হ্যোধন দুঃশাসনাদির বুকের রক্তে ধরিত্রীর তর্পণ করিয়াছিলেন, সত্যে নরহরিরূপে আবির্ভূত হইয়া হরিদেবী ভক্তদ্রোহী হিরণ্যকশিপুর বক্ষ-বিদারণ পূর্বক ভক্তচূড়ামণি শিশু প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, বামনরূপে যিনি বাসববিজয়ী বলীর দর্প চূর্ণ করিয়া তাহাকে পাতালে নিক্ষেপিত করিয়াছিলেন, অত্যাচারী ক্ষত্রিয়কুলের মদগর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্ত যিনি পরশুরামরূপে কুঠার হস্তে ধরাতলে আগমন পূর্বক বহুবার ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়াছিলেন, ধর্মের নামে, যাগ যজ্ঞের নামে যখন লক্ষ লক্ষ অনাথ মানব, পশুপক্ষী, ছাগ, মেঘ মহিষের পবিত্র রক্তে দেবমন্দির সঙ্কল—যজ্ঞভূমিসমূহ রঞ্জিত হইয়া

ভূত প্রেত পিশাচের লীলা নিকেতন হইয়া উঠিয়াছিল, যখন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অবোলা বাকশক্তিবিশীন বলির পশুর প্রাণের বেদনা—হৃদয়ের অক্ষুট আৰ্ত্তনাদ নিবারণকল্পে যিনি রাজপুত্র বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া “অহিংসা পরম ধর্মের” বিজয়পতাকা ভারত গগনে উড্ডীন করিয়াছিলেন, এবং যে ভগবান্ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নরনারীর কাতর ক্রন্দনে স্থির থাকিতে না পারিয়া ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীগোরাঙ্গ চন্দ্র রূপে শ্রীনবদ্বীপে শচীগর্ভ হৃদয় দিক্রুতে উদয় হইয়া জগতে নবযুগের সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন—তিনিই আজ জাতিকুল মদাক্ষ অভিজাতবর্গের ঘৃণা ও অবমাননা, উচ্চ জাতিগণের অত্যাচার ও অবিচার, নির্যাতন ও লাঞ্ছনার করাল কবল হইতে তাঁহার আত্মা হইতে প্রিয়তম দীনদরিদ্র, কাঙ্গাল বুভুক্ষিত, অধম অস্পৃশ্য অনাথ আৰ্ত্ত সন্তানগণের উদ্ধারের জন্য প্রেচ্ছনভাবে এই সামাজিক আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছেন। কার সাধ্য ভগবৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়! ভগবানের এই জীব উদ্ধার কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হওয়া উন্মাদ ব্যতীত অন্নের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। সমাজপতির সম্পূর্ণ অযোগ্য, স্বজাতিপ্রেমবর্জিত অভিজাতগণ মনে করে না—অত্যাচারীর অত্যাচার দমনের নিমিত্ত উপরে একজন আছেন। তিনি দুর্বলের বল, অনাথের নাথ, তিনি কাঙ্গালের সখা, পতিতের পাবন, তিনি দীন দরিদ্রের চির আশ্রয়, চিরসুহৃদ। তাঁহাকে ফাঁকি দিবার উপায় নাই। তিনি অনেক সহ্য করেন কিন্তু সেই অত্যাচারের মাত্রা বা সীমা দারুণ ভাবে লঙ্ঘিত হইলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না। যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া দীন দরিদ্র ধার্মিক সজ্জনগণের রক্ষার জন্য অত্যাচারীগণের পাপ মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন। কখন বা নিজে আইসেন, কখন বা স্বীয় অংশ প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করেন। এবার ভগবান্ সাধারণ চক্ষুর বিষণ্ণীভূত জড়দেহে নরবপু হইয়া আবির্ভূত

না হইয়া তথা কথিত অবজ্ঞাত দীন দরিদ্র নিয়শ্রেণীস্থ সমুদয় নরনারীর অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আসিয়া নবজাগরণ রূপে—নূতন চৈতন্যশক্তিরূপে আবির্ভূত ও প্রকাশিত হইয়াছেন ।

অবজ্ঞাত নিয়শ্রেণীর মর্গভেদী কাতর আৰ্ত্তনাদে ভগবানের স্বর্গ সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিয়াছিল ; তাই তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাদের অবিরল নয়নজল মুছাইবার জন্ত তিনি এবার কোটি কোটি অংশে বিভক্ত হইয়া নিপীড়িত পদদলিত অগ্যাচারে জর্জরিত বুভুক্ষিত জনগণের হৃদয়ের নবচৈতন্যরূপে, নব জাগরণের বাসনা ও আকাজক্ষারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন । আর কাল বিলম্ব না করিয়া সাংগানে,—বেদমন্ত্রে, নানাবিধ মাহলিক স্তোত্রে ও বন্দনায়—জয় ও শান্তি উচ্চারণপূর্বক বিংশতি কোটি নরনারী তাঁহার সম্বন্ধনা করুন ।

সহস্র সহস্র বৎসর হইতে এমন কি স্মরণাতীত কাল হইতে এই সব অবজ্ঞাত, পদদলিত, নিপীড়িত লক্ষ লক্ষ প্রকৃতপূজ্য তথা কথিত হীনকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এই দারুণ অপবাধে—বীণাপণি ভারতী জননারী . . . রূপাকণা লাভে বঞ্চিত হইয়া জীবন্তে মৃতবৎ, জড়বৎ—অজ্ঞান পশুর স্থায় কালযাপন করিতেছিল । ইংরাজ রাজত্বে, অবাধ বিদ্যা প্রচারে নবযুগের নূতন শিক্ষা প্রভাবে তাহাদের মনের অন্ধকার, গৃহের অন্ধকার দূরে প্রস্থান করিয়াছে । বিদ্যাচর্চার স্বর্ণকিরণে দশদিক আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে । তাহারা একগণে তাহাদের নিজেদের স্বরূপ—নিজেদের অধিকার দাবী দাওয়া ভালরূপই বুঝিতে পারিতেছে । আর তাহাদিগকে অজ্ঞতার আবরণে, কুসংস্কারের প্রাচীরে, মুর্থতার ঘনান্ধকারে ভুলাইয়া রাখে কাহার সাধ্য । কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্ম শঙ্খানাদে যেমন পাণ্ডবপক্ষীয় বীরহৃদয় মৈত্রগণ নবীন বলে নূতন উৎসাহে, নব চেতনায় সজীবিত হইয়া উঠিয়াছিল বর্তমান যুগেও লক্ষ

লক্ষ অবজ্ঞাত জনসাধারণ ভারতী মাতার বীণাধবনি শ্রবণে নব উৎসাহে তেমনি জাগিয়া উঠিয়াছে । যে বিদ্যা দুর্ব্বলের বল, নিধনের ধন, অন্ধের যষ্টি, বোবার বাকশক্তি, যে বিদ্যা আঁধারের দীপ শিখা—অমানিশা রজনীর ধুব নক্ষত্র, জলমগ্ন নাবিকের আশার তবণী, পথভ্রান্ত পোতাধক্ষের দিক্ নির্ণয় যন্ত্র সে বিদ্যা এতদিন ব্রাহ্মণের গুপ্ত গৃহে—মণিময় কোঁটায় বঞ্চনা ও কুসংস্কারের ছর্ভেদ্য আবরণে আবদ্ধ ছিল । শূদ্র নামক ধরিত্রী প্রাতি-পালক—বিশ্বের বরণীয়—সরল শাস্ত্র অকপট সমাজ সেবকগণের নিকট অজ্ঞাত ছিল । আজ নবযুগের মাহাত্ম্য উহা অভিজাতবর্গের হস্তচ্যুত হইয়া—খুলিয়া গিয়া আচণ্ডালের মধ্যে—আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে । যে পারিতেছে সেই মুঠ মুঠ ভরিয়া লইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিতেছে । কাহারও নিষেধ নাই—মানা নাই, বাবণ নাই বাহার যত ইচ্ছা, যত শক্তি লইয়া যাইতেছে এবং লইয়া গিয়া আপন আপন গৃহ ভবন সজ্জিত করিতেছে । হিন্দু রাজত্বে যাহা হয় নাই, বৌদ্ধ রাজত্বে যাহা হইতে পারে নাই, মুসলমান রাজত্বেও যাহা স্বপ্নাতীত ছিল ইংরেজ রাজত্বে বর্ত্তমান যুগে তাহাই সম্পন্ন হইল । শূদ্রের জাগরণ এ যুগের সর্ব্বপ্রধান ব্যাপার, চিরস্মরণীয় ঘটনা । ব্রাহ্মণগণ স্মৃতি সংহিতাতে লিখিয়াছিলেন—“যে শূদ্র বেদ উচ্চারণ করিবে—তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিতে হইবে, যে শূদ্র বেদ শ্রবণ করিবে—স্বতপ্ত তৈল অথবা গদিত ধাতব পদার্থ তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঢালিয়া দিয়া তাহাকে বধ করিতে হইবে । তাহারা লিখিয়াছিলেন—“শূদ্রদিগকে কখন জ্ঞানোপদেশ ও ধর্ম্মোপদেশ দিবে না—তাহাদের বেদমন্ত্র স্বাহা স্বধা বযট্কারাদি উচ্চারণে অধিকার নাই ; শূদ্রগণকে শাস্ত্রশিক্ষা দান করিবে না । বিড়াল, নকুল, ভেক, কুকুর, গাধা, পেচক, কুকলাশ প্রভৃতি হত্যা করিলে শূদ্র হত্যার সমান প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।” অত্রিসংহিতার মধ্যে লেখা হইয়াছে—“জপ, তপস্যা,

তীর্থযাত্রা, সন্ন্যাস, মন্ত্র সাধন, দেবতা আরাধন এই ছয়টি কার্য্য জ্ঞী শূদ্রের পাতিদ্বজনক । শুধু ইহাই নহে—“জপ হোম প্রভৃতি কৰ্ম্মনিরত শূদ্রকে বধ করিবেন ইত্যাদি ।” এই সকল অত্যাচারের ফলস্বরূপ ভারতে ৬ কোটি মুসলমান ও প্রায় ১ কোটি খৃষ্টানের উদ্ভব এবং সহস্র বৎসরের দাসত্ব । পরধৰ্ম্ম গ্রহণ করিলে একজন হিন্দুভ্রাতা যে হ্রাস হয়—তাঁহা নহে ; পরন্তু একজন শত্রু বৃদ্ধি হয় । ভগবানের অপার করুণায় অবিচার অত্যাচারের যুগ অতীত হইয়াছে । এই সব মহাপাপের ফল যাহা তাহাত সকলেই হাতে হাতে পাইতেছেন । সহস্র বৎসরের দাসত্বই এই সব গুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয় কি ? পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতি ভারতবাসীকে নিতান্ত হেয় ও ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করেন । শৃগাল কুকুরের ন্যায় ইহারা নানাদেশ হইতে আইনের বলে তাড়িত ও লাঞ্চিত হইতেছে । তথাপি আমাদের লজ্জা নাই, ঘৃণা নাই, আৰ্য্য আৰ্য্য করিয়া চীৎকারপূৰ্ব্বক আসন্ন মাতাইয়া রাখিতে আমরা বিগম্ভ মজবুত । আপনাপন জাতীয় গৌরবের স্মৃতিটুকু দেখাইয়া নিজেদের বৃথা গর্বের ঢাক নিজেরাই বাজাইতেছি ও আনন্দে আটখানা হইয়া আৰ্য্যজাতির ও আৰ্য্যধর্ম্মের জয় পতাকা উড়াইতেছি । যেমনটি দেখান হইয়াছে—তেমনি পাওয়া যাইতেছে ; যাহা দেওয়া হইয়াছে—তাহাই ফিরিয়া আসিয়াছে । চিন্তা করিয়া হৃদয়বান্ মনস্বীগণ বিরলে নয়নজল বর্ষণ করিতেছেন ও ভগবৎ পাদপদ্মে কৃত পাপের ক্ষমা চাহিতেছেন । নিপীড়িতের উত্থানের একমাত্র উপায়—শিক্ষা * প্রচার । জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা শিক্ষার সংযোগ না ঘটিলে—এ জাগরণ কুস্তকর্ণের মত নিরর্থক জাগরণ বলিয়া জানিবে । শিক্ষাবিহীন কত শত সমাজ জাগিয়া—কত কত পত্রিকা বাহির করিল কিন্তু গ্রাহক অভাবে বংশপত্রের অগ্নির মত মুহূর্ত্ত পরই সব শেষ হইয়া গেল । আবার যে নিদ্রা সেই কালনিদ্রার কোলে চলিয়া পড়িল । বালকবালিকা, যুবাবৃদ্ধ সকলকে

শিক্ষা দান করিতে হইবে । পুথিগত বিদ্যালোভের সময় যাহাদের অতিবাহিত হইয়াছে—তাহাদিগকে মুখে মুখে ইতিহাস, ভূগোল, কৃষি বিজ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দিতে হইবে । সত্য প্রেম পবিত্রতার মহাপুণ্যপিঠে সকলে সমবেত হইয়া মানুষ হইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও । নিজেদের অজ্ঞতা মূর্থতা, নিজেদের সংকীর্ণতা কুসংস্কার, নিজেদের অভাব অভিযোগ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর । সমাজের ছরবস্থা ও শোচনীয় দশা নিরীক্ষণ করিয়া বিরলে নয়ন জল বর্ষণ কর । শ্রীহরির পাদপদ্মে সহায়তা লাভের জন্য নিবেদন ও প্রার্থনা জানাইতে পারিলে সাহায্য আসিবেই আসিবে । স্বজাতি প্রেমের পুত মন্দাকিনী ধারায় পরজাতি বিদ্বেষ ভাব হৃদয় হইতে ধুইয়া ফেল । অন্য জাতির দোষ উদ্ঘাটন ও বর্ণনা করিয়া জিহ্বা ও হস্তকে কলুষিত না করিয়া বরং সে সময়টুকু স্বজাতির কল্যাণকর কোন কার্যে অতিবাহিত করিতে চেষ্টা কর । পরজাতিবিদ্বেষে জাতির অভ্যুত্থান হইবে না—বরং জাতীয় পতনই ঘটিবে । অন্য জাতির গুণাবলী অনুকরণ করিতে চেষ্টা কর । তাহাদের দোষ কোর্তন করিয়া কালী ও লেখনীকে অযথা কলঙ্কিত করিও না । নিজেদের দৈন্ত্য দুর্বলতা, নিজেদের অধঃপতন শোচনীয়তা চিন্তা করিয়া তাহার প্রতিবিধানে মনোযোগী হও । যাহারা এখনও আলস্য বশতঃ মোহ ঘুম ঘোরে নিজায় নিমগ্ন আছ—তাহারা উঠ, জাগ । এই নব যুগে কেহই আর ঘুমে অচেতন থাকিও না । ঐ যে কলকণ্ঠ বিহঙ্গ কুলের স্নমধুর কলধ্বনি শ্রুত হইতেছে—কাল-বিভাবরী অবগান প্রায় । প্রভাত অরুণের কিরণচ্ছটায় সারাবিশ্ব আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে—এখনও কি তোমাদের শয্যায় পড়িয়া ঘুম ঘোরে অচেতন থাকা উচিত ? উঠ উঠ । জগতে মহা কর্মের রোল উঠিয়াছে । যে যাহার কর্মপথে যাত্রা করিয়াছে । তুমিও তাহাদের পশ্চাদনুসরণ কর । অগ্রসর হও । এগিয়ে যাও—এগিয়ে যাও । সম্মুখের পথিককে ধৃত কর । পশ্চাতে কে পড়িল,

কে ডাকিল বা কে রহিল তাকাইও না । উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়—যাত্রা যদি স্বজাতি কল্যাণদ্যোতক হয়, পথ যদি সত্যালোক উদ্ভাসিত হয় তাহা হইলে শ্রীভগবানের শুভানীর্বাদ তোমাদিগকে নিরাপদে সফলতা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির মণিময় কিরীট স্নানোভিত স্বর্ণমন্দিরে উপনীত করিবেই করিবে ।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

পরিণাম ও প্রতিকার ।

বর্তমান হিংসা বিদ্বেষমূলক অশান্তির বৈদেশিক জাতিভেদের ফলে ভারতের হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ পরিণাম যে অতিশয় শোচনীয়, ইহা দেশের সমুদয় মনস্বী ব্যক্তিগণ বুঝিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন । শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায় কৃষি প্রভৃতি শারীরিক পরিশ্রমজনক কার্য্যসমূহ ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখার ফলে দেশ হইতে দিন দিন হিন্দু শিল্পকারগণের লোপ সাধন হইতেছে । এখন সর্বসাধারণের মনে অভিজাতবর্গের দেখাদেখি একটা দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে ঐ কার্য্যগুলি বাস্তবিকই হীন কার্য্য, উহা করিলে সমাজে ছোট হইয়া থাকিতে হয় । শাস্ত্রকারগণ দিবারাত্র শাস্ত্রের বচন আওড়াইয়া আমাদিগের এই ধারণা শিথিল না করিয়া বরং আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন । শিল্প বাণিজ্যের প্রতি কেন এই অস্বাভাবিক ঘৃণা, এই প্রেমের সমাধান করিতে যাইয়া দেখিলাম মল্ল প্রভৃতি সংহিতাযুগের শাস্ত্রবাক্যই ইহার মূলভূত কারণ । সংহিতাদি শাস্ত্রকারগণের কঠোর আদেশই কৃষি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির বিলোপের অন্যতম কারণ । সংহিতাযুগে রাজা, শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণগণের হস্তের ক্রোড়নক পুরুষ ছিলেন ; ব্যবহারিক আইনপ্রণেতা ব্রাহ্মণগণ আইন লিখিতেন এবং উহা রাজাজ্ঞায় প্রতিপালিত হইত । পূর্বে বলিয়াছি, বিদ্যা-জ্ঞান-চর্চাদি ব্রাহ্মণগণই করিতেন, পরে উহা বংশানুক্রমিক হওয়ায় ব্রাহ্মণপুত্রগণই বিদ্যাচর্চা বৈষ্ণ শূদ্রগণ উহা হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছিল । কাজেই জগণের শাসনদণ্ডের অমিত প্রতাপে সংহিতাদি শাস্ত্র-বাক্যের

প্রভাব অত্যন্তকাল মধ্যে বিদ্যাচর্চাবিহীন বৈশ্য-শূদ্রসন্তানগণের হৃদয়ে সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিল। দেশের সর্বনাশকর ঐ সব অর্থোক্তিক শাস্ত্র-বাক্যের প্রতিবাদ করিতে পারে কার সাধ্য! ব্রাহ্মণগণ আপন আপন স্বার্থ ও খেয়ালের বশবর্তী হইয়া যা তা লিখিলেন এবং উহাই শাস্ত্রের নামে, সংহিতাদির নামে ভগবৎ আদেশরূপে সমাজে অনায়াসে প্রচলিত আইন বলিয়া সর্বত্র পরিগৃহীত হইল। সংহিতাদিযুগকে বৈশ্য ও শূদ্র নিগ্রহের যুগ বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। এই যুগে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়গণ বৈশ্য ও শূদ্রগণের সর্বপ্রকার সামাজিক আধ্যাত্মিক অধিকার কাড়িয়া লইতে উদ্যত ও প্রাণপণ সচেষ্ট। শ্লোকের পর শ্লোক, শাস্ত্রের পর শাস্ত্র, গ্রন্থের পর গ্রন্থ লিখিয়া বৈশ্য শূদ্রগণকে নড়নচড়ন রহিত ও নিয়মের সূদৃঢ় জালে মাকড়সার মত আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। রক্তের সম্বন্ধ, ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ, দেশের কল্যাণ, সমাজের গঙ্গল এইখানেই নৃশংসভাবে আভিজাত্য-গর্ব ও আত্মসুখের সুতীক্ষ্ণ খড়্গা বলি প্রদত্ত হইল। ইহার পরিচয় নবম অধ্যায়ে কথঞ্চিৎ প্রদত্ত হইয়াছে, এস্থলেও কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। কৃষি-কার্যের উপর সমগ্র মানবজাতির জীবন নির্ভর করে। কৃষিই আর্যদিগের আদিম যুগে একমাত্র উপজীবিকা ছিল। যে কার্যের উপর মনুষ্যজাতির জীবনধারণ নির্ভর করে, শাস্ত্রকার তাহাকে অতি হীন চিত্রে চিত্রিত করিলেন। শাস্ত্রকার লিখিলেন :—“মৎস্য ব্যবসায়ীর সমগ্র বৎসরের মৎস্য নিধনরূপ পাপ লাক্ষ্মীর (লাক্ষ্মলবাহক কৃষকের) এক দিনের পাপের সমান।” কৃষিকার্য্য করিতে হইলে হল দ্বারা মৃত্তিকা মধ্যস্থ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী বধ হয়, একারণ নিয়ম করিলেন, কৃষিকার্য্য অতি হেয়—মৎস্য ধরা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ও পাপজনক কার্য্য। এইখানেই কৃষিকার্য্যের মুণ্ডপাত করা হইল। চাষা শব্দ তিরস্কারের মধ্যে গণ্য হইল।

শিল্প বাণিজ্য সম্বন্ধেও মনুর সুকঠোর আদেশ :—

মনু বলেন :—

শিল্পেন ব্যবহারেন * * *

* * * কৃষ্যা রাজোপ সেবয়া ॥৬৪
* * * * *

কুলাত্মাণ্ড বিনশ্চস্তি যানি হীনানি মজ্জতঃ ॥৬৫ ; তৃতীয় অধ্যায় ।

“বস্ত্রবয়ন প্রভৃতি শিল্প কার্য্য * * * কৃষি, রাজসেবা * * *

বেদহীন হওয়া এই সকল কারণে কুলা শীল অপকৃষ্ট হইয়া যায় ।”

মনু এইরূপে ক্রমশঃ ইক্ষু প্রভৃতি রসবিক্রেতা (১), বাস্তব বিদ্যাজীবী, স্বয়ংক্রম কৃষিজীবী (২), বণিক বৃত্তিজীবী (৩), লৌহবিক্রয়ী (৪) প্রভৃতিকে অত্যন্ত হীন চিত্রে চিত্রিত করিয়া ঐ সমস্ত ব্যবসা ও ব্যবসায়ীকে সর্বজন সমক্ষে ঘৃণিত করিয়াছেন ।

যে কৃষি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে দেশ, দেশ বলিয়া পরিচিত, যাহা জাতীয় জীবন গঠনের সর্বপ্রধান উপকরণ এবং যাহা সামাজিক উন্নতির মুখ্য উপায়স্বরূপ, অপরিণামদর্শী শাস্ত্রকারগণ ছই চারিটা শ্লোক রচনা করিয়া চিরকালের জন্য তাহার মূলে ভীষণ কুঠারাঘাত করিয়াছেন । এই স্থানেই হিন্দুসমাজের মৃত্যুবীজ উৎপন্ন হইয়াছে, এই কারণেই প্রাচীন ভারতের গগনস্পর্শী উন্নত শির আজ ধূল্যবনুষ্ঠিত !

যে আয়ুর্বেদ বেদের উপাঙ্গ স্বরূপ, জগতে বরণ্য ও আদর্শ সেই আয়ুর্বেদ বিদ্যার চর্চাকারী চিকিৎসককে মনু মাংসবিক্রেতা ও পুরা-বিক্রেতাদিগের সমশ্রেণীভুক্ত করিয়া চিকিৎসাবিদ্যার সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন ।

(১) ১৪৯ শ্লোক, তৃতীয় অধ্যায়, বিষ্ণুসংহতা ।

(২) ১৬৫ ঐ ঐ ঐ

(৩) ১৮১ ঐ ঐ ঐ

(৪) ২২০ ঐ চতুর্থ অধ্যায়, ঐ

মনু বলেন :—সোম বিক্রয়িণে বিষ্ঠা ভিষজ্ঞে পুষ্য শোণিতম্ ।

১৮০।৩য় অধ্যায়, মনু ।

“সোমনতা বিক্রেতাকে যাহা দান করা যায়, তাহা বিষ্ঠাবৎ ; চিকিৎসক ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা পুষ্য ও শোণিতবৎ ত্যাজ্য ।”

চিকিৎসকস্য মৃগয়োঃ ক্রূর স্যোচ্ছিষ্ট ভোজিনঃ । ২১২, চতুর্থ অধ্যায় ।

—মনুসংহিতা ।

“চিকিৎসকের, মৃগাদি পশুহস্তা ব্যাধের, ক্রূর ব্যক্তির * * * অন্নভোজন করিবে না ।”

মনু, শব স্পর্শ করা অত্যন্ত অপরাধজনক ও দোষাবহ বলিয়া বহুস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহা দ্বারাই শব ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও অস্ত্রপ্রয়োগ বিদ্যা আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান ইহাতে তিরোহিত হইল ।

ইহার উপর যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, বিদেশ ও সমুদ্রযাত্রা-নিষেধ-বিধি রচনা করিয়া তাহারও সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন । সমুদ্রযাত্রার উপর বাণিজ্য ব্যাপার, দেশেব সমৃদ্ধি, সমাজের বল, বৈদেশিক সংশ্রবজনিত অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে । এই বাণিজ্য বিষয়ে পশ্চাৎপদ থাকার দবণই ভারত ভূমি দিন দিন সম্পদহীন অর্থহীন হইয়া পড়িতেছে । বাণিজ্যেব সহিত দেশের শক্তিস্বরূপ অর্থ, অর্গের উপর সমাজ, সমাজের সহিত দেশের ও জাতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । সুতরাং সমাজ ও দেশের কল্যাণ করিতে হইলেই সমুদ্রে গমনাগমনপূর্বক বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন । প্রাচীন আর্য্যগণের উন্নতির সময় সমুদ্রযাত্রা অবাধে প্রচলিত ছিল । ফলতঃ এই সমস্ত বিধি নিষেধ আমাদের প্রাচীন বরেন্য আর্য্যজাতির উদ্ভাবিত নহে—

“উহা পরবর্তী একদল অযোগ্য স্বার্থপর ব্যক্তির মস্তিষ্ক কল্পিত মাত্র ।”

ভারতের উন্নতির সুখস্বৰ্ঘ্য যখন অন্তগমনোন্মুখ, তখন হিংসা বিদেয় আত্ম-কলহ প্রতারণা শঠতা চতুরতায় ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজ জর্জরিত । কে

কাহাকে কিরূপে দমন করিবে, নিগ্রহ করিবে, অপদস্থ করিবে এই চিন্তায় সতত উদ্গ্রীব । কুরুক্ষেত্রের কালসমরে ভারতের ক্ষত্রিয়কুল পূর্ব্বেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া ভারতীয় হিন্দুসমাজকে মেরুদণ্ডহীন করিয়া তুলিয়াছিল এবং তৎপরে বৈশ্য শক্তি যাহা অবশিষ্ট ছিল ব্রাহ্মণ কবিগণ লেখনী ধারণ করিয়া শাস্ত্রের নামে তাহাও ধ্বংসের করালগ্রাসে নিক্ষেপ করিলেন ।

শাস্ত্র বলিতেছে : —কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্যং বৈশ্যকম্মা স্বভাবতম্ । গীতা

পশুনাং রক্ষণং দানমিজ্যাদায়নমেব চ ।

বণিকপথং কুশীদঞ্চ বৈশ্যশ্চ কৃষিমেব চ ॥

গো-পালন কৃষি শিল্প বাণিজ্য কুশীদ প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ সকলেই এক বিরাট বৈশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈশ্যজাতীয় । সংগোপ, মাহিয়া, সচ্চাঘী, কর্মকার, সূবর্ণবণিক, সাহা, তাম্বুল বণিক, শজা বণিক, গন্ধা বণিক, গোদক, তিলি, কুস্তকার, বারুজোষী, সূত্রধর, কপালী প্রভৃতি জাতিগণ সকলেই শাস্ত্র অনুসারে বৈশ্য, কিন্তু এই বিরাট শক্তিশালী বৈশ্য জাতিকে সঙ্করবর্ণাস্তর্গত পৃথক পৃথক জাতিতে বিভক্ত করিয়া ঋষি নামধেয় ব্রাহ্মণ লেখকগণ গৃহে গৃহে ধ্বংসের করাল বহি জালাইয়া দিলেন ; অত্রেয়স্বাৰ্গপরতা স্বজাতি-বিদ্বেষ আত্ম প্রতারণার লব্ধ লব্ধ শিখা মুখব্যাদন করিয়া উঠিল । এই জাতিবিদ্বেষের ও জাতি বিভাগের বিষময় ফলস্বরূপ বিভিন্ন ব্যবসায়ী একই বিরাট বৈশ্য জাতি সঙ্করবর্ণাস্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন জাতি উপজাতি সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল । শাস্ত্রকারের অভিমত্বি সিদ্ধ হইল । বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোকে যদিও এখন এই সমস্ত সম্প্রদায় আপন আপন বংশ পরিচয় পূর্ব্বেতিহাস কতকটা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে, তথাপি তাহাদের মধ্য হইতে পরস্পর বিদ্বেষভাব, উচ্চ নীচ, বড় ছোট ভাব আজিও তিরোহিত হইতেছে না । আর্য্যজাতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, এতদ্ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই । যদি

ইহারা সকলেই বৈশ্ব সন্তান হয়, তবে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ভ্রাতৃত্ব পোষণ করিবে না কেন ? ভ্রাতৃত্ব পোষণ করা ত দূরের কথা, এক ভাই অন্য ভাইয়ের স্পৃষ্টজল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অসম্মত ! ইহাতে দেশের কি আশা করা যাইতে পারে ? একেই ত শাস্ত্রবাক্য, তার উপর আবার বল্লালী কোলীচ ! কুজত্বের উপর পৃষ্ঠভ্রণ ! সমাজ দেবতা আর কত সহ্য করিবেন ! যে বল্লাল নিজে লম্পট, চরিত্রহীন, ব্যভিচারী, তিনিই হইলেন সমাজের হর্তা কর্তা বিধাতা পুরুষ । মণিদত্ত নামক জনৈক স্ত্রবর্ণবণিক সন্তানের স্ত্রবর্ণ ধেনুর প্রতারণা ও চৌর্য্যাপরাধে বল্লালসেন সমগ্র স্বর্ণকার ও স্ত্রবর্ণবণিকদিগকে পাতিত করিয়া কহিলেন “অদ্যাবধি এই স্ত্রবর্ণবণিকেরা বিষ্ঠার কুমি অপেক্ষাও অপকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে ।” তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া নির্বাসিত করিলেন । জরাজীর্ণ হিন্দুসমাজ পাপাত্মা বল্লালের এই সম্পূর্ণ অন্তায় আদেশ মস্তক অবনত করিয়া গ্রহণ করিল ।

এইরূপে সম্প্রদায়গত, জাতিগত, ব্যবসায়গত হিংসা বিদ্বেষ পরিবর্দ্ধিত আকার ধারণ করিয়া হিন্দুসমাজ ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইতেছে । বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ প্রায় ৫০০ শত জাতি উপজাতি সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে । একই ব্রাহ্মণ পিতার সন্তান কত শত ভাগে, একই একই ক্ষত্রিয় পিতার সন্তান কত শত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । যাহারা এক পিতামাতার শুক্রশোণিতে উৎপন্ন হইয়া একই পিতৃমাতৃ ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াছে, একই ক্রীড়াভূমিতে খেলা করিয়া বেড়াইয়াছে আজ তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন । এক ভাই অন্য ভাইয়ের প্রদত্ত জল পান করিতে কুণ্ঠিত—আহারে অসম্মত ! একই মেহগরী মাতার স্তন্যদুগ্ধে জীবনধারণ করিয়া একই মায়ের কোলে নাচিয়া খেলিয়া তিলি সৎগোপ তন্তব্য কৰ্ম্মকার প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সাহা স্ত্রবর্ণবণিক প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের জলটুকু গ্রহণেও কুণ্ঠিত

অসম্মত ! সুতরাং কেমন করিয়া সমাজ-শরীর পুষ্টিতা লাভ করিবে, বলশালী হইবে, পৃথিবীর জীবিত জাতিগণের সহিত প্রতিযোগিতায় সাহসী হইবে ?

যেখানে ভ্রাতৃস্নেহ, প্রেম, প্রীতি, প্রণয়, সহানুভূতি, একতার একান্ত অভাব সেখানে কিরূপে উন্নতি সম্ভব ? এই দেহহীনতা, এই সামাজিক অবিচার অত্যাচার নির্মাতন, এই ঘৃণা অবমাননার পরিণাম একটাবার চিন্তা করিয়া দেখ । বিগত প্রায় সহস্র বৎসরে ৪০ কোটি হিন্দুসন্তান লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে । বিগত ২৫৩০ বৎসরেই প্রায় ৪ কোটি হিন্দুব লোপ সংঘটন হইয়াছে । বিগত ২৫৩০ বৎসরে বহু লক্ষ হিন্দুসন্তান সামাজিক অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের আশায় খৃষ্টধর্মের শীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছে । ঘৃণা অবমাননার ফলস্বরূপ এই কয়েক শত বৎসরে কত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হিন্দুসন্তান ঐরূপ ভাবে মুসলমান ধর্ম আলিঙ্গন করিয়াছে ও দিন দিন করিতেছে । কিন্তু হায় ! সমাজপতিগণের এদিকে ভ্রক্ষেপ মাত্র নাই ! যাহারা এসব কথা বলে তাহারা তাঁহাদের চক্ষে ভ্রাতৃ অবিবেকী ধর্মভ্রষ্ট কদাচারী সমাজ-দানব । যেরূপ অনুপাতে হিন্দুর লোকসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে তাহাতে অনুমান হয়, আর কয়েক শতাব্দীর পর একটি হিন্দুও হিন্দুর নাম রক্ষার জন্ত জীবিত থাকিবে না । হিন্দুধর্ম হিন্দুধর্ম করিয়া দেশবাসী পাগল, কিন্তু হিন্দুধর্ম যে কি পদার্থ তাহা অনেকেই জানেন না ও জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারেন না । স্ত্রী-আচার, দেশাচার, লোকাচার নামক কতকগুলি পদার্থ ধর্মের পবিত্র স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া সমাজ শাসনে ব্যাপ্ত আছে । লোকে কতকগুলি সামাজিক আচার ব্যবহার যথারীতি পালন করিয়াই ধার্মিক আখ্যায় আখ্যাত হইতেছে । ওদিকে দেশ সমাজ দিন দিন ধ্বংসের মুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে ।

ঐগারের অখাদ্য আহারে সমাজপতি বাবুগণের জাতি যায় না, বিদ্যা-

শিক্ষার্থ সমুদ্রযাত্রা করিলে জাতি যায় ; বিধবার বাভিচারে জাতি যায় না, কিন্তু বিধবার বিবাহে জাতি যায়, কুলে কলঙ্ক হয় ; সুরাপানে জাতি যায় না, পতিত হইতে হয় না, সুরা বিক্রয়ে জাতি যায়, পতিত হইতে হয় ; গরু বাছুর কুকুর বিড়াল সাপ প্রভৃতির চর্কি-মিশ্রিত ঘৃত সেবনে জাতি যায় না, কলের জল, মোড়া, লেমনেড্, বরফ মুসলমান ও সাহেব বাড়ীর পাঁউরুটী, বিস্কুট, জমাট ছুন্ধ সেবনে জাতি যায় না, সাহা সুরণবণিক সূত্রধর নমঃশূদ্র প্রভৃতি আচারনিষ্ঠ হিন্দুধর্মাবলম্বী দেব দ্বিজে ভক্তিমান অতিথিপরায়ণ স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের প্রদত্ত জলপানে জলস্পর্শে জাতি যায় ; অনাচরণীর হিন্দু ভ্রাতার জল অপব্যবহার্য্য কিন্তু জলমিশ্রিত, অশুদ্ধ ভাণ্ডে আনীত বাজারের মুসলমানের ছুন্ধ ব্যবহার্য্য ; ভাতেরই অন্ততম সংস্করণ সিদ্ধ তণ্ডুল অবাধে প্রচলিত । এই সব সামাজিক অবিচার বিষের হ্রায় সমাজ শরীর জর্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে । ভগবানের রাজ্যে অত্যাচার অবিচার কতদিন সহ্য হয় ! হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ আশাস্থল যুবকগণ ! তোমরা কোথায় ? এই অবিচার ও সামাজিক নির্যাতনের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত তোমাদিগকে ভগবানের নামে আহ্বান করিতেছি । সহস্র সহস্র বৎসরের সামাজিক পেষণের ফলে যাহারা প্রায় পশু পদবীতে উপনীত হইয়াছে, যাহারা ভারতীয় হিন্দুসমাজের অজ্ঞাত মেরুদণ্ড, তাহাদিগকে তুলিবার জন্ত—গূর্থতা ও কুসংস্কারের মহাপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত তোমাদের বলিষ্ঠ বাহু কি অগ্রসর হইবে না ? তোমাদেরই বুকের রক্ত, প্রাণের প্রাণ, দেহের জীবন স্বদেশবাসী ভাই হইয়া তাহারা কি চিরকাল এইরূপ হীন অপদার্থ অবজ্ঞাত ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবে ? বিশ্বের সংবাদ, জগতেব মঙ্গল বার্তা, বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান ও সভ্যতা, আশা ও ভরসা কি তাহাদের দ্বার-দেশে কখন পৌঁছিবেনা ? তাহাদের হৃদয়দ্বার কি চিরকালই রুদ্ধ থাকিবে ? উহার কি কখন উন্মোচন হইবে না ? এস, কে আছে হৃদয়বান ! কে আছে

শ্রেণিক । উহাদিগকে উঠাও, তোল, মানুষ কর । শ্রেণামৃত ধারায় সহস্র সহস্র বৎসরের জাতিগত বিদ্বেষ-বহি নিরূপিত করিয়া দাও । ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা নইয়া উপস্থিত হও । দরিদ্রের পর্ণ-কুটারে, পাঠশালার বাণীমণ্ডপে, রাখালের গোচারণ মাঠে, পল্লীবাসীর গৃহে গৃহে যাত্রা কর । তাহাদের সহস্র বর্ষের অন্ধকার গৃহ বিদ্যার বিমল আলোকে আলোকিত হইয়া উঠুক । ঐ দেখ তোমার একই মাতৃ অঙ্কের ভ্রাতৃবৃন্দ রোগক্লিষ্ট, অবসন্ন দেহ, উৎসাহহীন, উদ্যমহীন, ক্ষুধ্তিহীন, আনন্দবিহীন— একটীবার তাহাদের দিকে সপ্রেম নয়নে করুণার দৃষ্টিতে অবলোকন কর, একটীবার তাহাদিগকে বাহুপাশে টানিয়া লও । সমাজের সর্বস্ব কোটি কোটি অনুরক্ত ভ্রাতৃগণের উন্নতির জন্য তোমরা কি সহায়তা করিবে না, যত্নবান হইবে না ? তাহাদিগকে কি শ্রাঘ্য সামাজিক অধিকার প্রদান করিবে না ? সমাজ-পতিগণের নিকট অল্পই আশা রাখিও । আর কতকাল তাহাদের কৃপার আশার মুখপানে তাকাইয়া থাকিবে ? সহস্র সহস্র বৎসরের সামাজিক কুসংস্কারের মধ্যে উহাদের জন্ম । দেশের কথা, সমাজের কল্যাণ চিন্তা করিবার তাহাদের মোটেই অবসর নাই । তোমরাই সর্বস্ব, তোমরাই আশা, তোমরাই ভরসা । ভিন্নধর্মী মুসলমান ও খৃষ্টানগণ, ধোপা, নরসুন্দর বেহারা পাইবে, আর তোমার স্বধর্মী, তোমার ভগবতী মার আদরের সন্তান, তোমার দয়ালু হরির মেহের ভক্ত, তোমার অনুরক্ত ভাই পাইবে না ? একি ঘোর অবিচার নহে ? কোন হিন্দু সন্তান হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম বা খৃষ্টানধর্ম গ্রহণ করিলে সে ধোপা, নরসুন্দর ও বাহক পাইবে, কিন্তু স্বধর্মী থাকিলে পাইবে না এ কেমন কথা ? তবে কি হিন্দুধর্মই এই নীচতার কারণ বুঝিতে হইবে ? আবার বলি, করযোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে করণ কর্তে বলি, হে বঙ্গের ভবিষ্যৎ সমাজপতি সহৃদয় যুবকগণ, কালবিলম্ব করিও না । ঐ যে শ্রীভগবান মঙ্গল মধুর দেহবিজ্জড়িত কর্তে তাঁহার প্রাণপ্রিয় দীন দরিদ্র

অভাজন অনুরত সন্তানগণের উন্নয়নের জন্ত তোগাদিগকে আহ্বান করিতেছেন—এস, এই মহৎ ব্রত উদ্‌ঘাপন কর—তাহাদিগকে হাত ধরিয়া তোল—উঠাও । তুমি আমি ছুই চারিজন ভজলোক লইয়া সমাজ নহে, সর্বসাধারণকে লইয়া সমাজ, ব্যাষ্টির উন্নতিতে উন্নতি নহে—সমষ্টির উন্নতিতেই উন্নতি,—সমাজের মঙ্গল । সহস্রভাগে বিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজকে উন্নত করিতে হইলে উহার প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন অংশকে উন্নত করিয়া লইতে হইবে । শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সতেজ ও পুষ্ট না হইলে দেহ যেমন সতেজ ও পুষ্ট হয় না, তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উন্নতি না হইলে হিন্দু সমাজের উন্নতি অসম্ভব । কেহ কাহাকে ত্যাগ করিয়া কিম্বা বাদ দিয়া উঠিবার উপায় নাই । একের উন্নতি অত্রের উন্নতিসাপেক্ষ । শিক্ষায় দীক্ষায়, চরিত্রে ধর্মে তাহাদিগকে আপনাদের নিজেদের মত উন্নত করিতে হইবে । দেশের সেবায় তাহাদিগকে পার্শ্বে রাখিতে হইবে, সর্ববিধ সংকার্য্যে তাহাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে, না আসিলে নিজে যাইয়া বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিতে হইবে । স্মরণ রাখিও, অবজ্ঞাত জনসাধারণই প্রকৃতপক্ষে দেশের শক্তি, সমাজের বল, জাতির নেকদণ্ড, উন্নতির নিদান, গাতৃপূজা যজ্ঞের পবিত্র হবিঃ । তাহাদিগকে চাই-ই । শতকরা ৫৮ জন অস্পৃশ্য, সমাজ-দেহের অর্দ্ধ অঙ্গ অচল, অবশ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত । যতদিন না বঙ্গের অভিজাত সন্তান আপন হৃদয় প্রেমানলে জ্বীভূত করিয়া সমাজের প্রত্যেক নরনারী বালক বালিকা, যুবা বৃদ্ধ, জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে আচণ্ডালের জন্ত চালিয়া না দিবে, ততদিন সমাজের কল্যাণ নাই । যে দিন সকলে ভ্রাতৃত্বাবে পরস্পর পরস্পরের হস্ত ধারণ করিবে, ব্রাহ্মণ সন্তান জাত্যাভিমান বিসর্জন দিয়া চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া যাইবেন, যে দিন সমাজস্থ এক জনের ছুঃখ কষ্ট সকলের প্রাণে ঝঙ্কার দিয়া উঠিবে, একজনের অপমানে—এক জনের নিগ্রহে সকলে সমভাবে অপমানিত ও নিগৃহীত মনে

করিবে—সেই দিন দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি । যাহারা সমাজের মঙ্গলার্থ আপন আপন সুখ-সুবিধা, স্বার্থ-কল্যাণ, ভোগস্পৃহা বলিদান করিয়া তোমাদের সেবায় নিমগ্ন আছে ; যাহাদিগের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের উপর ধনবানের ঐশ্বর্য্য, মানীর সম্মান,—অভিজাতবর্ণের ভোগের ভ্রম, বিলাসের সামগ্রী, উন্নত স্বর্ণখচিত মেঘস্পর্শী মন্মর প্রাসাদ, পরিধেয় বসন ভূষণ, খাদ্যসজ্জার নির্ভর করে, যাহাদিগের বিন্দু বিন্দু হৃদয়-রুধিরে বড় লোকের বিশাল অট্টালিকার এক একখানি ইট পাথর গাঁথা—তাহাদিগের সংবাদ করজন রাখেন ? কয়জন তাহাদের চিন্তায় বিরলে নয়নজল বর্ষণ করেন ? বন্ধোয় যুবক ! তোমরাও কি নিষ্ঠুর পাষণ থাকিবে—স্নেহ মমতা বিসর্জন দিবে—আপন স্বার্থচিন্তায় বিভ্রত থাকিবে ? এস, ইহারা উঠিবার জন্ত ঐ যে হাত বাড়াইয়া দিয়াছে—ঐ যে করুণনৈরো দয়া ভিক্ষা করিতেছে ; উহাদের হাত ধরিয়া তোল, উঠাও, উহাদের কাতর-ক্রন্দনে মনোনিবেশ কর, উহাদের অশ্রুজলে আপন নয়নজল মিশাও—অধিকার দাও—আভিজাত্যভিমান বিসর্জন দিয়া সামাজিক দারুণ বন্ধন খুলিয়া দাও—উহারাও তোমাদের মত মানুষ হউক—উন্নত হউক—ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুসমাজে নবজীবন সঞ্চার করুক—প্রতি পল্লীগৃহে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠুক—আনন্দ কোলাহলে প্রতি গৃহ মুখরিত হইয়া উঠুক ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

জলচল ও অস্পৃশ্যতা বর্জন ।

অস্পৃশ্যতা ভারতের এক মহাপাপ । যে সমুদয় গুরুতর পাপে ভারতের অধঃপতন হইয়াছে, অস্পৃশ্যতা তন্মধ্যে অন্যতম । অস্পৃশ্যতা ৬০ কোটি হিন্দু অধ্যুষিত হিন্দুস্থানকে ভিন্ন ধর্ম্মীর পদানত করিয়াছে, হিন্দুর গৌরব-ভাস্করকে অবমাননা ও লাঞ্ছনার ঘন ক্রুঞ্চ মেঘে আবৃত করিয়াছে, বেদ বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাদ অতলতলে ডুবাইয়া দিয়াছে । অস্পৃশ্যতা আমাদের স্বর্গের নন্দন কানন হইতে নরকের অন্ধকারজনক স্থানে নিমগ্ন ও অবনমিত করিয়াছে । আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, আমাদের আন্দোলন আলোচনা, আমাদের শাস্ত্রপুরাণ এই অস্পৃশ্যতার পাপ শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে । বাক্যে আমরা মহা সাম্যবাদী, কার্য্যে আমরা মহা ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন । ধর্ম্ম ও পুণ্য হানিকর নিকৃষ্ট কর্ম্ম হইতে এই অস্পৃশ্যতার জন্ম । কিন্তু ইহা এখন দেশকাল পাত্রকে অতিক্রম করিয়া, গ্রাম সত্য অগ্রাহ্য করিয়া অবিচলিত ভাবে যথেষ্টচার চালাইয়াছে । ইহাকে বাধা দিবার সামর্থ্য যেন কীহারও নাই । কোনও মহাপুরুষ এক সময় ছুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—“জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গ, ভক্তিমার্গ সব পলায়ন, এখন আছে কেবল ছুঃমার্গ, আমরা ছুঁওনা আমরা ছুঁওনা, ছুনিয়া মহা অপবিত্র কেবল আমিই পবিত্র । ব্রহ্ম এখন ব্রহ্মলোকেও নাই, গোলোকেও নাই, ব্রহ্ম এখন যাগ যজ্ঞে ব্রতঃ

তপস্তায় নাই, ব্রহ্ম এখন মুনিকাননে—তীর্থক্ষেত্রে, বেদ বেদান্তে নাই—
ব্রহ্ম এখন রামাধরে, ব্রহ্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে ।”

আমরা ভারতের সমাজপতিগণ ৭ কোটি নর-নারীকে, ভাই-ভগিনীকে
অম্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি । বাঙ্গলায় শতকরা ৫৮ জনই অম্পৃশ্য,—অবশিষ্ট
৪২ জন আমরা তাহাদিগকে পশু পক্ষীরও অধম করিয়া রাখিয়াছি ।
আমরা তাহাদিগকে ছুঁইনা—দূর দূর করিয়া ঘৃণায় ডাড়াইয়া দেই । মানুষ
হইয়া মানুষকে—হিন্দু হইয়া হিন্দুকে, ভাই হইয়া ভাইকে আমরা দিনরাত্রি
ছুই পা দিয়া দলন করিতেছি, পশুর অধম ঘৃণা করিতেছি । হিন্দুসমাজে
পশু পক্ষীরও যে অধিকার আছে, পশু পক্ষীরও যে আদর যত্ন সোহাগ
ভালবাসা পায়, আমাদের অম্পৃশ্য-অনাচরণীয় ভ্রাতারা সেটুকুও পায় না ।
ঘৃণায় ঘৃণায় আমরা তাহাদের মনুষ্যত্ব হরণ করিয়া লইয়াছি । যুগ যুগান্তর
হইতে ঘৃণা অবজ্ঞা, অপমান লাঞ্ছনা, অবিচার অত্যাচার ভোগ করিয়া
করিয়া মনুষ্যত্বহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে । ‘তোরা ছোটলোক, তোরা অপবিত্র,
তোরা অম্পৃশ্য, তোরা নীচ জাত, তোরা ইতর, অধম’ এই কথা হাজার হাজার
বৎসর হইতে শুনিয়া শুনিয়া তাহাদের হৃদয়স্থিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম সত্যই
সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা যে মানুষ, সমদর্শী ভগবানের স্নেহের সন্তান,
শ্রেষ্ঠপিতা পরমেশ্বরের সর্বগুণাযুক্ত আদরের পুত্র কন্যা, এ কথা তাহারা
ভুলিয়া গিয়াছে । তাহারাও যে সচ্চিদানন্দ সাগর শ্রীভগবানের এক একটা
তরঙ্গস্বরূপ, চিৎস্বরূপের এক একটা কিরণতুল্য, তাহারাও যে অদ্বৈতবাদের
এক একটা মূর্ত ব্রহ্ম, এ কথা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে । তাহারা জানে
উচ্চ জাতিদের সেবা পরিচর্যা, কাজকর্ম দাসত্ব গোলামী করিবার জন্তই
তাহাদের জন্ম এবং তাহারা শত শত শতাব্দী ধরিয়া তাহাই করিয়া
আসিতেছে । তাহাতে তাহাদের অকুচি নাই, ঘৃণা নাই, তাহাতে তাহাদের
অপমান নাই—অবমাননা বোধ নাই ।

শাস্ত্র বলে আত্মহত্যা মহাপাপ । লোকে ফাঁসিকাঠে, বিষ পানে, গলায় ছুরি বসাইয়া আত্মহত্যা করে । আমরা সকলে তাহাকে নিন্দা করি । কিন্তু আমরা বলি—ইহা প্রকৃত আত্মহত্যা নহে, ইহা প্রাণত্যাগ মাত্র । ইহাতে আত্মার হত্যা হয় না । আত্মার হত্যা সেখানে, যেখানে আত্মারূপী ভগবান্—অত্যাচারে অবিচারে, অনাদরে অবহেলায়, ঘৃণায় অবমাননায়—মৃতবৎ—জড়বৎ অবস্থান করিতেছে । নিত্য চিৎস্বরূপ যেখানে শূন্যরূপে দাসরূপে অধম অস্পৃশ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে সেখানেই প্রকৃত আত্মহত্যা—আত্মার হত্যা হইতেছে । আর তাহার পরিণাম !! পরিণাম হাতে হাতে, সহস্র বৎসরের পরাধীনতা ও দাসত্ব ।

এই মনুষ্যত্ব হরণকারী মহাপাপ মূর্তি অস্পৃশ্যতা দূর না হইলে ভারতে স্বরাজ লাভ সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে না । ইহার বিষে যে কেবল উচ্চ জাতীয়েরাই অরাজগ, এই জাত-সর্পের বিষে যে কেবল অভিজাতবর্গেরই মহানিষ্ট সাধিত হইয়াছে—এমন নহে ; ইহার বিষে উচ্চ নীচ (?) ধনী দরিদ্র, উত্তম অধম, স্পৃশ্য অস্পৃশ্য সকলেই জর্জরিত । এই গুরুতর কারণেই এই পাপ সমান ভাবে রাজ্য পরিচালন করিয়া আসিতেছে । কিছুতেই ইহার ধ্বংস হইতেছে না । তথাকথিত উচ্চ জাতিগণ তথাকথিত নীচ জাতিগণকে ঘৃণা করিতেছে এবং নিম্ন জাতিগণ আবার তথাকথিত তন্নিম্ন জাতিগণকে ঘৃণা করিতেছে । এক অস্পৃশ্য অন্য অস্পৃশ্যকে, এক অধম অন্য অধমকে, এক নিপীড়িত অন্য নিপীড়িতকে, এক দাস অন্য দাসকে ঘৃণা করিতেছে, এক অবমানিত লাঞ্ছিত পদদলিত ভাই অন্য এক লাঞ্ছিত পদদলিত ভাইকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিতেছে এবং এই জগত্ই ভারতের উর্বর বক্ষে ইহা এমন করিয়া শিকড় গজাইতে সমর্থ হইয়াছে । এই জগত্ই ঘৃণা অবজ্ঞার এমন তাণ্ডবী লীলা অনায়াসে চলিতে পারিতেছে । একটু দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটাকে সহজবোধ্য করা যাউক । ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ আদি তথাকথিত উচ্চ জাতি কামার কুমার

তিলি তাম্বুলী গোপ গন্ধবণিক প্রভৃতি নবশাখ সম্প্রদায়ভুক্ত ভাইগণকে কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন—বলা বাহুল্য ইহারা সকলেই জঘাচরণীয় জাতি । তাঁহারা সে অবজ্ঞার ঝাল সাহা সুরবণবণিক সুরধর কৈবর্ত ভ্রাতৃগণের উপর ঝাড়িয়া সেই অবজ্ঞার ক্ষোভ দূর করিতে চেষ্টা করেন । আবার সাহা সুরবণবণিক প্রভৃতি জাতিগণ উচ্চ (১) ছুই শ্রেণীর অবজ্ঞার ঝাল পোদ নমঃশূদ্র মালী চুলি প্রভৃতি ছোট ভাইদের উপর ডবল মাত্রায় ঝাড়িয়া স্বীয় অপমানবিস্কৃদ্ধ মর্ম্ম-জ্বালা দূর করিতে প্রয়াস পান । এইরূপে নমঃশূদ্র পোদ ভ্রাতারাও পাটনী কোনাই প্রভৃতি ভাইগণকে সমান মূল্যে ঘৃণা করেন এবং তাঁহারা আবার (পাটনী কোনাই প্রভৃতি) চর্ম্মকার ডোম গ্যাথরকে প্রাণ ভরিয়া ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিয়া সর্ব জাতির অবমাননার জ্বালা দূর করিতে চেষ্টা করেন । এই প্রকারে—এ জাতি সে জাতিকে, এ সম্প্রদায় সে সম্প্রদায়কে, এ শ্রেণী সে শ্রেণীকে ঘৃণা করিয়া করিয়া ভারতে ঘৃণা অবজ্ঞার বিরাট রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । জাতি বিদ্বেষের এই বিরাট হিমাচল কিছু ছুই-দশ দিনে, ছুই-দশ জনের, ছুই-দশ জাতির দোষে গড়িয়া উঠে নাই । কেবল উচ্চ জাতির দোষে এই পাপ এত বড় হইয়াছে বলিলে সত্যের অবমাননা করা হইবে । এজন্ত উচ্চ নীচ বড় ছোট ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলেই অস্বাধিক দোষী এবং দায়ী । অনেকে কেবলই ব্রাহ্মণগণের দোষ দিয়া থাকেন, কিন্তু আমি বলি—এ ভারতে ব্রাহ্মণ কয় জন ? ২২ কোটি হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ ১ কোটি মাত্র । এই ২১ কোটি নির্যাত্তিত ও ব্রাহ্মণ অত্যাচারে জর্জরিত হিন্দু ভ্রাতৃগণ মুষ্টিমেয় ১ কোটি ব্রাহ্মণকে বাদ দিয়া বয়কট করিয়া অত্যাচার-বর্জিত বিরাট বিশুদ্ধ হিন্দুসমাজ স্থাপন করান না কেন ? ব্রাহ্মণ বাঙ্গলায় কয় জন ? শতকরা প্রায় ৬ জন মাত্র ; বাকী ৯৪ জন ত ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারে জর্জরিত ব্রাহ্মণেতর জাতি । তাঁহারা সকলে মিলিয়া এই সাম্যবিরোধী ব্রাহ্মণ্য শক্তিলব্ধ গোটা কয়েক গর্বিত ব্রাহ্মণকে বাদ

দিয়া এই বাঙ্গালায় একটা সাম্যবাদী হিন্দুসমাজ গড়িয়া তুলুন না কেন ? সে শক্তি কাহারও আছে কি ? কেহ কেহ আবার ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ এই তিনটী তথাকথিত উচ্চ জাতিকেই হিন্দুসমাজের যত অনিষ্টের মূল বলিয়া মনে করিয়া থাকেন । তাঁহাদের মত এই যে, এই তিন গর্ভিত উচ্চ জাতিই বাঙ্গলার হিন্দুসমাজে সাম্যবাদ প্রচলনের বিঘ্ন পরিপন্থীস্বরূপ । যত ঘৃণা অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য নাকি এই তিন জাতির নিকট হইতেই আগদানি । তাঁহাদিগকেও বলি, বাঙ্গালায় ইহারা কয়জন ? বাঙ্গলার প্রতি ১০০ জন হিন্দুর মধ্যে ইহারা ১৩ জন মাত্র । বাকী ৮৭ জন অবজ্ঞাত ও লাঞ্চিত ভ্রাতারা ইহাদিগকে বয়কট বা বর্জন করিয়া তাঁহাদের মনঃমত নূতন একটা সাম্যবাদী হিন্দুসমাজ গড়িয়া তুলুন । আমরা জানি ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি তথাকথিত তিন উচ্চ জাতিকে বাদ দিয়া নূতন বিপ্লব সমাজ সজ্জ গঠন করিবার শক্তি কাহারও নাই । দোষ যে অল্প বিস্তর সকলেরই । কিন্তু কেহই আপন আপন সমাজের সমাজপতিগণের দোষ দেখিতে পাইতেছেন না ; নিজেদের সঙ্কীর্ণতা, নিজেদের নীচতা হীনতা, নিজেদের দুর্বলতা কেহই দেখিতে পাইতেছেন না । সকলেই উচ্চ জাতিদের দোষ দেখাইয়া দিয়াই খালাস । অম্পৃশ্যতা দোষ সমাজের সর্বজাতির মধ্যে অঙ্কুর গজাইয়া বসিয়াছে । অম্পৃশ্যদের মধ্যেই অম্পৃশ্যতার ব্যাধি বেশী করিয়া প্রবেশ করিয়াছে । ভাত খাওয়া দূরে থাকুক—সাহা স্তব্ধবলিক স্ত্রীধর কান্দালী যোগী কৈবর্ত কি কখন নমঃশূদ্র বা পোদের জল পান করেন ? নমঃশূদ্রগণ কি ঢুলি পাটনি মুচির জল খান ? না তাঁহাদের কুয়া ছুঁইতে দেন অথবা দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন ? দর্পণে যেমনটী দেখান যায়, দর্পণ তেমনই দেখাইয়া থাকে । ঘৃণার বিনিময়ে প্রেমের আশা করা কি অত্যাশ নর ? উন্নতির অম্পৃশ্য ভ্রাতারা উচ্চ জাতিদের দোষ দেন—তাঁহারা তাঁহাদিগকে অম্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া কিন্তু তাঁহারা নিজেরা যে নিম্নতর অম্পৃশ্য ভাইদিগকে অম্পৃশ্য করিয়া

রাখিয়াছেন—তাহাদের জন্য তাঁহারা ছোন না—ইহা কি অশ্রদ্ধা নহে, ইহা কোন্ সাম্যবাদের অন্তর্গত ? সেইজন্য বলি—সকলে একযোগে সম্ভবদ্রষ্ট হইয়া চেষ্টা করা ব্যতীত এই মহাপাপ-মহীকরতার উচ্ছেদসাধন সম্ভবপর হইবে না । কেবল উচ্চজাতির উদারতা সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্বের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের অপেক্ষা ছোট ও নীচ (?) ভাইদের উপর উদারতা—সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্ব দেখাইতে হইবে । নিজেরা কথায় ও কার্যে—মনঃপ্রাণে সাম্যবাদী হইয়া অস্পৃশ্যতা বর্জন করিয়া উচ্চ জাতিগণকে সাম্যবাদী হইবার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে । সহস্রবার বলি অস্পৃশ্যতার জন্য ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতি বহু প্রকারে দায়ী, কিন্তু একথাও না বলিলে মিথ্যা বলা হইবে যে, বর্তমান-অস্পৃশ্যতার জন্য ব্রাহ্মণের জাতিগণও অল্প দায়ী ও সামান্য দোষী নহেন ।

আব্রহ্ম পেশোয়া, আসিন্ধু হিমালয় সর্বত্র স্বরাজের গগন পবন মুখরিত কারী বিজয় ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে । আসুন আমরা সকলে, সর্ব জাতি সর্ব সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া অস্পৃশ্যতা বর্জনপূর্বক ভারতে এক বিরাট হিন্দুসমাজ—সামারাজ্য প্রতিষ্ঠিত করি । যার যা কিছু ত্রুটি ও দোষ, গলদ ও অপরাধ আছে সরলভাবে স্বীকার ও পরিহার করিয়া সকলে একত্র মিলিত হই । সকলে সমবেত চেষ্টা করিয়া অস্পৃশ্যতা দোষ দূর করিতে অগ্রসর হই । এ সময়ে যেন আমরা কেহ কাহারও দোষ দিয়া, এক জাতি অন্য জাতির ঘাড়ে সমুদয় অপরাধের বোঝা চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিত চিন্তে পরাজিত বিদ্রোহ প্রচারে মনোযোগী না হই । পরাধীনতার এই সহস্র বৎসরে আমরা পরস্পর বহু বাগড়া বিবাদ, বহু নিন্দা তিরস্কার করিয়াছি । তাহাতে অস্পৃশ্যতা দূর হয় নাই কিম্বা পরাধীনতার লোহশৃঙ্খল কিছুমাত্র নরম বা শিথিল হয় নাই । এই অস্পৃশ্যতা বর্জনে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থকে যেমন ভাবে পরিত্রাণ করিতে হইবে, কামার কুমার তিলি তামুলি সাহা সুরণবণিক কপালী সূতার পোদ নমঃশূদ্রকেও ঠিক তেমনি ভাবে ধাটিতে হইবে । প্রত্যেক জাতি

প্রত্যেক জাতির প্রতি প্রেম-প্রবণ হইতে হইবে । প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক জাতিকে সহোদর ভাইএর মত জ্ঞান করিতে হইবে । প্রত্যেক জাতিকেই স্বীয় স্বীয় জাত্যাভিমান বিসর্জন দিয়া তন্নিম্ন বা তাঁহাদের অপেক্ষা নীচ (?) জাতীয় ভাইগণকে আপনার ভাইএর মত জ্ঞান করিতে হইবে । সকলকেই নিজ নিজ নীচ (?) জাতীয়—কনিষ্ঠ ভাইদের—ছোট ভাইদের জল-চল করিয়া লইতে হইবে । কেবল উচ্চ জাতিদের দোষ দিলে এবং উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদের গালাগালি দিলে কিম্বা নিন্দা করিলে অস্পৃশ্যতা দোষ দূরীভূত হইবে না । স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম বোধ জাগাইতে না পারিলে কিছুতেই ভারত বক্ষ হইতে এই মহা পাপ সমূলে উৎপাটিত করিতে পারা যাইবে না । বেদ ও উপনিষদের শিক্ষায়, ভাগবত ও গীতার শিক্ষায়, তন্ত্র ও পুরাণের শিক্ষায় আমাদের বিশেষ কিছু হয় নাই । এমন কি দয়ার অবতার ভগবান্ বুদ্ধের সাম্যবাদ প্রচারে, শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদে, রামানুজ মধ্বাচার্য্য নিম্বার্ক তুকারামের ভক্তিবাদে, প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের পাষণ গলান প্রেম সঙ্কীর্ণনেও এই পাপ বিনষ্ট হয় নাই ।

সমধর্মাবলম্বী ভাইদের মধ্যে, ২২ কোটি হিন্দুর নরনারীর মধ্যে প্রথমতঃ এই চেষ্টা সফল ও সার্থক করিয়া তারপর ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভাইদের মধ্যে জল-চলনের প্রচলনের চেষ্টা করিতে হইবে । ক্ষণিক আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া কিম্বা হঠাৎ ভাব-প্রাণোদিত হইয়া অথবা সাম্যবাদের মিথ্যা ধুয়া ধরিয়া ইহার বিপরীত আচরণ করিলে তাহার ফল হিন্দুসমাজ মধ্যে কখনই ভাল হইবে না । তুমি আমি কোন্ ছাত্র—নগণ্য, আধুনিক যুগের যুগাবতার মহাত্মা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন—দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মনীষিগণও এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই । বৌদ্ধধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম এবং আর্য্য ও শিখ সমাজে এ বিষয়ে জোর করিতে যাইয়া হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন ।

তঁাহাদের চেষ্টা স্মরণপ্রাপ্ত হয় নাই । আর যঁাহারা চেষ্টা করিয়াছেন — হিন্দু সমাজের সঙ্গে সমুদয় সংস্রব ও সম্বন্ধ তঁাহাদিগকে বাধা হইয়া ছাড়িতে হইয়াছে । বিরাট হিন্দু সমাজের বিস্তৃত বক্ষে নাস্তিকের স্থান হইয়াছে কিন্তু ইঁহাদের স্থান হয় নাই । ইহাতে হিন্দু সমাজের কতখানি ক্ষতি বা লাভ হইয়াছে—এ বিচার আমরা এখানে করিতে চাই না । আমরা শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, প্রাচীন সনাতন পন্থা হিন্দু সমাজে বলপূর্ব্বক কোন বিধি প্রচলিত হয় নাই । বর্ণাশ্রমবাদী হিন্দু একাকারের নামে শিহরিয়া উঠে । সেই জন্ত বলি, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী স্বতন্ত্র সমাজের লোকদের সঙ্গে আচার ব্যবহারে থাওয়া পরায় বিশেষ সাবধানতা সহকারে স্বাভাব্য বজায় রাখিতে হইবে । খেয়াল বশে কিম্বা জেদের বশবর্তী হইয়া সাম্যের নামে অগ্রায় ঘা দিলে অচলায়তন সমাজ তাহা সহ্য করিবে না । সমাজের শতকরা প্রায় ৯৫ জন নিরক্ষর ; এবং নিরক্ষরগণ প্রায়ই ধর্ম্মান্ব হন । এমনতাবস্থায় তুমি আমি রাগ শ্রাম যত্ন হরি এবং এইরূপ কয়েকজন সাম্যবাদী সাম্যবাদের নামে অনাচার ও কদাচার করিতে আরম্ভ করিলে সমাজ তাহা অনুমোদন করিবে না—এবং শুধু তাহাই নহে, সহ্যও করিবে না । শিশুর অজ্ঞতা, বালকের চপলতা ও যুবকের উচ্ছৃঙ্খলতা লইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পদে পদে সমাজের অনিষ্টই করিবে—কল্যাণ কিছুমাত্র হইবে না । অগ্র সমাজের কল্যাণ চিন্তা কিছু দিনের জন্ত ত্যাগ করিয়া হিন্দু তুমি, আগে হিন্দু সমাজের জায় অগ্রায়—মঙ্গলামঙ্গল—ভাল মন্দের ভাবনা ভাবিতে শেখ । হিন্দুর সমস্তান তুমি, হিন্দু সমাজস্থ অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তার দোষ দূর করিতে মনোযোগী হও । অগ্র সমাজের ভাবনা পরে ভাবিও । তাহারা কি তোমাদের সমাজের ভাল মন্দ ভাবিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতে বসিয়াছে ? নিজের ভাই ভগ্নী মাতা পিতার মুখে ক্ষুধার অন্ন—পিপাসার জল না দিয়া কুশিয়ার চুর্ভিক্ষে অর্থ প্রেরণ করা মহা সাম্যবাদ ও মহা উদারতার পরিচায়ক

হইলেও উহা স্মৃত্যাতা কিম্বা স্মৃপুত্রের উপযুক্ত কৰ্ম্য নহে । অগ্রে নিজ নিজ গৃহ পরিবারের, নিজ নিজ সমাজের জাতির স্বীয় স্বধৰ্ম্মাবলম্বী ভাই ভগিনীগণের সংস্কার সাধন করিয়া,—নিজের ভাইকে ভাই বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া তারপর বিমাতার পুত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ দৃঢ় করিতে হইবে । আমার দেহের সমরক্ত সহোদর ভাইদের ত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে লাথি মারিয়া দূরে সরাইয়া দিয়া, ঘৃণা অবজ্ঞায় অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া, গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া পাড়াপ্রতিবাসীদের লইয়া ঘর করিতে,—উদার সাম্যবাদী হইতে কে উপদেশ দিবে ? সাহা স্মবর্ণবণিক কাপালী নমঃশূদ্র পাটনী পোদভাইদের আমরা জল-চল করিয়া না লইয়া—দূর সম্পর্কিত বিদেশাগত ভাইদের একেবারে ভাত-চল করিতে গেলে পণ্ডশ্রম হইবে মাত্র,—লাভ কিছুই হইবে না । কোন ধীর স্থির বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ইহা সমর্থন করিবেন না । ইহাতে ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ হইয়া দাঁড়াইবে । আমরা সাম্যবাদী হঠাৎ দেশভক্ত ভাইদের জিজ্ঞাসা করি—তোমরা তোমাদের পাড়া-প্রতিবাসী স্বধৰ্ম্মাবলম্বী গো বিপ্ররক্ষক—গো বিয়ুপূজক সাহা স্মবর্ণবণিক কাপালী কৈবর্ত-ভাইদের দূরের কথা—তাহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের জল-চল করিয়া লইতে পারিয়াছ কি ? তোমার বাড়ীর কাছেই গ্রহ বিপ্র দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে কুয়া ছুঁইবার অধিকার দিতে পারিয়াছ কি ? সমাজের এই বীভৎস অত্যাচার বিরুদ্ধে জীবনে কখনও দল বাঁধিয়া তুমুল আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছ কি ? সে সাহস—সে শক্তি—সে মনোবল—সে উদারতা—সে স্বধৰ্ম্ম ও স্বজাতীয়ত্ব বোধ তোমাদের আছে কি ? নীরব রহিলে কেন, উত্তর দাও । বুঝিয়াছি তোমাদের কাহারও সে ক্ষমতা নাই । থাকিলে হিন্দু সমাজের তথা হিন্দুস্থান ভারতবর্ষের এ দশা ঘটিত না ।

আর এক কথা অস্পৃশ্যতা দূরকরণ অর্থে কেহ যেন—কোন পণ্ডিত যেন একেবারে ভাত-চল হওয়া বুঝিয়া না বসেন । ভাত চল হওয়ার ঢেব

দেবী । ছ'দশ শতাব্দী অস্তে যদি হয় তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিবেন । শত শত শতাব্দী অতীত হইয়াছে—তথাপি বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ ও কামার কুমার তিলি তামুলি গোপ নাপিত প্রভৃতি পরস্পর জল-চল বিশিষ্ট জাতিগণের মধ্যে ভাত-চল হয় নাই । অন্য জাতির মধ্যে দূরে থাকুক এক প্রদেশের ব্রাহ্মণের মধ্যে অন্য প্রদেশের ব্রাহ্মণের ভাত-চল নাই । শীঘ্র যে সে সম্ভাবনা আছে—তাহারও কোন লক্ষণ বা সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না । সে জন্ত বলি—আপাততঃ ভাত-চলের আশা ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্থান না দিয়া—সেইরূপ কোন মহৎ চেষ্টায় মাথা না ঘামাইয়া বঙ্গের বা ভারতের অনাচরণীয় ভাইদের অগ্রে জনাচরণীয় করিয়া লইবার জন্ত সকলে দলবদ্ধ ভাবে ভারতের সমুদয় হিন্দুজাতি চেষ্টিত হউন, ইহাই প্রার্থনা ॥

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছেন—

“ভারতে হিন্দুগণের নামে স্পর্শদোষের দোহাই দিয়া ঘোর পাপাচার চলিতেছে । এই সমস্তার সন্তোষজনক সমাধান যতদিন না হয়, ততদিন ভারতবাসী কোনরূপ স্বায়ত্তশাসন লাভের উপযুক্ত হইবে না । আমি হিন্দুধর্মের অনুশাসন ও ভারতবাসীর আচার-পদ্ধতি নিবিষ্টভাবে অনুবর্তন করি এবং সনাতন হিন্দুর বর্ণাশ্রম ধর্ম মানিয়া চলি । ফলে বিবেকবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, প্রকৃত আনুষ্ঠানিক (orthodox) হিন্দু, স্পর্শদোষ না মানিয়াও নিজের ধর্ম সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে পারেন । হিন্দু সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পরস্পরে বৈবাহিক আদান প্রদান বা একত্রে পান ভোজন, হিন্দুত্বের উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শানুযায়ী নিষিদ্ধ হইলেও, কাহাকে অস্পৃশ্য মনে করা পাপজনক ; অথচ এই পাপ হিন্দু সমাজে অবাধে চলিয়াছে । পরলোকগত মনিষী গোখলে বলিতেন যে, হিন্দুরা স্বদেশে জাতভাইদের ঘৃণা করিয়া যে দারুণ পাপ অর্জন করে, তাহার প্রতিফল দক্ষিণ আফ্রিকায় ও অন্যান্য উপনিবেশে স্পর্শদোষে আসলে উত্তল

হয়। আমি ভারতের নিগৃহীত ও নিগ্রহকারী—এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা এযাবৎ অনুষ্ঠিত অম্পৃশ্যতা পাপের প্রায়চিত্ত স্বরূপ এই আত্মশুদ্ধিমূলক মহান্দোলনে—এই আত্মোন্নতির চেষ্টায় অগ্রসর হউন ; নচেৎ পরিত্রাণ নাই।”

(মহাত্মা গান্ধীর জীবনী ১০৮ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও বলিয়াছেন—“যাদের পতিত বলিয়া, অম্পৃশ্য বলিয়া দূরে রাখিয়াছ তাদের কাছে ডাক, ভাই বলিয়া আলিঙ্গন কর, সমগ্র ভেদ দূর কর।”

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার ‘ইয়ং ইণ্ডিয়া’য় লিখিয়াছেন—“যদি হিন্দু সমাজ অম্পৃশ্য ও জল অনাচরণীয় জাতিগুলিকে পাংক্ত্রয় করিয়া না লয়, যদি হিন্দুরা তাহাদের সমাজভুক্ত অম্পৃশ্য জাতিগুলিকে বহুকালের অবজ্ঞা ও ঘৃণার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তুলিয়া না ধরে, তাহা হইলে এক বৎসরেই বল—আর ১০০ বৎসরেই বল, স্বরাজ আমরা লাভ করিতে পারিব না।”

“আমরা যতদিন আমাদেরই দেশের কতকগুলি লোককে এই ভাবে মানব সমাজের বহির্ভূত বলিয়া মনে করিব, তাহাদের অঙ্গস্পর্শে নিজদিগকে অপবিত্র জ্ঞান করিতে থাকিব, ততদিন আমাদের স্বরাজের পথে উন্নতিলাভের আশা নাই। আমাদের এই কপট ব্যবহারের জন্তই আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া এই ছুৰ্ত্তোগ ভুগিতেছি।

অম্পৃশ্যতা ধর্মের অঙ্গ নহে, এ শয়তানী। শয়তানী করিয়া শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের আসন গায় ও সত্যের উপরে নহে। শাস্ত্র কেবল যুক্তিকে পবিত্র ও সত্যকে আরও সপ্রকাশ করিবার জন্তই।

অম্পৃশ্যতা চালাইতে দিয়া হিন্দুধর্ম পাপগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা আমাদেরকে অবনত করিয়াছে, আমাদেরকে সাম্রাজ্যের পারিয়া করিয়া দিয়াছে। আশ্চর্য্য মুসলমানগণও আমাদের নিকট হইতে এই সংক্রামক পাপটি পাইয়াছেন।

তাই দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা ও কানাডায় হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই পারিয়ার মত ব্যবহৃত হইতেছে ।

এই অস্পৃশ্যতা পাপ দূর না হইলে স্বরাজ পাওয়া যাইবে না । যুধিষ্ঠির তাঁহার কুকুরটিকে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতে চাহেন নাই । আজ যুধিষ্ঠিরের বংশধরেরা অস্পৃশ্যদিগকে বাদ দিয়া কিরূপে স্বরাজলাভ করিবার আশা করেন ?

আমরা আমাদের ভাইদের চাপিয়া রাখিবার অপরাধে অপরাধী । আমরা তাহাদিগকে বুকে হাঁটাইতেছি, নাকে খৎ দেওয়াইতেছি । আমরা রক্ত চক্ষু দেখাইয়া তাহাদিগকে রেলের কামরা হইতে ঠেলিয়া দিই । ব্রিটিশ শাসনে ইহার বেশী কি আমাদের করিয়াছে ? আমাদেরকে এ পাপ প্রথা পরিত্যাগ করিতে হইবে । এ দোষ দূর করিতে না পারিলে আমরা স্বরাজ পাইয়াও রাখিতে পারিব না । আমরা আমাদের ছর্ব্বা ভাইদের প্রতি অবিচার করিয়াছি, তাহার প্রতিকার না করা পর্যন্ত আমরা পশুর মধ্যেই গণ্য থাকিব । স্বরাজ পাইবার পূর্বেই আমাদেরকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে ।

এই অস্পৃশ্যতা ধর্ম্ম জগতে বিঘ্ন অন্তরায়, রাজনীতি-ক্ষেত্রে আত্মহত্যার মত এবং ঐতিহাসিক হিসাবে একটা মিথ্যা বস্তু । কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, আর্য্যরক্ত অন্ত্রাশ্রদের মিশিতে দেওয়া ঠিক নহে ; কিন্তু সে পবিত্র আর্য্য আজ কোথায় ?

এই মিথ্যা অস্পৃশ্যতা আবার শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বজায় রাখিবার চেষ্টা করা হয় । যদি আমরা জাতীয়তা ক্ষেত্রে প্রকৃতই কিছু করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি, তাহা হইলে এ দূষিত ক্ষতস্থান আরোগ্য করিতেই হইবে ।*

* গুজরাট বিদ্যাপীঠের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ ।—
দৈনিক বহুমতী ।

“জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতার দ্বারা এদেশের অধঃপতন যে কত দূরে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সম্প্রতি মাদ্রাজের একটি ব্যাপারের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ত্রিচূড়ের সংবাদে প্রকাশ, পুছুকোটা গ্রামের জনৈক নান্দুজি ব্রাহ্মণ মহিলার একজন নাগার চাকর ছিল। একদিন এই চাকরের মাথা হইতে তিনি একটি তরিতরকারীর বাঁকা নাগাইয়া লইয়াছিলেন, এই অপরাধে সমাজ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করে। এরূপ খামখেয়ালি অনুদার সমাজের নমুনা জগতের আর কোথাও মেলে না। আর এইটাই সমাজের বিশিষ্টতা মনে করিয়া আমাদের ধর্মধবজীরা গর্ব করেন। নান্দুজি ব্রাহ্মণ মহিলাটি সমাজের এই অত্যাচার কষাঘাতকে অগ্রাহ্য করিয়া মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বাঁহাদের মন স্বাধীন তাঁহারা কখনো এই সব অত্যাচার বরদাস্ত করিতে পারেন না। হিন্দু সমাজ তাহার অচলায়তনের প্রাচীরটা সঙ্কীর্ণতার দ্বারা যতই উঁচু করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, তাহার জন-বল ততই কমার দিকে বুঁকিয়া পড়িতেছে। * * * তথাপি এদিকে সমাজের কোন হুঁস নাই। *”

“উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সর্বদা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের উপর অথবা উৎপীড়ন করিয়া থাকেন এবং তাহাদের ঘৃণার চক্ষেও দেখেন। এমন কি কোন হিন্দু নাপিত অথবা ধোপা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের কাজ করে না; অথচ ইহারাই মুসলমান বা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিলে হিন্দু ধোপা ও নাপিতগণ বিনা আপত্তিতে তাহাদের সেবা করিবার জন্য উদগ্রীব হয়। হিন্দু সমাজের এই আত্মঘাতী নীতির ফলে দিন দিন হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে এবং নিম্ন শ্রেণীর বহু হিন্দু অনন্তোপায় হইয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিতেছে। আমাদের ধারণা ছিল যে, মাদ্রাজে উচ্চ বর্ণ ও নিম্ন বর্ণের ভেদ বাঙ্গলা দেশ হইতে অধিক। এই বিষয়ে বাঙ্গলাও মাদ্রাজ হইতে পশ্চাৎপদ নহে।

* অস্পৃশ্যতার অত্যাচার, প্রবাসী, মার্চ, ১৩২৯।

আমরা অন্ত্র এই সংবাদটী প্রকাশিত করিলাম । পাঠক দেখিবেন, আমাদেরই অনুদারতার ফলে দিন দিন হিন্দু সমাজের কি সর্বনাশ হইতেছে ।

বাহালী নাপিত ও ধোপা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলের কার্য্যই করে, কিন্তু করে না কেবল ইহাদের । একজন হৈহয় ক্ষত্রিয় যতক্ষণ হিন্দু থাকিবে, ততক্ষণ কোন নাপিত তাহাকে কামাইবে না ; কোন ধোপা তাহার কাপড় কাটিবে না ; কিন্তু যেই সে খৃষ্টান কিম্বা মুসলমান হয়, অমনি তাহার পক্ষে নাপিত ধোপা পাওয়ায় আর বিঘ্ন থাকে না । বর্ত্তমানে ধোপা, নাপিত, বাদ্যকর, পুরোহিত, দেবমন্দির—সকল হইতেই হৈহয় ক্ষত্রিয় বঞ্চিত । ব্রাহ্মণ ইহাদের পৌরহিত্য করিলে সে ব্রাহ্মণের হাতের জল অম্পৃশ্য বিবেচিত হয়, হৈহয় ক্ষত্রিয় জুতা খড়ম পায় দিয়া উচ্চবর্ণের হিন্দুর বাড়ীতে গেলে তাহা নিতান্ত অসহনীয় হয় । হিন্দুর প্রতি হিন্দুর এই প্রকার অবজ্ঞা, তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ফলে বহুলোক ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছে ;—মুসলমান ও খৃষ্টান হইতেছে । কুড়িগ্রাম পোষ্টের অধীন ভোট জাতীয় সমস্ত হিন্দুরা মাত্র দুই বৎসর পূর্বে একদিন একযোগে সকলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে ।*

“আহার, জলপানসম্পর্কে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, মনুষ্যত্বকে অপমান না করিয়া, প্রয়োজন মত পছন্দ অনুসরণ করিলেই হইল । আমাদের মনে হয়, বাঙ্গলার কোন জাতিকে জল অনাচরণীয় ও অম্পৃশ্য বদিয়া কোন জাতির ঠেকাইয়া রাখা উচিত নহে । তা’ ব্রাহ্মণোত্তমই হউক, আর চণ্ডালাধমই হউক—মানুষের নিকট মানুষের ব্যবহার পাইবার দাবী ও অধিকার এ যুগে সকলেরই আছে—ইহাই যুগধর্ম্ম । কালপুরুষের ইঙ্গিত—বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের অধিকাংশ জাতি আর পতিত-পর্য্যায়ভুক্ত থাকিবেন না । স্ব স্ব বর্ণোচিত শিক্ষা ও দীক্ষা আয়ত্ত করিবার যে উৎসাহোচ্ছ্বল

* আনন্দবাজার পত্রিকা, ফাল্গুন ১৩২৯ ।

উদ্যম তাঁহাদের মধ্যে জাগিয়াছে,—কোন হাশ্বকর মূঢ়তা তাহা বাধা দিতে পারিবে না । আমরা সেই ভরসাতেই বাঙ্গলার হৃদয়বান যুবক-শক্তিকে পুনঃ পুনঃ জাতীয়-চরিত্র হইতে ছুঁৎমার্গের জঘন্ত লজ্জা চিরতরে মুছিয়া ফেলিবার জন্য আহ্বান করিতেছি । আভিজাত্য ও কাঞ্চনকৌলিচের খুঁটা অহঙ্কার ভুলুপ্তিত হউক, বাঙ্গলার বুকে মনুষ্যত্বের মহিমা অভ্রভেদী শির তুলিয়া গৌরবগর্বে দণ্ডায়মান হউক । সকলের শুভ ইচ্ছা এই শুভদিনকে নিকটবর্তী করুক । আমরা প্রীড়িত মনুষ্যত্বের মুক্তি ও শ্রায়ধর্মের জগত-উপপ্লাবী মহালীলা প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হই, কৃতার্থ হই ।” *

অম্পৃশ্যতারূপ মহাপাপ ভারতবর্ষ হিন্দুস্থানকে ডুবাইয়াছে, মুষ্টিমেয় বিদেশী বিজাতি ও বিধর্মী ৩৩ কোটি নরনারীর উপর একাধিপত্য করিতে সক্ষম হইতেছে । অম্পৃশ্যতার মহাপাপ কোটি কোটি হিন্দুকে পরাজিত ও পরাধীন করিয়াছে এবং দিন দিন ধ্বংস করিতেছে । বিগত সাত শত বৎসরে ৬০ কোটি হিন্দু ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এবং কমিয়া ২২ কোটিতে পরিণত হইয়াছে এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । বিগত ৫০ বৎসরে ৫০ লক্ষ ভিন্ন ধর্মী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং ৫০ লক্ষ হিন্দু সন্তান এই বঙ্গদেশে—কমিয়া গিয়াছে । হিন্দু সমাজপতিগণের অত্যাচারে জর্জরিত ও উৎপীড়িত হইয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারী খুষ্টান হইয়া গিয়াছে এবং প্রতি দিন গড়ে ৩৫২ জন কমিয়া খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিতেছে । হিন্দু সমাজের মনস্বী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ হিন্দুর ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আকুল । বিরাট হিন্দু জাতিকে এই ক্ষয় ও ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিগত ভাদ্র মাসে (১৩৩০) পূর্ণীভূমি কানীধামে ভারতের সর্ব প্রদেশের হিন্দু নেতৃবর্গ, মহাগোপাধ্যায় পণ্ডিত গুণ্ডলী একত্র হইয়াছিলেন—হিন্দু মহাসভার সপ্তম অধিবেশনে । পুনরায় গত ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯২৪ সালে) তীর্থরাজ প্রয়াগধামে অধিল ভারতীয়

হিন্দু মহাসভার বিশেষ অধিবেশনে ভারতের সকল প্রদেশের মাধু সন্ন্যাসী, প্রধান প্রধান মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং হিন্দু সমাজের অগ্রণী, প্রতিনিধি ও নেতৃবর্গ একত্রিত হইয়া অস্পৃশ্যতা বর্জন ও শুদ্ধি বিষয়ক প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণপূর্বক সকলকে অবজ্ঞাত শ্রেণীর নর-নারায়ণ-দেব বিদ্যালয়ে ও দেব মন্দিরে প্রবেশাধিকার দান এবং ছুঁৎমার্গ পরিহার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি আজ ৪ বৎসব ধরিয়া অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রস্তাব প্রতি বর্ষে গ্রহণ করিতেছে এবং সকলকে অস্পৃশ্যতা বর্জনে আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ করিতেছে। রাষ্ট্রীয় সমিতির কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রত্যেকেই আপন আপন জীবন ও আচরণ দ্বারা অস্পৃশ্যতা বর্জনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন। ভারতের সহর ও নগর হইতে অস্পৃশ্যতা তিরোহিত হইয়াছে উহা দূর পল্লিতে মাত্র আছে। আমরা আশা করি প্রত্যেক পল্লী হইতেই এই পাপ অচিরাৎ পলায়ন করিবে। ভারতের সপ্ত কোটি অস্পৃশ্য ভ্রাতা ভগিনীগণের মর্মস্কন্দ বেদনা দয়াল হরির স্বর্গ সিংহাসনে পৌছিয়া তাঁহার কোমল প্রাণকে দ্রবীভূত করিয়াছে। এই বার সর্ব ছুঁথের অবমান, সর্ব তাপের প্রশমন ও সর্ব বেদনার নিবৃত্তি। এই সাত কোটি নরনারীকে মানবের জন্মগত স্বাভাবিক অধিকার দান করিয়া তাহাদিগকে ভাই ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করতঃ আমরা নব বলে নূতন শক্তিতে স্বরাজ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। অধিকার না দিলে অধিকার পাইবার কোন আশা নাই। দেওয়া এবং পাওয়া ইহাই সনাতন নিয়ম। আমরা অধিকার দিব না, অধিকার পাইব ? এক গ্লাস জল দানের, একটা শব্দ উচ্চারণের, একখানা পুস্তক পাঠের তুচ্ছ অধিকার আমরা দিব না—কার বিদেশী বিধর্মী বিজাতি ইংরাজ গোটা ভারত রাজ্যের অধিকার আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন—এরূপ আশা করা কি পাগলামি নহে। অস্পৃশ্যতা ও বর্তমান অত্যাচার অত্যাধ্য জাতিভেদের মহাপাপে এ দেশ ডুবিয়াছে। ইহার

আশু প্রতিকার চাই । নমঃশূদ্র, পোদ, মালী, পাটনী প্রভৃতি সমাজের ও জাতির অশেষ উপকাৰী, নিত্য সেবাপরায়ণ সরল অকপট ভাইদিগকে ধোপা, নাপিত, বেহারা দিতে হইবে । সকলকে ভাই বলিয়া টানিয়া তুলিতে হইবে । কাহাকেও বাদ দিয়া স্বরাজ্য সংগ্রামে জয়ের আশা নাই । অম্পৃশ্যতা বর্জন ব্যতীত ২২ কোটি স্বজাতীয় হিন্দু নরনারীর মধ্যে প্রকৃত জাতিবদ্ধ ও আপন বুদ্ধি জাগ্রত হইবে না । হিন্দু জাতির এই ঘোর দুর্দিনে প্রত্যেক জাতিকে আপন আপন জাত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া পরবর্তী ছোট ভাইদের জলচল করিয়া লইতে হইবে । ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কামার, কুমার, তিলি, তামুলি, নাপিত, মোদক, গন্ধ বণিক প্রভৃতি জলাচরণীয়গণ এই দণ্ডে স্তবর্ণ বণিক, সাহা, কপালী, মাহিয়া, (আদি কৈবর্ত) বালমাল, সূত্রধর প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের জলচল করিয়া লইবেন এবং স্তবর্ণ বণিক, সাহা, মাহিয়া (আদি কৈবর্ত) কাপালিকগণও আবার এই দণ্ডে,—সঙ্গে সঙ্গে নমঃশূদ্র, পোদ, পাটনী, মালী, রজক প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের জলচল করিয়া লইবেন । এইরূপ ভাবে নমঃশূদ্র, পোদ, পাটনী, মালী, রজক, ভ্রাতৃগণ তাঁহাদের অপেক্ষা অমুন্নত ও অবনত—দাস্তিত ও অবজ্ঞাত কোনাই, বেহারা, তুলি, চর্ম্মকার ও হাড়ি ভাইদের জলচল করিয়া লইবেন । এমনি কবিরাই সমুদয় অচল জাতির জলচল করিয়া লইতে হইবে । যদি কোন সম্প্রদায় ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ ভ্রাতৃগণের জলপানে অসম্মত ও কুণ্ঠিত হন—তাহা হইলে তাঁহাদের পক্ষে উচ্চ জাতিগণের নিকট জলচলের দাবী করা সঙ্গত ও শোভন হইবে কি ? তাঁহারা এই কথাটা নিজেরাই ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । অধিকার না দিলে অধিকার মিলিবে না—অধিকার দিলে তবে অধিকার পাওয়া যাইবে । ভারত জননীর সুসন্তানগণ কোটি কোটি অম্পৃশ্য ভাইদের তুলিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন । তাঁহারা বুঝিয়াছেন সর্ব জাতির উত্থান ও মুক্তির উপরই ভারতের অভ্যুত্থান ও মুক্তি নির্ভর করিতেছে । কারণ কাহাকেও বাদ দিয়া—পরিত্যাগ করিয়া কাহারও

উঠিবার সাধ্য নাই । ভারত শুধু উচ্চ জাতিরই নহে—ভারত আচণ্ডালের ভারত ।

অতএব নিবেদন, এই দণ্ডে—এই মুহূর্ত্ত হইতে ইহাকে সমাজ হইতে দূর করিতে হইবে । কোন দোহাই, কোন যুক্তি, কোন শাস্ত্র আমরা শুনিব না । ইহার অনুকূলে কোন যুক্তি ও ত্রাণ থাকিতে পারে না । ইহা জীব-ব্রহ্ম, নর-নারায়ণবাদ অতল সাগরে ডুবাইয়া দিয়াছে, শাস্ত্রের মহিমা ও মর্যাদা ধ্বংস করিয়াছে—অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজকে স্বর্গের নন্দন কানন হইতে নরকে নিক্ষেপ করিয়াছে । মহাসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে—সকলের জলই সকলে খাইতে পারে, ইহাতে কোন দোষ বা পাপ নাই । আত্মন, আমরা সকল জাতি—সমগ্র হিন্দু সমাজ মিলিয়া এই পাপ প্রথা উঠাইয়া দেই, সকলের হাতের জল সকলে খাই । এই প্রকারে ভারত হইতে জাতিদ্বেষ—জাতি হিংসা—দূর করি । যাহারা এ বিষয়ে বিকদ্ধাচরণ করিবে, তাহারা দেশের শত্রু, জাতির শত্রু, স্বাধীনতার শত্রু ।

ঘরে বিড়াল, বেজী, সাপ, কুকুর গেলে, ছাগল, ভেড়া, ইন্দুর গেলে কৈ কাহারও ত ভাত ডাল দ্রব্য জল নষ্ট হয় না,—আর মানুষ গেলে নষ্ট হইবে ? মানুষ কি তবে ছাগল ভেড়া বিড়াল বেজী অপেক্ষাও অপবিত্র, ঘৃণিত ও দূষিত ? দেবমন্দিরে পশু পক্ষী গেলে দেবতা অশুদ্ধ হয় না—কিন্তু মানুষ গেলে দেবতা অশুদ্ধ, অপবিত্র হয়,—শাদগ্রামকেও পঞ্চগব্যে শুদ্ধ করিতে হয় । তবে কি বুঝিব, মানুষ পশু পক্ষী অপেক্ষাও অধম, হীন অপবিত্র ? ভাই সকল, এই সব পাপাচারেই হিন্দু জাতি ডুবিয়াছে । পদাধাতে এই সব পাপাচার, দেশাচার, অনাচার, অত্যাচার, স্ত্রী-আচার, লোকাচার ভাঙ্গিতে হইবে । “ধর্ম্ম মার্গ, জ্ঞান মার্গ, যোগ মার্গ, ভক্তি মার্গ সব পলায়ন, আছে কেবল ছুঁৎমার্গ ; আমায় ছুঁওনা—আমায় ছুঁও না সব ব্রহ্ম এখন ব্রহ্মলোকেও নাই, গোলকেও নাই, বুনি ঋষির হৃদয়কন্দরেও নাই—যাগ যজ্ঞ

তপস্শায় নাই ! ব্রহ্ম এখন রাগাঘরে, ব্রহ্ম এখন ভাতের হাঁড়িতে ।” কে বড়, কে ছোট, কে উচ্চ কে নীচ, কে শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট—সকলেই ভগবানের সম্মান—বিরাট পুরুষের দেহজ—আত্মজ । কাহাদের ঘৃণা করিব ? যাহাদের না হইলে সমাজের এক দণ্ড চলে না, যাহাদের হাড়ভাঙ্গা কঠিন পরিশ্রমের উপর আহার বিহার, অন্ন জন, ভোগ বিলাস নির্ভর করিতেছে,—যাহারা দেশের মেরুদণ্ড, রক্ত মাংস মেদ অস্থি—যাহারা দেশের সর্বস্ব, প্রাণ, আত্মা, তাহাদিগকে কি আমরা ঘৃণা করিতে পারি ? স্বজাতি, স্বধর্মাবলম্বী এবং স্বদেশবাসী ভাই ভগিনীগণকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করার মহাপাপেই না ভারত ডুবিয়াছে । ভারতবর্ষের যাহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষ,—ভারত জননীৰ যাহারা শ্রেষ্ঠ সম্মান—সেই মহাত্মা গান্ধী—তিলক, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ সকলেই অম্পৃশ্যতার ঘোর বিরোধী । আমরা কাহার কথা শুনিব ? মহা মনোযি মদন মোহন মালব্য, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কথা শুনিব, না তর্কবাগীশ তর্করত্নের কথা শুনিব ? তর্করত্নের যুগ গিয়াছে,—এখন শ্রায়রত্নের যুগ । এ যুগে অন্তায়, অসত্য, কাপট্য, ভণ্ডামী চলিবে না । তোমার তলে তলে সব চলে,—আর প্রকাশে জলটুকু চলিবে না ? এখন আর কাপট হিন্দুয়ানী চলিবে না । ভণ্ড আখ্যামীর যুগ গিয়াছে । এখন সত্য ও যুক্তির যুগ । এই বঙ্গদেশে ২ কোটি হিন্দুর মধ্যে ৫০ লক্ষ মাত্র—আচরণীয় ; অবশিষ্ট দেড় কোটিই অনাচরণীয় ; ৪ ভাগের ৩ ভাগকেই আমরা পশুর অধম করিয়া পায়ের নীচে দাবাইয়া রাখিয়াছি । এই এক কোটি ৫০ লক্ষ লোককে বাদ দিয়া—হীন করিয়া রাখিয়া আমরা কিছুতেই বড় হইতে, - নীচিয়া থাকিতে পারিব না । ইহাদিগকে এই দণ্ডে বুকে তুলিয়া লইতে হইবে, - শ্রীবুদ্ধ শ্রীগৌরাজের প্রেম লইয়া ইহাদের দ্বারে দ্বারে যাইয়া—ইহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে । প্রেমের অমৃত প্রলেপে যুগ যুগান্তরের ঘৃণাবমাননা হিংসা দ্বেষ ক্ষত বিক্ষত প্রাণের ব্যথা, বেদনা

দূর করিয়া—আরোগ্য কবিয়া তুলিতে হইবে। ২২ কোটি হিন্দুকে এক করিতে হইবে। কাজ শক্ত,—পথ কণ্টকাকীর্ণ, বাধা বিঘ্ন পদে পদে—তবু আমরা এই পথেই যাত্রা করিব। পার্থ সারথী আমাদের পশ্চাতেই আছেন—তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক,—নেতা, পরিচালক এবং এই জ্ঞান সত্য ও ধর্ম-যুদ্ধের সেনাপতি। মানুষের—সমাজপতিগণের কি সাধ্য আমাদের গতিরোধ করে। দেশকে আমরা তুলিবই তুলিব, ভারতের মুক্তি আনিবই আনিব। আমরা জ্যোতির সন্তান, আমরা কাহাকে ভয় করিব—গ্রাস্ত করিব।

অম্পৃথতা বর্জন কথাটা শুনিয়াই হয়ত অনেকে চমকিয়া উঠিবেন, নাসিকা কুণ্ঠিত করিবেন, লেখককে কালাপাহাড় বলিয়া ঘোর কলির আগমনের স্বপ্ন দেখিবেন। অনাচরণীর জল পান করা দেশাচার ও লোকাচার বিকল্প হইলেও অশাস্ত্রীয় নহে। আমরা শাস্ত্র শাস্ত্র করিয়া চীৎকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রকে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ভক্তি করি না। স্বার্থ বজায় রাখিবাব উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে শাস্ত্রের শ্লোক আওড়াইয়া থাকি মাত্র, ফলতঃ শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস আমাদের অনুমাত্রও নাই। শাস্ত্র অপেক্ষা লোকাচার, স্ত্রী-আচার, দেশাচার ও অজ্ঞান আচার অবিচারের আমরা অধিক ভক্ত—লোকাচার ও দেশাচারের দাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ শাস্ত্রের দোহাই সকলেই দিতেছে। সংহিতাদির মধ্যে মনুসংহিতা শ্রেষ্ঠ। মনুর নামে সমাজপতিগণের মুখে জল আইসে, কণ্ঠ গদগদ হইয়া উঠে। সেই মনু মহারাজ জলকে সচল কবিয়া গিয়াছেন। মনু বলিতেছেন :—

এধোদকং মূলফলমন্নমভ্যাদ্যতঞ্চ যৎ ।

সর্বতঃ প্রতিগ্রহীয়াধ্যবথ্য ভয় দক্ষিণাম ॥২৪৭

শয্যাং গৃহান্ কুশান্ গন্ধানপঃ পুষ্পং মনীন্ দধি ।

ধানা মৎস্তান্ পয়ো মাংসং শাকৈশ্চৈব ন নিতুর্দৈ৯ ॥২৫০

(চতুর্থ অধ্যায় ; মনুসংহিতা ।)

“কাষ্ঠ, জল, মূল, ফল ও খাদ্য যাহা অযাচিতভাবে আপনা আপনি উপস্থিত হয়, এই সকল এবং মধু ও অভয় দান, সকলের নিকট হইতেই প্রতিগ্রহ করা যায় ।” “শয্যা, গৃহ, কুশ, কপ্পুরাদি, গন্ধদ্রব্য, জল, পুষ্প, মণি, দধি, ধাত্রা, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ ও শাক এ সমুদায়ও অযাচিতভাবে উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যান করিবে না ।”

শাস্ত্রসর্বস্ব, বচনবাগীশগণ, মন্থর বচন মানিতে প্রস্তুত আছেন ত ? শাস্ত্র বলেন—মদ্যপায়ী এবং মদ্যপায়ীর সংস্রবকারিগণ মহাপাপী, দণ্ড—প্রাণদণ্ড । “পাচক (রান্নাধুনী) ভ্রাক্ষণের অন্ন ভোজনে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত ।” (অত্রি সংহিতা ৯২) শূদ্র সেবায় (স্নেহেণ ত কথ্যাই নাই) চান্দ্রায়ণ (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা) । লগুন, পলাণ্ডু ভোজনে চান্দ্রায়ণ । হংস, কপোত, মৎস্য, মাংস ভোজনে দ্বাদশাহ উপবাস (উশনঃ সংহিতা, নবম অধ্যায়) । এই ত শাস্ত্রের আদেশ ও উক্তি । আপনাবা যখন শাস্ত্রের কোন আদেশই পালন করিতে সমর্থ নহেন—তখন বাড়াবাড়ি না কবিয়া দেশের এই ঘোর সঙ্কট সময়ে সপ্ত কোটি অম্পৃষ্ঠ ভাইদেব বাহুপাশে বুকে টানিয়া আনুন । অম্পৃষ্ঠতারূপী মহাপাপ ভারত মহাসাগরে ডুবাইয়া দিন ।

এই অম্পৃষ্ঠতার মহাপাপ সম্বন্ধে পৃথ্বীরাজের মহাকবি অশ্রুতকর্ণে গাহিয়াছেন—

“কহিলা মহর্ষি ; বৎস । অম্পৃষ্ঠ পারিয়া ।
বিপ্রগ্রামে বাপী-স্পর্শে নাহি অধিকার ;
তাই ছুটিয়াছে নারী নদী-জল পানে ।
পাপিনীর পাপদৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণবো ধনি
পড়ে দৈবে, অপবিত্র হইবে সকল ;
তাই উত্তেজিত বিপ্র খেদাইল তা’রে ।
জান কি এ পারিয়ায় ? এই জাতি মাঝে

জন্মেছিল তিরুবল্ল, জ্ঞানে ঋষিগম ;
 এই জাতি সমুদ্ভূতা, ভক্তি মূর্তিমতী,
 আবেয়া, কবিতামৃত বিতরি' জ্বিড়
 করেছিল মধুগয় ; তবু দশা হেন ।
 'দয়া মূল ধর্ম্য' এই শাস্ত্রের বচন ;
 কিন্তু বল, কোথা দয়া ? কুকুর-ভোজন
 নহে দূষা ; দূষ্য নরশিশুর ভোজন ।
 বিশ্ববন্ধু বিপ্র, হেব ব্যবহার তাঁ'র ।
 আছে শাস্ত্রবাণী, সত্য, গুণ কর্মবশে
 জাতি-সৃষ্টি ; বিচাৰিয়া কিন্তু বল তুমি
 জাতি-দর্প, জাতি-দেষ কোন্ শাস্ত্রবাণী ?
 কোন ঋষি হেন শাস্ত্র কবিতা প্রচার ?
 নিজে নব নারায়ণ বিঃঘাষিতা যথা
 অবিভেদে সমদৃষ্টি ব্রাহ্মণে, চণ্ডালে
 জ্ঞানীর লক্ষণ, সেথা বর্করতা হেন ?
 উচ্চ ধর্ম্যনীতি হেন প্রচারিত যথা,
 এই নীচ আচরণ সাজে কি তথায় ?
 ভুলিয়াছে আর্য্যস্বত, দেব রত্নগণ
 চণ্ডালে বাঁধিয়াছিল প্রেম-আলিঙ্গনে ;
 ভুলিয়াছে বুদ্ধরূপী প্রভু বিশ্বস্তর
 উচ্চ নীচ, দ্বিজ শূত্র, সবে সমভাবে
 শিখাইয়া ছিদা নীতি, ধর্ম্য, সদাচার ।
 সর্ব জীবে আত্মরূপে বিরাজিত যিনি,
 দেখ ভাবি', কি বেদনা লাগে তাঁ'র প্রাণে

হেন বৃথা জাতিদর্পে, নির্মম আচারে ।

দর্পহারী তিনি, বৎস ! মহা গদা তাঁ'র,

হয় ত, কখন আসি' পড়িবে সহসা

চূর্ণিতে দর্পীবে, বংশ-পরম্পরাক্রমে ।”

পারিয়াদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করার প্রতিকল—হিন্দুস্থান ও গর্বিত ভারতবাসী হাতে হাতে পাইয়াছে ।

হিন্দুব প্রতি হিন্দুব, স্বজাতীয়ের প্রতি স্বজাতির এই দলন ও গীড়ন, নির্ঘাতন ও দাঙ্ঘনা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া অচতুর ইংবেজ বীর ক্লাইভ তাহাদিগকে সেনাদলভুক্ত করিয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতবাসী দ্বারা ভারতবাসীকে দলনকরতঃ পলাসীর যুদ্ধে হিন্দুব মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছিলেন । * অন্ত্যজ গীড়নের সূত্র ধরিয়া ভগবান্ ইংবাজকে হাত ধরিয়া ভারত সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন—অন্ত্যজের হাতে উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ জাতিগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া । অন্ত্যজ পারিয়া নারায়ণের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞাব ফল—ভাবত এখন হাড়ে হাড়েই উপলব্ধি করিতেছে । ভারতবাসী, উচ্চ জাতিত্বের বৃথা দাবী ও গর্বকারিগণ সাবধান হও । তথাকথিত অন্ত্যজ-জাতাব বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহাদিগকে বৃকে তুলিয়া লইয়া—ভাই বদিয়া ক্রোড়ে ধারণ করিয়া পূর্বপুরুষগণের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর,—শ্রীভগবানের কৃপানীর্বাদ এই পতিত জাতি ও পতিত দেশের উপর বর্ষিত হউক ।

* The Pariahs supplied a notable proportion of Clive's sepoy, and are, still enlisted in the Madras sappers and miners.

Encyclopaedia Britannica Vol. XX. P. 802

ভূদেব অধ্যায় ।

সমাজপতি ব্রাহ্মণের প্রতি নিবেদন ।

সনাতন বৈদিক ধর্মের পরিপোষক ‘কনির দেবতা’ হে পূজনীয় সমাজ-পতি ব্রাহ্মণগণ ! উপসংহাবে আপনাদের শ্রীপাদপদে সর্বশেষে এ দীন সমাজ সেবকের কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে । প্রথমতঃ আদ্যোপান্ত এই পুস্তকখানি পাঠ করিবেন, তারপর ধীরভাবে ইহার প্রতিবাদ কবিত্তে প্রবৃত্ত হইবেন, দুই চারি পাতা পড়িয়াই ধৈর্য্যহীন হইয়া পড়িবেন না । ক্রোধে অধীর হইলে চণিবে না, ধীর স্থির ভাবে হিন্দুজাতি সম্বন্ধে চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে । সমাজপতি হওয়া কেবল মুখের কথা নহে, ইহার জন্ত প্রচুর পরিমাণ হৃদয় শোণিত দানের প্রয়োজন । ফাঁকি দিয়া সমাজপতি হওয়া চলে না । স্বার্থত্যাগ এবং আত্মত্যাগ ভিন্ন কেহ কোন কালে কোন দেশে সমাজপতি হইতে পারেন নাই । আপনাদের সে ‘ত্যাগ’ কোথায় ? কাজের মধ্যে দিবারাত্র কেবল শাস্ত্র শাস্ত্র বলিয়া উচ্চ চীৎকার করিয়া শক্তিক্ষয় করিতেছেন মাত্র । শাস্ত্রের প্রমাণ ভিন্ন আপনারা অতঃ কোন কথা, কোন যুক্তি কানে তুলিতে চাহেন না । জিজ্ঞাসা করি, শাস্ত্র কিছু প্রকৃতরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন কি ? দেশের কল্যাণ বাসনা, সমাজের হিতচিন্তা নাইয়া সমগ্র হিন্দু সমাজের স্বার্থ স্মরণ করিয়া হৃদয় দিয়া হিন্দুশাস্ত্র কখন আলোচনা করিয়াছেন কি ? যদি না করিয়া থাকেন, বুঝি শাস্ত্র পাঠ আপনাদের পণ্ডশ্রম হইয়াছে মাত্র । শুধু, ‘দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যং’ এর জন্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন

করিলে চলিবে না, শুধু ‘অন্নারত্ত’, ‘চুড়াকরণ’, ‘বিবাহ’, ‘শ্রাদ্ধ’, ‘দোল-
ছগৌৎসব’ করাইয়া দশটা টাকা উপার্জন করিলে চলিবে না, শুধু বিরাট
গীতা রাস মহাভারত পাড়িয়া, দুই দশখানা প্রায়শ্চিত্তের পীতি লিখিয়া দিয়া
কিছু আদায় করাই সমাজপতির পক্ষে যথেষ্ট নহে । এগুলি সমাজপতির
কার্য্য নহে, এগুলি ব্যবসাদারের কার্য্য । সমাজপতিত্ব,—এহণে নয় দানে,
ভোগে নয় ত্যাগে, ঘৃণায় নয় প্রেমে, বর্জনে নয় আলিঙ্গনের উপর নির্ভর
করে । আপনাদের যুখে অনবরত শাস্ত্রের দোহাই, অনুষ্ঠাপ ছন্দোবদ্ধ
শ্লোকের ছড়াছড়ি, ঘটক পটহের বাগ্‌বিতণ্ডা শ্রবণ করিয়া যুগপৎ ফোভে
ও ছঃখে ত্রিয়মাণ হইয়া যাই । আপনারাই কি সেই প্রাচীন ঋষিগণের
সন্তান ? সত্যযুগের ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র ত্রিজগতের কল্যাণকামী সত্য জ্ঞানময়
বপুঃ সর্বজীবের অহৈতুক কৃপাপরায়ণ ইহলোকের আদর্শ পরলোক-দ্রষ্টা
দিব্য-চক্ষুস্থান্ আপনারাই কি সেই ব্রাহ্মণ ? তবে কৈ আপনাদের যোগ
তপস্শ্রা, যাগ যজ্ঞ, কৈ আপনাদের হিংসা-বিদ্বেষ-পরিশুদ্ধ পবিত্র মুনিকানন
ঋষির আশ্রম ? কৈ আপনাদের সামগান মুখরিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম দণ্ডকমণ্ডলু
কাষায় কোপীন, বেদ বেদান্তে অগাধ পাণ্ডিত্য এবং কৈ আপনাদের
সর্বোপরি উন্নত মলাট বিশাল উদার বক্ষঃস্থল ! আপনাদের জ্ঞান বিদ্যায়,
সংঘম সাধনায়, আপনাদের শিক্ষায় দীক্ষায়, শাসন সঞ্চালনায় আগাদের
পূর্বপুরুষ আর্য্যজাতির কি উন্নতিই না সাধিত হইয়াছিল ? ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি সম্প্রদায়ের সমভাবে সর্ববিধ উন্নতি বিধান
করিতে আপনাদের পূর্ববর্তী পুরুষগণ—পুতচরিত্র ঋষিগণ—কতই
না *প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন ! জলে স্থলে, অনলে অনিলে, চন্দ্রে
সূর্য্যে, গ্রহে নক্ষত্রে, ভূত্রে খেচরে, কীটে পতঙ্গে যাহারা বিশ্বেশ্বর
শ্রীভগবানের **অপরূপ রূপমাধুরী সন্দর্শনপূর্বক ভাবাবেশে তন্ময়চিত্তে
কত কথাই না বলিয়া গিয়াছেন, কত শ্লোকই না লিখিয়া গিয়াছেন,

সঙ্গীতের সুর শ্রবণে কত সামগানই না গাহিয়া গিয়াছেন ! সেই সুপবিত্র ব্রাহ্মণ বংশে, ধার্মিক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মর্ত্যমন্দাকিনী ভাগীরথীর পবিত্র তটে বসবাস করিয়া আপনারা—হে আমাব পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ, মনে মনে আর্য্য স্নেহ উত্তম অধম ব্রাহ্মণ শূদ্র দ্বিজ চণ্ডাল প্রভৃতি কি জঘন্য, কি নারকী ভাবই না পোষণ করিতেছেন, কি জঘন্য যুক্তি দ্বারা উহার সমর্থন করিতে যাইয়া জগতেব মনিষ্যবৃন্দের সমক্ষে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িতেছেন ! বেদান্তের অদ্বৈতবাদ পড়িয়া এত দ্বৈধ ভাব, এত হীন বুদ্ধি কেন ? ব্রাহ্মণ ! কৈ সে আপনাদের সমুদ্রের জ্বায় বিশাল বিস্তৃত অপার অনন্ত হৃদয়, কৈ সে চন্দ্র সূর্য্য বায়ু বরুণের জ্বায় আচঞ্চলে সমদৃষ্টি সমপ্রাণতা, কৈ সে ধরণীমণ্ডল সাধনার উৎসর্গীকৃত নিঃস্বার্থ প্রাণ ! অসীম সাগবে সঙ্কীর্ণতা কেন ? ধার্মিক বংশধরগণেব হৃদয়ে এত ভেদবুদ্ধি, এত নারকী প্রবৃত্তি কেন ? মহা সাম্যবাদেব প্রচারকগণের বংশধর আজ নরকের ঘুণা বিদেয়, প্রবঞ্চনা প্রতারণা, ভীষণ বৈষম্যবাদ প্রচারে উন্নত ! জ্ঞান, বিদ্যা, বিবেক-বুদ্ধি, সাধনা, পুণ্য আজ পদদগিত । হায় ব্রাহ্মণ ! আপনারাই না একদিন সমগ্র বিশ্ববাসীকে “শ্রবন্তু বিশ্ব অমৃতস্ত পূজাঃ” অমৃতের সন্তান অমৃতের অধিকারী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন ? আপনারাই না বিশ্ববাসীকে উপনিষদের কণ্ঠে সঞ্জীবনী মন্ত্র শুনাইয়া অভয় প্রদান করিয়াছিলেন ? জগতের প্রাতি অণু পরমাণুতে জগৎপাতার মহিমা— তাঁহার সত্তা তাঁহার শ্রীমুক্তি সন্দর্শন ও অনুভব করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ? কিন্তু আজ কি পরিবর্তন ! সে সব ধার্মিক ও ধার্মিকী আজ কোথায় ? পূর্ব পিতৃ পিতামহগণের সে সব মহামুণ্য সত্য, পবিত্র জ্ঞান ও বেদবাণী আপনারা আজি বিস্মৃত এবং তজ্জগুই আপনাদের এই শোচনীয় পরিণাম ! এই মর্মান্বশী অধঃপতন ॥ হে ব্রাহ্মণ, হে চতুর্কর্ণের চির আরাধ্য চির বন্দনীয় সমাজপতি ব্রাহ্মণ ! একবার পূর্বপুরুষগণের

গৌরব, আত্মস্বরূপ চিন্তা করিয়া হৃদয়েব কালিমা, মনের অন্ধকার, চিত্তের দুর্বলতা, অপসারিত করিয়া দিন । একদিন জগতেব পূজার্ম ছিলেন—
আবার পূজার্ম হউন । হৃদয়কে প্রশস্ত করুন, বৈষম্য ভাব দূর করিয়া
ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদাভেদ বোধ ভারত মহাসাগরে ডুবাইয়া দিন । শুধু
যজ্ঞোপবীত সর্কস্ব হইলেই চলিবে না, শুধু বচনের দোহাই দিয়াই নিষ্কৃতি
পাইবেন না, শুধু ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব করিলেই আপনাদের লুপ্ত গৌরব
ফিরিয়া আসিবে না । সে দিন—সে যুগ অতল কাল-সিকুতে ডুবিয়া
গিয়াছে । সে বর্ষের যুগ এখন আর নাই । ইহা বিজ্ঞানের যুগ, বেদান্তের
যুগ । স্মৃতি সংহিতার শ্লোক ভুলিতে চেষ্টা করুন, আপনাদের সেকলে
পুঁথি পাতড়ার কথা শিকায় তুলিয়া রাখুন, অধিকার অনধিকারের টীকায়
শক্তিক্ষয় করিয়া আর লাভ নাই । টীকা টীপনী ভাষা তদ্ভাষ্যের ক্ষমতার
কথা, উহার পাঠ ও আলোচনার ফল, হাজার বৎসরের দাসত্বে আমরা
বিলক্ষণই অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি । উহাতে আর মন ভেজে
না, প্রাণ গলে না । শাস্ত্রের দোহাই দ্বারা বচনের আবৃত্তি দ্বারা আধিপত্য
কবির কান আপনাদের অতীত হইয়াছে । ধর্মাবলে বলীয়ান হউন ।
আচণ্ডালে আলিঙ্গন দিয়া তাহাদিগকে প্রণব ওঁকার মধ্যে দীক্ষিত করুন,
গৃহে গৃহে শঙ্খ ঘণ্টার মঙ্গল মধুর বাজার উথিত হউক । প্রাতঃ সন্ধ্যায়
আবার নীরব পল্লীভবন সুখরিত হইয়া শিশুর কণ্ঠে পাখীর কলতানে
কল্লোলিনীর তরঙ্গ ভঙ্গে সামগান উদগীত হউক । ব্রাহ্মণ ! আবার সেই
ব্রাহ্মণ হউন, আবার ধার্মিক লাভ করুন ।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ নির্দেশ করিতে যাইয়া আপনাদের শাস্ত্রকারই বলিয়াছেন :—

শগো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জবং ।

জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণং ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ।

ক্ষান্তং দান্তং জিত-ক্রোধং জিতাঙ্গানং জিতেন্দ্রিয়ম্ ।

তমেব ব্রাহ্মণং মন্ত্ৰে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ ॥

গৌতম সংহিতা ।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—এই এতগুলি লক্ষণের মধ্যে আপনারা কতটীর অধিকারী । পিতামাতার গুণ পুত্রে বর্তে, এই যে এক ধূম্রা ধরিয়া আছেন, পিতৃ পিতামহগত সাত্বিকভাব পুত্রে না আসিয়াই পারে না, এই যে বলিতেছেন, করযোড়ে নিবেদন করি, পিতৃ পিতামহগত এই সব গুণাবলীর মধ্যে বংশানুক্রমিক জন্মগত ভাবে আপনারা কোনটী পাইয়াছেন ? বংশানুক্রমিক গুণই স্বীকার করিলে কঠোর ভাবে বলিতে হয়, আপনারাই প্রকৃত শূদ্রপদবাচ্য—নতুবা শূদ্রজনোচিত তমঃ ও রজোগুণ এত অধিক পরিমাণে আপনাদের মধ্যে দেখিতে পাইব কেন ? কেবল কি শূদ্রগুণেই পবিপূর্ণ হইয়াছেন, শরীরের যে বর্ণ উহাও শূদ্র তনয়ের মত কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে । কৃষ্ণবর্ণ ত কখন ব্রাহ্মণের শরীরের রং হইতে পারে না । শাস্ত্রকার বলিতেছেন :—

ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চলোহিতঃ ।

বৈশ্যানাং পীতকো বর্ণঃ শূদ্রাণামাসিতস্তথা ॥

মহাভারত ; শাস্তিপর্ষ, ১৮৭ অধ্যায়।

“ব্রাহ্মণেব শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ, বৈশ্যের পীতবর্ণ ও শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ শরীরে সাধারণ রং” । বহু ব্রাহ্মণ কেবল যে বর্ণ সম্বন্ধেই শূদ্রবৎ হইয়াছেন তাহা নহে, ক্রিয়া বিষয়েও শূদ্রতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন । ব্রাহ্মণগণ আর এখন মেরুপ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্মপ্রাণ যোগনিরত নহেন, ব্রাহ্মণ আর এখন অধ্যয়ন অধ্যাপনামগ্ন হিংসা দ্বেষ বিবর্জিত ধ্যান ধারণা-পরায়ণ বেদপাঠী নহেন । অধিকাংশ ব্রাহ্মণই এখন হিংসা, লোভ, কাম, ক্রোধে পূর্ণ, বিষয় প্রমত্ত, ধনলুন্ধ, অনৃতভায়ী এবং অন্তঃ বহিঃ শৌচাচার

বিহীন । তাঁহাদিগের বৃত্তির স্থিরতা নাই । ব্রাহ্মণ সম্ভান এখন হোটেল খুলিয়াছেন, দোকান দিয়াছেন, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, কেরানী, ব্যবসায়ী সবই হইয়াছেন, বড় বড় মহামহোপাধ্যায়গণ বেতনভোগী হইয়া অধ্যাপনায় নিযুক্ত ; ব্রাহ্মণ এখন সুরাপায়ী ; লবণ তৈল মাংসবিক্রেতা । এমন কাজ নাই, যাহা ব্রাহ্মণসম্ভান গ্রহণ করেন নাই । শূদ্রাণ, শ্লেচ্ছাণ (?), যবনান (?) কোন অন্নই আর বাকি রাখিতেছেন না । অথচ ইহারাই আবার ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব কবেন, শ্লোক আওড়াইয়া শাস্ত্রের দোহাই দেন, পুরাণ সংহিতা ভিন্ন কোন কথা শুনিতে চাহেন না । ইহার কোনটী শাস্ত্রসম্মত ? মহর্ষি মনু ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কোন পৃষ্ঠায় কোন শ্লোকে ইহার সমর্থন করিয়াছেন ? মনু, অত্রি, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ সংহিতাকারগণ যে সব বিধি নিষেধ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সেগুলি যথাযথ পালন করিয়া শাস্ত্রের প্রতি অগাধ বিশ্বাস প্রতিপন্ন করিবার শক্তি আপনাদের আছে কি ? বর্ত্তমান যুগে হিন্দুশাস্ত্রের বিধি আদেশ প্রতি পালিত হইতে পারে কি ? শাস্ত্রকার ত বলিতেছেন :—

স্বভাবাদ্ যত্র বিচরেৎ কৃষ্ণসারঃ সদামৃগঃ ।

ধর্ম্মাদেশঃ স বিজ্ঞেয়ো দ্বিজানাং ধর্ম্মসাধনম্ ॥৪

সংবর্ত্ত সংহিতা ।

যস্মিন্ দেশে মৃগঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ ধর্ম্মান্নিবোধত ॥২

প্রথম অধ্যায় ; যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ।

“কৃষ্ণসার মৃগ সর্বদা যে দেশে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করে, সে সকল দেশ দ্বিজগণের (বেদোক্ত) ধর্ম্মসমূহ সাধনের যোগ্য স্থান ॥”

এক্ষণে বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণসার মৃগ কি স্বাধীন ভাবে সর্বদা দেশেয় সর্বত্র বিচরণ করিতেছে ? যদি না করে, তবে শাস্ত্রজ্ঞ ও শাস্ত্রসর্ব্বস্ব, পূজ্যপাদ পুরোহিতগণ বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপ কল্পে সম্পাদন করাইয়া

থাকেন ? শাস্ত্রাদেশ পালন করিতে হইলে ত এদেশে সৰ্ব্বপ্রকার ক্রিয়া কলাপ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত ? হিন্দুশাস্ত্র অত্র স্পষ্টভাবে আদেশ জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন :—

ন শ্লেচ্ছ বিষয়ে শ্রাদ্ধং কুৰ্য্যাৎ ॥১॥

চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ; বিষ্ণুসংহিতা

“শ্লেচ্ছ ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিবে না ।”

শ্লেচ্ছদেশে তথা রাত্রৌ সন্ধ্যায়োশ্চ বিশেষতঃ ।

ন শ্রাদ্ধমাচর্যেৎ প্রাজ্ঞো শ্লেচ্ছদেশে ন চ ব্রজেৎ ॥৪

১৪শ অধ্যায় ; শঙ্খ সংহিতা ।

“শ্লেচ্ছদেশে * * * বুদ্ধিমান ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিবে না এবং শ্লেচ্ছদেশে গমন করিবে না ।” শ্লেচ্ছদেশ কাহাকে বলে ?

উত্তর :—চতুর্ধন্য ব্যবস্থানং যস্মিন্ দেশে ন বিদ্যতে ।

স শ্লেচ্ছদেশো বিজ্ঞেয় আৰ্য্যাবৰ্ত্তস্ততঃ পরঃ ॥৪

(চতুরশীতিতমোহধ্যায়ঃ ; বিষ্ণুসংহিতা ।)

“যে দেশে চতুর্ধন্য ব্যবস্থা নাই, তাহাকে শ্লেচ্ছদেশ বলিয়া জানিবে, তদতিরিক্ত দেশ আৰ্য্যাবৰ্ত্ত ।”

এদেশ ত চতুর্ধন্য ব্যবস্থাবিহীন ; বিশেষতঃ আপনাদেরই নিত্য কথিত সদা সৰ্ব্বদা আলোচিত শ্লেচ্ছাধিকৃত ভূমি । এ শ্লেচ্ছাধিকৃত দেশে আপনারা পিতৃ-পিতামহগণের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য কিরূপে করিতেছেন ও করাইতেছেন । শাস্ত্রমতে ত এ শ্রাদ্ধ অসিদ্ধ । ক্রিয়া কলাপ ভিন্ন ও শ্লেচ্ছ (?) অধিকৃত দেশে বাস করিতে শাস্ত্রকারের নিষেধ আজ্ঞা । মনু বলিতেছেন :—

ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেনাধার্ম্মিক জনাবতে ।

ন পাষণ্ডিগণাক্রান্তে নোপস্থষ্টেহন্তজৈনুভিঃ ॥৬১

(চতুর্থ অধ্যায় : মনুসংহিতা ।)

শূদ্রবশবর্তী রাজ্যে বাস করিবে না ; অধার্মিক বহুদেশে, বেদবহিষ্ঠ ত পাষণ্ডগণ কর্তৃক আক্রান্ত দেশে এবং চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতিকর্তৃক উপদ্রুত দেশে বাস করিবে না।”

তথাকথিত স্বেচ্ছাধিকৃত দেশে বাস করা ত দূরের কথা, শূদ্রবশবর্তী দেশে বাস করিতেও মনুর নিষেধ।

রজতখণ্ডের প্রলোভনে অশাস্ত্রীয়—আপনাদেরই কথিত স্বেচ্ছ (১) অধিকৃত দেশে চির অধিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রাদ্ধ শাস্তি ক্রিয়া কলাপ করাইতে পারেন আর বিদ্যার্থী দেশের কল্যাণকারী প্রবাসী স্বেচ্ছদেশাগত ভারতমাতার যুথোজ্জনকারী সম্তানগণকে গ্রহণ করিতে পারেন না ? তাহাতে শাস্ত্রের নিষেধ ! অধর্ম ভয় ! না সেখানে বুঝি দক্ষিণার ব্যবস্থা নাই বলিয়া ?

শূদ্রের দান গ্রহণ সম্বন্ধে সমুদয় শাস্ত্রকারগণের একবাক্যে নিষেধ আজ্ঞা। শূদ্রের অন্ন ত রক্ততুল্য হয়। অত্রি বলেন—“ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধবৎ, বৈশ্যের অন্নমাত্র এবং শূদ্রের অন্নধূস্রবৎ অভক্ষ্য” (১) আর তাহা ভোজনে :—* * * নিশ্চয়ই নরক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।” (২)

“শূদ্রের ভোজন, শূদ্রের সহিত বিশেষ সংসর্গ, শূদ্রের সহিত একত্র থাকা এবং শূদ্রের নিকট হইতে কোনরূপ জ্ঞানোপার্জন, ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন ব্রাহ্মণকেও পতিত করে।” (৩)

“যে দ্বিজ শূদ্রের ভোজী হইয়া পুত্র উৎপাদন করে, সেই দ্বিজের

(১) অনুবাদ—৩৬১। অত্রিসংহিতা।

(২) অনুবাদ—৫৬। প্রথম অধ্যায় ; অঙ্গিরঃ সংহিতা।

(৩) অনুবাদ—৩৯ শ্লোক ; প্রথম অধ্যায় ; অঙ্গিরঃ সংহিতা।

উৎপাদিত সেই সকল পুষ্কগণ প্রকৃত পক্ষে যাহার অন্ন তাহারই—কেননা, অন্ন হইতেই গুকের উৎপত্তি ।” (১)

এই ত গেল শূদ্রের অন্ন ভোজনের কথা । শূদ্রের চিড়ামুড়ি ভোজন সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলেন :—গুক্ষগমমবিপ্রশ্ন ভুক্তা। সপ্তাহমুচ্ছতি । ৪৬ । প্রথম অধ্যায় ; ঐ

“ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের (শূদ্রের) গুক্ষান্ন (চিপটিকাদি) ভোজন করিলে সপ্তাহ ব্রত করিবে ।”

অতঃপর হোটেলাদির অন্নভোজন সম্বন্ধে শাস্ত্রকারের মত উদ্ধৃত করিতেছি । “মিলিত জন সমূহের (‘মেছ’, হোটেলাদির) অন্ন * * * ভোজনে কর্ম্মান্তরার্জিত স্বর্গাদি লোক হইতেও ভ্রষ্ট হইতে হয় । ২১৯ । চিকিৎসকের অন্নভোজন পুষ্য সমান, * * * বৃদ্ধি উপজীবির (স্তন্যদেয় মহাজনের) অন্ন ভোজন বিষ্ঠা ভোজনের সমান ও লৌহ বিক্রয়ীর অন্ন-ভোজন শ্লেষ্মাভোজন তুল্য ঘৃণিত জানিবে ।” ২২০ । (২)

ঢাকা, কলিকাতা প্রভৃতি আশীষ স্বজন শূণ্য বড় বড় সহরে বা নিঃসম্পর্কিত বিদেশে কার্যব্যাপদেশে যাতায়াত করেন, কিন্তু হোটেলের বা মেছে থান না, এমন ব্রাহ্মণ সন্তান বাঙ্গালায় কয়জন আছেন ? যাহারা আছেন তাঁহারা নগণ্য মুষ্টিমেয় । তাঁহাদের ছই চারিজন লইয়া সমাজ নহে । কত উপাধিধারী টোলের অধ্যাপকের কথা জানি যাহারা বিদেশে হোটেলাদির অন্ন নির্ব্বিচারে—নিরাপত্তিতে আহার করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া আবার সমাজপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক সমাজ শাসনে প্রবৃত্ত আছেন । মেছ হোটেলের রন্ধনে ঠাকুরের অন্ন ত দূরের কথা, প্রতিদিন রেলের ষ্টিমারে বাবুর্জির তৈয়ারী অন্ন ব্যঞ্জন কুকুট মাংস নির্ম্মিত কালিয়া

(১) অনুবাদ—৪৩ শ্লোক । প্রথম অঃ ঐ ।

(২) অনুবাদ—৪র্থ অধ্যায় ; মনুসংহিতা ।

কোম্ভা, চপ্, কট্লেট শত শত ব্রাহ্মণ সন্তান মন্থ রঘুনন্দনকে ব্রজাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, যথেষ্টরূপে গলাধঃকরণ করিতেছেন। কলিকাতা ও ঢাকার কত বাবু ব্রাহ্মণগণের কথা জানি যাহারা প্রায় প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে মুসলমানের দোকান হইতে কুক্কট মাংস আনিয়া জিহ্বার তৃপ্তিসাধন ও ভগ্ন স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতেছেন। বঙ্গদেশের প্রায় সমুদয় ছাত্রাবাসে বিশেষতঃ কলিকাতা ও ঢাকাতে মুসলমানের পাউরুটি বিস্কুট ত নিত্য নিয়মিত ব্যবহৃত খাদ্য। বড় বড় ছাত্রাবাসের সংবাদ যাহারা কিছুমাত্র রাখেন, তাঁহারাই জানেন, রম্ময়ে বামন ২।৪।১০ দিনের জন্ত কার্য্যগতিকে অন্ত্র গেল বা অসুস্থ হইয়া পড়িলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, তিলি তন্তবায় প্রভৃতি ছাত্রগণ পর্য্যায়ক্রমে এবেলা ওবেলা দিনের পর দিন রন্ধনাদির কার্য্য উৎসাহ ও ক্ষুণ্ণির সহিত নিরবাহ করিয়া সকলে মহানন্দে একত্র—কোথাও বা একপাত্রে ২।৩ জন ভোজন করিয়া সে কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়া দেন। কত ব্রাহ্মণের সন্তান ষ্টীমারে কেরানীগিরি করিয়া মুসলমান বাবুর্জির অন্ন, কত প্রকার হিন্দুর অখাদ্য মাংস প্রতিদিন আহার করিতেছেন, সমাজে তাহাতে কথাটী মাত্র নাই। বরং শিক্ষাপ্রাপ্ত চাকুরে ছেলে বাটী গেল পিতামাতার কত সন্তোষ, কত গানন্দ। সহরের অধিকাংশ মিঠাইএর দোকান শূদ্রদের স্থাপিত। তথা হইতে পয়সা দিয়া কত সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ সন্তান প্রতিদিন লুচি, কচুড়ি, আলুরদোম তরকারী ও কত প্রকার ভাজা দ্রব্য কিনিয়া লইয়া আহার করিতেছেন এবং বাসাস্থ পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিনী, আত্মীয় স্বজন নিয়মিত অভ্যাগতদের জন্ত লইয়া যাইতেছেন। যাহার যা অভিরুচি সে তাহাই করিতেছে— তাহাই খাইতেছে; যে ভাবে খুদি সেই ভাবে চলাফেরা করিতেছে। সমাজে সমুদয় শাসন অগ্রাহ করিয়া অনায়াসে জীবনযাত্রা নিরবাহ করিয়া যাইতেছে।

বর্তমান হিন্দুসমাজ যেন ইঙ্গিতে বলিয়া দিয়াছে—যার যা খুসি কর, খাও দাও মজা লোট—কেবল কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে—নিতান্ত স্তব্ধ, স্তবোধ, ভাল মানুষের মত জবাব দিতে হইবে—‘না,—আমি ত করি নাই—আমি ত সেই বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানি না!’ বাস্ !—তবেই হইয়া গেল। আর কোন গণ্ডগোল নাই—কোন সামাজিক শাসনের অধিকার নাই। কেবল কোনরূপে কষ্টে স্তব্ধে যো সো করিয়া “না” কথাটি বলিতে পারিলেই হইল। এই ত হতভাগ্য হিন্দুসমাজের সমাজ শাসন !

শূদ্রের চিড়া মুড়ি ত এখন ডাল ভাতের মধ্যে গণ্য। সিদ্ধ অন্নও জবাধে প্রচলিত। অথচ এগুলি শাস্ত্রানুযায়ী ব্রাহ্মণের অখাদ্য ও অব্যবহার্য্য। যাঁহারা অত্যন্ত গোঁড়া পণ্ডিত তাঁহারাও শ্রীমত, ধৌতবস্ত্র-পরিহিতা, আচারনিষ্ঠা শূদ্রা বিধবার প্রস্তুত চিড়া প্রভৃতি ব্যবহারে বিধা বোধ করেন না। এজন্য কিন্তু সাত দিন ব্রত করার বিধান আছে। তা থাকিলেই বা, তাহাতে কি আইসে যায়? এ হইতেছে ব্রাহ্মণের খাওয়া দাওয়ার কথা, এখানে শাস্ত্রের কথা কেন? খাওয়া দাওয়া, টাকা পয়সা, ভোগ বিলাসের কাছে কি শাস্ত্র? এখানে কে শাস্ত্রের বিধি পালন করিয়া কষ্ট পাইতে যাইবে? শাস্ত্র হইতেছে অল্পকে উপদেশ দিবার বেলায়, শূদ্র-শাসনের বেলায়,—শাস্ত্র হইতেছে বিচার বিতর্কের বেলায়, শূদ্রদের নিকট হইতে টাকা পয়সা দক্ষিণা লইবার বেলায়! সকলেই সকল করিতেছে, কেবল বাহিরে একটা নীচ আর্ধ্যামির আবরণ আছে মাত্র। একটা সুন্দর গল্প আছে। একজন গোঁড়া পুরোহিত ব্রাহ্মণ কার্য্যব্যপদেশে দূরবর্তী কোন স্থানে যাত্রা করেন। সারা দিন হাঁটিয়া পথশ্রমে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া আশ্রয় অভায়ে সায়ংকালে অগত্যা এক হিন্দুগুটিবাড়ী জাতিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন। সরল-

হৃদয় ধর্মপরায়ণ মুচি পরম ভক্তিভরে তাঁহার পরিচর্যায় রত হইল । চাউল, দাইল, তরকারী প্রভৃতি দিয়া পাকের আয়োজন করিয়া দিতে চাহিল, কিন্তু ব্রাহ্মণের শরীর নিতান্ত ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন হওয়ায়, বিশেষতঃ মুচিবাড়ী রন্ধন করিয়া আহার করিলে লোকে কি বলিবে, এই আশঙ্কায় রন্ধন করিতে অসম্মত হইলেন এবং জলখাবার কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন । গৃহস্থ বহু অনুসন্ধানে দেড় পোয়া পরিমিত পুরাতন চিড়া আনয়নপূর্বক ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপস্থিত করিল । চিড়া ত বহু কষ্টে পাওয়া গেল, এখন উহা খান্ কি দিয়া ? দরিদ্র পল্লী, নিকটে দোকান পসার কিছুই নাই, গৃহেও গিষ্ট দ্রব্যের অভাব । ওদিকে ব্রাহ্মণও ক্ষুধায় আকুল, বিলম্ব সহ্য হয় না । ডাকিয়া বলিলেন—‘খুঁজিয়া দেখ আর কিছু পাও কি না ।’ মুচি তখন কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সাহসে ভর করিয়া করঘোড়ে বলিল—‘গৃহে কাস্তুন্দ আছে—প্রভুর আজ্ঞা পাইলে তাহাই দিতে পারি ।’ ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ কি করেন—এদিক ওদিক তাকাইয়া বলিলেন—‘হাঁ নিরে এস ।’

“লেখা আছে পুথির কোনে ।

দোষ নাই কাস্তুন্দের সনে ॥”

বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণগণের শাস্ত্রের প্রতি ত এইরূপ অগাধ বিশ্বাস ! এই-রূপ ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে । ভিতরে ঘোর মালিষ্ঠ, জঘন্য পুতিগন্ধ, বাহিরে লোক দেখান ধর্মাচরণ ।

চিকিৎসকের অন্ন ও কুসীদজীবী মহাজনের অন্ন সম্বন্ধেও ঐ একই কথা । ডাক্তার, কবিরাজ ও মহাজনদের রূপাভিখারী কে নয় ? সমাজে ইহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অসীম । ধনী দরিদ্র, জমিদার, মধ্যবিত্ত, মুর্থ পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলেই ইহাদের দ্বারস্থ । ডাক্তার কবিরাজ ও প্রভূত ধনশালী কুসীদজীবী নিমন্ত্রণ করিলে কোন্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কয়জন

সমাজপতি আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে করেন না ? অর্থের ক্ষমতায়, উজ্জ্বল টঙ্ক-ঝঙ্কারের নিকট শাস্ত্রের সমুদয় বিধি ব্যবস্থা কম্পবান স্মৃতি সংহিতা কেঁচো প্রায়, মনু রঘুনন্দন করঘোড়ে তটস্থ । যেখানে দারিদ্র্য—দৌর্বল্য—অজ্ঞতা—শক্তিহীনতা, সেইখানেই তাহাদের সিংহতুল্য বিক্রম প্রদর্শন । এই ত সমাজের অবস্থা ।

তারপর সুরাপানের কথা । শিশুকাল হইতেই গুনিয়া আসিতেছি—“মদ খাওয়া, মহা পাপ, অনন্ত নরক, এমন পাপ আর নাই ।” কার্যতঃ কিন্তু অন্তরূপ দেখিতাম । অনেককেই তাহাদের মদ্য পানের কথা মগোঁরবে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে শুনিয়াছি—মদ্যপানে যে কত আনন্দ, কত ক্ষুধা—তাই তাহারা বলিত । তাহাদের কথা শুনিয়া মনে ভাবিতাম, এ বুঝি অশিক্ষিত শূদ্রেরাই খায়, বিদ্বান লোক ও ব্রাহ্মণাদি জাতি বোধ হয় ইহা খায় না । পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সহরে পড়িতে গেলাম । সেখানে ঘাইয়া যাহা শুনিলাম ও দেখিলাম, তাহাতে অবাক হইয়া গেলাম ।

যেই দিনই অধিক রাত্রিতে বাহিরে সদর রাস্তায় বাহির হইয়াছি, সেই দিনই মদ্যপায়ীগণের বিকট কোলাহল এবং উচ্চ হাস্য শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি ! কে উহারা জানিবার জন্ত যখন আর একটু অগ্রসর হইয়াছি, তখনই কতকগুলি পরিচিত মুখ দেখিয়াছি ও অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিয়াছি, ইহাদের অধিকাংশই আমাদের প্রতিবাসী এবং আত্মীয় । পদগোঁরব এবং বিদ্যাবুদ্ধিতে ইহাদের কেহ এম-এ, বি-এল, ; কেহ বি-এল, কেহ বি-এ পাস করিয়া স্কুল শিক্ষক । এবং এইরূপ আরও অনেক পদস্থ ব্যক্তি । ক্রমে ঘনুসকানে জানিতে পারিলাম সহরের প্রায় চৌদ্দ জনাই ইহাদের দলভুক্ত । শুধু কি এইখানেই পর্য্যবসান, ইহার মধ্যে বারবণিতার সংমিশ্রণ । সহরে সভাসমিতি প্রায়ই হয়, ছোটবেলা হইতে সভাসমিতিতে যাওয়া একটা রোগ, কাজেই যেখানেই সভা হইত সেইখানেই আমি প্রায়

সকলের আগে ঘাইয়া উপস্থিত হইতাম । একে একে সভাপতি, বক্তা, প্রবন্ধলেখক ও শ্রোতৃগণ আসিতেন । সভাগৃহ লোকার্ণ্য হইয়া উঠিত । তারপর প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইত । সে প্রবন্ধে, সে বক্তৃতায় কত যে নীতির কথা, কত যে ধর্মের কথা, কত যে সমাজ-সংস্কারের কথা, কত যে দেশ উদ্ধারের কথা বাহির হইত তাহার সংখ্যা নাই । লোকে ধন্ত ধন্ত করিত, খুব করতালি ধ্বনি করিত । দেখিয়া শুনিয়া আমিত অবাক ! আমার মনে হইত যাহারা নিজেরা সদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, চরিত্রহীন, তাহারা সমাজ সংস্কারের কথা কেমন করিয়া বলে ? তাহারা লোক শিক্ষা দিতে চায় কোন্ সাহসে ? তাহারা দেশের কথা মুখে আনে কেমন করিয়া ? মনে হইত, এ সভাসমিতি নয়, পণ্ডশ্রম মাত্র । হতাশ প্রাণে অবসন্ন মনে বাসায় ফিরিতাম । এইরূপ ভাবে দেখিয়া দেখিয়া এখন অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি । সে সব পাপ দৃষ্টে এখন আর হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে না । কত সহরে বাস করিলাম, সর্বত্রই ঐ এক ভাব, এক দৃষ্ট । ভদ্রলোকদের মধ্যে বার আনা—চৌদ্দ আনাই মাতাল ও ব্যভিচারী । তারপর ক্রমে যতই অভিজ্ঞতা বাড়িতে লাগিল এবং অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম ততই গুপ্ত রহস্য ব্যক্ত হইতে লাগিল । ক্রমে জানিতে পারিলাম, শুধু উকীল মোক্তার নহে, শুধু শিক্ষক ও অগ্রাণ্ড কর্মচারী নহে, এ অমৃতরূপ সদ্য হলাহল-পানে প্রায় সকলেই অভ্যস্ত । জমিদার, তালুকদার, বড় লোক, বিদ্বান লোক এবং এমন কি সমাজপতি বঙ্গ বিখ্যাত গুরুবংশেও এ হলাহল প্রবেশ করিয়াছে ; কুলোপুরোহিতগণ পর্য্যন্ত সদ্যপান আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন । এ দৃষ্ট দেখিবার নয়, এ কথা শুনিবার নয় । মনে হয় ইহারাই কি পরম পরিভ্রা আর্য্যবংশের কুল-প্রদীপ ? মনে হয় ইহারাই কি ঋষিগণ প্রদর্শিত বিধিব্যবস্থার একমাত্র নায়ক ? হায় বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ ! ভারত মহাসাগর এখনও তোমাকে স্বীয় গভীর গর্ভে গ্রহণ করেন নাই কেন ?

শাস্ত্রে সুরাপায়ী মহাপাতকীর মধ্যে পরিগণিত ।

উশনঃ সংহিতা বলেন :—

ব্রহ্মহত্যাপঃ স্তেনো গুরুতল্লগ এব চ ।

মহা পাতকিনে ত্বেতে যঃ স তৈঃ সহ সংবসেৎ ॥১, ৮ম, অঃ ।

“ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, চোর অর্থাৎ ব্রাহ্মণস্বামিক অশীতি বস্ত্রিকার অন্যান্য স্তবর্ণপহারী, বিমাতৃগামী এবং যে ব্যক্তি ইহাদিগের (অগ্ন্যতমের সহিত) সংসর্গ করে সে—ইহারা অর্থাৎ এই পঞ্চবিধ ব্যক্তিগণ মহাপাতকী ॥

মনু বলেন :—

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুরুর্জনাগমঃ ।

মহাস্তি পাপকাত্মাঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥৫৫

একাদশ অধ্যায় ; মনু সংহিতা ।

বিষ্ণু সংহিতা বলিতেছেন :—

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং ব্রাহ্মণস্বর্ণ-হরণং গুরুদার-গমনমিতি মহাপাতকানি ॥১॥

তৎ সংযোগশ্চ ॥২॥ সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহ চরন্ ॥৩॥

একধান ভোজনাশনশয়নৈঃ ॥৪॥ যৌন স্রোবর্মোথ সন্দ্বন্ধাৎ সদ্য এব ॥৫॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

অত্রি বলেন :—

ব্রহ্মহা প্রথমমৈকৈব দ্বিতীয়াং গুরুতল্লগঃ

তৃতীয়স্ত সুরাযোহমং চতুর্থং স্তেয়মুচ্যতে ।

পাপনষ্টৈকৈব সংসর্গঃ পঞ্চমং পাতকং মহৎ ॥১৬৪

অত্রি সংহিতা ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

ব্রহ্মহা মদ্যপঃ স্তেনো গুরুতল্লগ এব চ ।

এতে মহাপাতকিনো যশ্চ তৈঃ সহ সংবসেৎ ॥২২৭

অষ্টম অধ্যায় . সাত্ত্বিকসংসর্গ সংহিতা ।

গৌতম সংহিতা বলেন :—

অগ্নাহঃসুরাপ গুরুতল্লগ মাতৃপিতৃঘোনিসদ্বন্ধস্তেন নাস্তিক নিন্দিত
কশ্যাত্যাসি পতিতাত্যাগ্য পতিতত্যাগিনঃ পাতকসংযোজকাস্চ তৈশ্চাকং
সমাচরন্ ।

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বনিষ্ঠ সংহিতা বলিতেছেন :—

পঞ্চ মহাপাতকান্ধ্যাচক্ষতে গুরুতল্লগ সুরাপানং ভ্রূণহত্যাং
ব্রাহ্মণসু বর্ণহরণং পতিত-সম্প্রয়োগঞ্চ ব্রাহ্মণ বা ঘোনেন বা ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

এই ত গেল সুরাপানরূপ মহাপাতকের কথা । এখন উহার প্রায়শ্চিত্তের
কথা উল্লেখ করিব । প্রথমতঃ অজ্ঞানকৃত সুরাপানের প্রায়শ্চিত্তের কথাই
প্রবণ করুন—

ভগবান্ বিষ্ণু বলিতেছেন :—

অশ্বমেধেন শুধ্যয়ুর্মহাপাতকিনস্ত্বিমে ।

পৃথিব্যাং সর্বতীর্থানাং তথানুসরণেন বা ॥৬॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ—বিষ্ণু সংহিতা ।

“এই সকল মহাপাতকিগণ, অশ্বমেধ যজ্ঞ বা পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থে
পর্যটন করিলে শুদ্ধ হইতে পারে । ইহা অজ্ঞানকৃত মহাপাতকের
প্রায়শ্চিত্ত ।”

এক্ষণে জ্ঞানকৃত সুরাপানের কথা বলা যাইতেছে :—

সুরাপস্ত ব্রাহ্মণ শ্রোতৃগামিক্ষেয়ুঃ সুরামাশ্রে মৃতঃশুধ্যৎ ।

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ—গৌতম সংহিতা ।

“যদ্যপ ব্রাহ্মণের মূখে উক্ত মদ্য নিক্ষেপ করিবে ; তাহাতে মৃত্যু প্রাপ্ত
হইলে উহার পাপ ক্ষয় হয় ।”

সুৰাপস্ত সুৰাং তপ্তাগ্নিবর্ণাং পিবেৎ তদা ।

নির্দীক্কাঃ স তয়া মুচ্যতে চ দ্বিজোত্তমঃ ॥১২

গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা গোশকৃৎসমেব বা ।

পয়ো দ্বতং জলং বাথ মুচ্যতে পাতকাং ততঃ ॥১৩

অষ্টমোহধ্যায়ঃ—উশনঃ সংহিতা ।

সুৰাস্থত গোমূত্রপয়সাগ্নি সন্নিভম্ ।

সুৰাপোহন্ততমং পীত্বা মরণাচ্ছক্ষিষুচ্ছুতি ॥২৫২॥

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ।

সৰ্ব্বশেষে ব্যবস্থাকারের সম্রাট মনুও উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে ।

মনু সুরাপান সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

সুৰাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুৰাং পিবেৎ ।

তয়া স্বকায়ে নির্দীক্কে মুচ্যতে কিমিযান্ততঃ ॥৯১

গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা পিবেচ্ছদকমেব বা ।

পয়ো দ্বতং বা মরণাদেগোশাকৃৎসমেব বা ॥৯২

একাদশঃ অধ্যায়ঃ—মনুসংহিতা ।

“ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জ্ঞানপূর্বক সুরাপান করিলে, ঐ পাপ ক্ষমার অগ্নিবর্ণ জলস্ত সুরা পান করিবে ; ঐ সুরার দ্বারা শবীর একেবারে দগ্ধ হইলে পর তবে পাপের নিকৃতি হয় ॥৯১। অগ্নিবর্ণ জলস্ত গোমূত্র বা জল, ছন্ধ, দ্বত বা গোময় জল, যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ পান করিবে এইরূপে মরিলেই উক্ত পাপের নিকৃতি ॥৯২।”

প্রায় সমুদয় হিন্দুরই বিশ্বাস গোমাংস ভক্ষণ তুলা আর পাপ নাই, কিন্তু গুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, শাস্ত্রকারগণ গোমাংস ভক্ষণও সুরাপান অপেক্ষা অল্প পাতকজনক বলিয়াছেন ।

ভগবান্ বিষ্ণু বলিতেছেন :—

অভক্ষ্যেণ ব্রাহ্মণং দূষয়িতা যোড়শ সূবর্ণান্ ॥৯৭॥

জাত্যপহারিণা শতম্ ॥৯৮॥ সুরয়া বধ্যঃ ॥৯৯

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ—বিষ্ণুসংহিতা ।

“অভক্ষ্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে, যোড়শ সূবর্ণ অর্থদণ্ড (অর্থাৎ ভোক্তা ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতসারে তাহাকে সামান্য অভক্ষ্য ভোজন করাইলে উক্ত দণ্ড) ; জাতিনাশক অভক্ষ্য গোমাংসাদি দ্বারা দূষিত করিলে, শত সূবর্ণ অর্থদণ্ড ; আর সুরাদ্বারা দূষিত করিলে বধ দণ্ড ।”

মহাপাতকগণের পরিচয় এবং তাহার প্রায়শ্চিত্ত যথাসম্ভব উল্লেখিত হইল । এক্ষণে তদপেক্ষা অল্প পাতকী উপপাতকগণের পরিচয় এবং উহার প্রায়শ্চিত্তাদির কথা উল্লেখ করিব ।

“গোহত্যা, অধাজ্য যাজন, (শূদ্রযাজন) পরস্রীগমন, * * * বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা ; বেতন গ্রহণ করিয়া বেদাধ্যাপন ; বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদাধ্যয়ন ; রাজাজ্ঞায় সূবর্ণাদি খনিতে কাজ করা ; বৃহৎ সেতু প্রভৃতিতে কাজ করা ; ওষধি নষ্ট করা ; জালানি কাষ্ঠের জন্ত অগ্নিক বৃক্ষের ছেদন ; দেবপিত্রাদির উদ্দেশে নয়—পরন্তু আপনার জন্ত পাকানুষ্ঠান ; লগুনাদি নিম্নিত খাদ্যের ভক্ষণ ; সূবর্ণ ব্যতীত অপর দ্রব্যের চুরি, শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ অসৎ শাস্ত্রের আলোচনা ; নৃত্যগীত বাদিত্রোপ সেবন ; স্ত্রীহত্যা, বৈশ্যহত্যা, শূদ্রহত্যা এবং নাস্তিকতা এই সকলের প্রত্যেককে উপপাতক বলা যায়” (৬০—৬৭ শ্লোক, একাদশ অধ্যায়, অনুবাদ মনুসংহিতা) ।

উপপাতকীদের সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণু বলিতেছেন :—

গুরুর অলৌক-নিন্দা করা, বেদনিন্দা ; অধীত-বেদ-বিস্মরণ, অভোজ্যের ভোজন (অর্থাৎ চাণ্ডালাদির অন্নভোজন), অভক্ষ্য-ভক্ষণ (অর্থাৎ লগুনাদি

ভক্ষণ), পবিত্রাপরণ, পরদারগমন, অনুচিত কৰ্ম (ব্রাহ্মণের পক্ষে বৈশ্য শূদ্রের কৰ্ম অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করা) অসৎ প্রতীগ্রহ, ক্ষত্রিয় হত্যা, বৈশ্যহত্যা, শূদ্রহত্যা, গোহত্যা অবিক্রেয় (অর্থাৎ দ্রব্যাাদি) বিক্রয় * * * দ্রুম গুল্ম লতা ও ওষধির বিনাশন, * * * দেবাদি উদ্দেশ্য না করিয়া কেবল আপনার জন্ত পাকাদি অনুষ্ঠান, দেবধাণ, ঋষিধাণ এবং পিতৃধাণ পরিশোধ না করা, (যজ্ঞাদি দ্বারা দেবধাণ, ব্রহ্মচর্যাাদি দ্বারা ঋষিধাণ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃধাণ পরিশোধ করিতে হয়), চার্কাকাদি অসৎ শাস্ত্র চচ্চা, নাস্তিকতা, নীচবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ * * * এই সকল উপপাতক। এই সকল উপপাতকী মনুষ্যবৃন্দ চাক্ষায়ণ অথবা পরাক্রান্ত কিম্বা গোমেধযজ্ঞ করিবে। এই প্রায়শ্চিত্তত্রয় স্থানভেদে ব্যবস্থা করিয়া লইবে।” (অনুবাদ—বিষ্ণুসংহিতা, সপ্তত্রিংশ অধ্যায়)।

যাজ্ঞবল্ক্যও ঐ একই কথা বলিতেছেন :—“গোহত্যা * * * সামান্ততঃ চৌর্য্য, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কুশীদোপজীবন, লবণ উৎপন্ন করা, আত্রেয়ী (ঋতুমতী স্ত্রী) ব্যতীত স্ত্রীহত্যা, শূদ্রহত্যা, অদীক্ষিত বৈশ্য-ক্ষত্রিয়হত্যা, নাস্তিকতা, ব্রতলোপ, * * * অপত্য-বিক্রয়, ধাত্তহরণ, গবাদি পশু-হরণ, * * * পিতৃব্য-মাতুলাদি বান্ধবাদিকে অকারণ পরিত্যাগ করা * * * তিল ইক্ষু প্রভৃতি দ্রব্যমর্দক যজ্ঞ পরিচালিত করা, মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসনাসক্তি, শূদ্রসেবা, অপকৃষ্ট ব্যক্তির সহিত মিত্রতা, অনাশ্রমী হইয়া থাকা, পরান্নপুষ্টতা, চার্কাকাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন * * * এই সকলের প্রত্যেকটাই উপপাতক মধ্যে গণ্য। ২৩৪—২৪২। (অনুবাদ—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা)।

পাঠকগণ স্বয়ং রাখিবেন, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা, শূদ্রহত্যা, বৈশ্যহত্যা, অদীক্ষিত ক্ষত্রিয়হত্যা, পরস্ত্রীগমন প্রভৃতি পাপ কার্য্যের অপরাধ অযাজ্য যাজন (শূদ্রযাজন), স্কন্দ খাওয়া, স্বর্ণখনিতে ও বড় পুণ্ডে চাকরি করা,

জগৎকল্যাণতা ওষধির বিনাশন, জাল দিবার জন্তু তাজা গাছ কাটা, দেবতাদির জন্তু নহে, পরন্তু নিজের জন্তু পাকানুষ্ঠান করা, লবণাদি বিক্রয় করা, শূদ্রসেবা, পৌরাজ রক্ষন খাওয়ার অপরাধ সমান । শাস্ত্রকার না খেপিলে এমন অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিতে পারিতেন না ।

পূর্বে মনুসংহিতাদি হইতে মহাপাতকিগণের প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ করিয়াছি । এক্ষণে উপপাতকিগণের প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখিত হইতেছে । উপপাতকিগণের বিস্তৃত তালিকা পূর্বে পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি । গোহত্যা উপপাতকের অন্ততম । শাস্ত্রকার মনু অত্যাচ্ছ উপপাতকগণের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা গোহত্যার সমতুল্য বলিয়া লিখিয়াছেন । নিম্নে মনুসংহিতার অনুবাদ প্রদত্ত হইল । “উপপাতকীরা উপপাতক ক্ষয়ের জন্তু নিম্নলিখিত এই সকল নানাবিধ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে । ১০৮। উপপাতক সংযুক্ত গোহত্যাকারী প্রথম মাসে যবমণ্ড ভক্ষণ করিবে,—সুপ্তিত শিরা, ছিন্ন শস্ত্র এবং গোচর্মে আচ্ছাদিত দেহ হইয়া গরুর গোষ্ঠে বাস করিবে । ১০৯ । দ্বিতীয়, তৃতীয়—এই দুই মাস একদিন উপবাসান্তর দ্বিতীয় দিনের স্বায়ংকালে কৃত্রিম লবণ-বর্জিত পরিমিত হবিষ্যভোজী হইবে, সংযতেন্দ্রিয় থাকিবে এবং গোমূত্র দ্বারা স্নান করিবে । ১১০। মাসত্রয় পর্য্যন্ত দিবাভাগে গাভী সকলের অনুগমন করিবে এবং দণ্ডায়মান থাকিয়া ঐ সকল গাভী-সমুখিত ধূলি সেবন করিবে । কণ্ডূয়নাদি দ্বারা গো পরিচর্যা করিয়া গাভী-দিগকে প্রণাম করিয়া রাত্রিকালে তথায় বীরাসনে উপবিষ্ট থাকিবে । ১১১। গো সকল উখিত হইলে উখিত হইবে,—গমন করিলে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে,—উপবিষ্ট হইলে স্বয়ং উপবিষ্ট হইবে,—বীতমৎসর ভাবে নিয়ত, তাহাদিগের এইরূপ সেবন করিবে । ১১২। ব্যাধিত বা চোর কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, পতিত বা পক্ষগত হইলে যথাসক্তি সর্বোপায়ে তাহাদিগকে মোচন করিবে । ১১৩। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত বা প্রবল

বাত্যা উপস্থিত হইলে, যথাসক্তি গাভী সকলকে রক্ষা না করিয়া কখন আত্মরক্ষা করিবে না । ১১৪। আপনার বা অপরের গৃহে, ক্ষেত্রে বা থলে অর্থাৎ ধান মাড়িবার স্থানে, গাভী শস্ত ভক্ষণ করিতেছে, অথবা বৎস্ত ছুগ্ন পান করিতেছে দেখিয়া, গৃহপতিকে বলিয়া দিবে না । ১১৫। যে গোহত্যাকারী এই বিধিতে গো-সেবা করে, সে তিন মাসে গোহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে । ১১৫। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত ব্রত সম্যক আচরিত হইলে একটি বৃষভ এবং দশটি স্ত্রী গবী দক্ষিণা দিবে । যদি উহা না থাকে, তবে যথাসর্বস্ব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দান করিবে । ১১৭।

* * * অপর উপপাতকী দ্বিজগণ আত্মশুদ্ধির জন্ত এইরূপে গোবধ-প্রায়শ্চিত্ত অথবা চাত্রায়ণ (১) ব্রত করিবে” । ১১৮।

এই ত গেল উপপাতকের কথা । অন্যান্য পাপ সম্বন্ধে শাস্ত্রকার বলেন :—“ * * * অতিশয় ছুগ্ন লগুন পুরীষাদি এবং মদ্যের আশ্রয়, এই সকলের প্রত্যেকে জাতিভ্রংশকর পাতক ।” (২) ইহার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে মনু বলেন :—

জাতিভ্রংশকরং কৰ্ম কৃত্বাণ্ডতম মিচ্ছয়া ।

চরৈঃ সাস্তপনং কৃচ্ছ্ৰং প্রোজাপত্যাশ্চ ॥১২৫

মনু সংহিতা ; একাদশ অধ্যায় ।

(১) “ত্রিসফায় স্নান করিয়া পৌর্ণমাসীতে পঞ্চদশ গ্রাম ভোজন করিবে, তৎপরে কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত প্রতিদিন এক এক গ্রাম ভোজন করাইবে । পরে অমাবস্যা উপবাস দিয়া শুক্ল প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পুনরায় প্রতিদিন এক এক গ্রামের বুদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাম ভোজন করিবে । ইহাকে চাত্রায়ণ ব্রত বলে । চাত্রায়ণ এক মাস সাধা ।” অনুবাদ—২১৭ শ্লোক ; একাদশ অধ্যায় ; মনু সংহিতা ।

(২) অনুবাদ—৬৮ শ্লোক ; একাদশ অধ্যায় ; মনু সংহিতা । ঐ অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ; বিষ্ণু সংহিতা ।

“ইচ্ছাপূর্বক জাতিভ্রংশকর পাপ করিয়া সপ্তাহ মধ্যে কৃচ্ছ্র সান্ত্বন (১) নামক ব্রত করিবে। অজ্ঞানতঃ ঐ পাপ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে।” (২) “গর্দভ, অশ্ব, উষ্ট্র, মৃগ, হস্তী, ছাগ, মেঘ, মৎস্ত, সর্প ও মহিষের বধ—এ সকলের প্রত্যেককে ‘সঙ্করীকরণ পাতক’ জানিবে। অর্থাৎ ইহা দ্বারা সঙ্কর জাতিও প্রাপ্তি হয়। ৬৯। নিন্দিত হইতে ধন প্রতিগ্রহ, বাণিজ্য (কুসৌদ জীবন, বিষ্ণু সংহিতা) শূদ্রসেবা ও মিথ্যা কথন—এই সকল পাপে পাতক হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। এজন্য ইহাদিগকে ‘অপাত্তীকরণ পাতক’ বলে। ৭০। কুমি, কীট ও পক্ষীর হনন, ফল কাষ্ঠ ও পুষ্পের চুরি এবং অতি বৎসামান্য উপলক্ষে মনোবৈকল্য—এই সকলের প্রত্যেককে ‘মলাবহ-পাতক’ বলা যায়। ইহাতে চিত্তমল উপস্থিত হয়। ৭১।” (একাদশ অধ্যায় ; মনুসংহিতা—অনুবাদ অংশ)

(১) “প্রত্যহ অভ্যাহ গোমূত্র, গোময়, দধি, ঘৃত এবং কুশৌদক প্রভৃতি দ্বারা মহা সান্ত্বন অর্থাৎ এক একদিন গো-মূত্রাদির এক একটী দ্রব্য আহার ও একদিন (ছয় দিন অতিবাহিত করিবার পর শেষ সপ্ত দিন) উপবাস, এই সাত দিন-সাধা ব্রত সান্ত্বন (কৃচ্ছ্র-সান্ত্বন)।” অনুবাদ—১৯।২০ শ্লোক ; ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় ; বিষ্ণু সংহিতা।

(২) “দ্বিজ প্রাজাপত্য নামক কৃচ্ছ্র আচরণ কালে প্রথম তিন দিবস দিনের বেলায় ভোজন করিবে ; পর তিন দিন সায়ংকালে ভোজন করিবে ; তার পর তিন দিন অযাচিত ভাবে যখন উপস্থিত হইবে, তখন ভোজন করিবে এবং শেষ তিন দিন উপবাস করিয়া থাকিবে। স্তত্রাং ঐ ব্রত ষাট দিন সাধা। প্রথম তিন দিন কুকুটাণ্ড অন্নাদি ষড়্বিংশতি গ্রাস ভোজন, দ্বিতীয় তিন দিন সায়ংকালে ষাটবিংশতি গ্রাস এবং তৃতীয় দিন চতুর্বিংশতি গ্রাস ভোজন করিবে।” অনুবাদ—মনু সংহিতা ; একাদশ অধ্যায়।

ব্রাহ্ম প্রাতঃসংহা সায়াং ব্রাহ্মণ্যাদযাচিতম্।

ব্রাহ্ম পরঞ্চ নাম্নীয়াং প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ ২১২

ইহার প্রায়শ্চিত্তবিধিও কথিত হইতেছে :—

সঙ্করাপাত্ত কৃত্যাসু মাসং শোধনমৈন্দবম্ ।

মলিনী করণীয়েযু তপ্ত স্তাদ্ যাবকৈস্ত্যাহম্ ॥১২৬

ঐ

“শঙ্করীকরণ এবং অপাত্তীকরণ পাতক করিয়া একমাস কাঁচ চান্দ্রায়ণ করিবে । এবং মলিনীকরণ পাতক হইলে ত্রিরাত্র যবাগূর কাথ ভোজন করিবে” ১২৬

* * * * *

* * * “হংস, বক বধে ব্রাহ্মণকে একটি গোদান । * * * ছাগ এবং মেষ বধে একটি বৃষ দান করিবে” ১৩৭। * * * আমমাংসভোজী ব্যাভ্রাদি পশু বধে, পয়স্বিনী ধেনু ও অক্রব্যাদ হবিণাদি পশু বধে বৎসতরী দান করিবে” ১৩৮। * * * যে সকল প্রাণী অনাদিতে জন্মায়, গুড়া দি রসে জন্মায় এবং ফনে কিম্বা পুপে জন্মায়—সেই সকল প্রাণিবধে ঘৃতপ্রাশন প্রায়শ্চিত্ত জানিবে ১৪৪ । কর্ষণ দ্বারা যে সকল ওষধি জন্মায় এবং যে নীবারাদি বনে আপনা আপনি জন্মায়—উহাদের অকারণ ছেদ করিলে, পাপক্ষয়ার্থ এক দিবস ত্রুণব্রত হইয়া গরুর অম্মগমন করিবে ।”

* * * “অভোজ্যদিগের অন্ন ভোজনে ; স্ত্রী ও শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে ও অভক্ষ্য মাংস ভক্ষণে সপ্ত দিবাবাত্র যবের খাউ পান করিয়া থাকিবে” ১৫৩।

* * * “শুক মাংস ও ভূমিজাত ছত্রাক এবং হরিণমাংস কি গর্দভমাংস—এইরূপ সন্দিগ্ধ মাংস এবং সূনা অর্থাৎ পশুবধ স্থান হইতে আনীত মাংস ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়” ১৫৬।

“আত্মশুদ্ধিকামী ব্যক্তির কদাচ প্রতীসিদ্ধ ভোজন করী উচিত নহে । প্রমাদ বশতঃ একরূপ অন্ন ভক্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ বমি করিয়া ফেলিবে

কিন্তু তাহা অসম্ভব হইলে ব্রাহ্মশূচীনা নাগক ওষধির কথিত জল পান করিবে” ১৬১ ।

* * * “পতিতেব সহিত এক বৎসর পর্য্যন্ত একযানগমন, একা-
মনোপবেশন এবং একপঙ্তিতোজনরূপ সংঘম করিলে পতিত হইতে
হয় ; যাজন, অধ্যাপন এবং ঘোনি-সংসর্গে সদ্যই পাতিত্য হয় । পরন্তু
এক বৎসরে নহে (কাষণ উহাতে সদ্যঃ পাতিত্য) ১৮১ । যেকপ পাপীর
সহিত সংসর্গ হয়, সংসর্গ শুদ্ধিব জন্তু সেই পাপীর যে প্রায়শ্চিত্ত, তাহা
করিতে হইবে” ১৮২ ।

* * * “ব্রাহ্মণ গর্হিত উপায়ে যদি ধন উপার্জন করেন, তবে ঐ ধন
দান করিয়া বক্ষ্যমাণ জপ এবং তপশ্চা দ্বারা শুদ্ধ হইবেন ১৯৪ । সমাহিত
মনে তিন সহস্র সাবিত্রী জপ করিয়া দুগ্ধ পান করতঃ একমাস কাল
গোষ্ঠবাসী হইয়া অসৎ প্রতিগ্রহ হইতে মুক্ত হইবেন ১৯৫ । গোষ্ঠ হইতে
পুনরাগত, উপবাস কৃশ প্রণত ঐ ব্রাহ্মণকে জ্ঞাতিরা জিজ্ঞাসা করিবেন—
সৌম্য ! তুমি কি আগাদের সহিত সমান ব্যবহার হইতে চাও’ ১৯৬ ।
তাহাতে যদি ব্রাহ্মণ উত্তর করে যে ‘সত্য সত্যই আর আমি অসৎ
প্রতিগ্রহ করিব না,’ তবে গরুকে ঘাস খাইতে দিবে,—গরুতে যে স্থানে ঘাস
খাইবে, সেই তীর্থ স্থানে উহার সহিত ‘ব্যবহার করিব’ বলিয়া ব্রাহ্মণেরা
স্বীকার করিবেন” ১৯৭ ।

* * * “বেদোক্ত নিত্য কর্মের অকরণে (বাহার প্রায়শ্চিত্ত বিশেষ-
রূপে কথিত নাই) এবং স্নাতক ব্রতের গোপকরণে অহোরাত্র উপবাসরূপ
প্রায়শ্চিত্তও আনিবে” ২০৪ । নিত্য ব্যবহৃত কতকগুলি পাপ বা তথা
কথিত কতকগুলি গুরুতর পাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন সংহিতাকারগণের মন্তব্য
উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা—

“চাণ্ডালানভোজী চতুর্বর্ণের বক্ষ্যমাণ প্রকারে শুদ্ধি ; যথা, ব্রাহ্মণ—

চান্দ্রায়ণ ; ক্ষত্রিয়—সান্ত্বপন ; বৈশ্য—ষড়্ রাত্র ব্রত ও পঞ্চগব্য ভোজন ;
এবং শূদ্র—ত্রিরাত্র ব্রত করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে শুদ্ধ হইবে ।”
(অত্রিসংহিতা অনুবাদ ১৭২—১৭৩) ।

“চণ্ডাল সমীপে বেদ, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ ঘটিত কথা বলিলে, তাহার শুদ্ধি
চান্দ্রায়ণ দ্বারা হইতে পারে, তাহার আব অশ্রু কোনরূপে নিষ্কৃতি নাই ।”
(উশনঃ সংহিতা—২৬১ পৃষ্ঠা, নবম অধ্যায় ৭২ শ্লোক ।)

“শূদ্রায় জ্ঞানপূর্বক ভোজন করিয়া কুচ্ছূত্রয় করিবে ।” (আপস্তম্ব-
সংহিতা ১৫—নবম অধ্যায়) “যে ব্রহ্মচারী শূদ্রহস্তে আনীত অন্ন কিম্বা
পানীয় দ্রব্য ভোজন বা পান করে, সে এক অহোরাত্র উপবাসান্তে পঞ্চগব্য
পান করিয়া শুদ্ধ হইবে । পতিত ব্যক্তির নিকট হইতে দ্রব্য গ্রহণ করিলে,
সেই দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া বিধিপূর্বক প্রোজাপত্য করিলে শুদ্ধ হইবে ।”
(৬১ —নবম অধ্যায়, উশনঃ সংহিতা) ।

“মুঢ়াত্মা দ্বিজাধম জ্ঞানপূর্বক মহাপাতকী ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া বিনা
মানে ভোজন করিলে তপ্ত কুচ্ছূ (১) ব্রত করিবে ।” (৫০—নবম অধ্যায় ;
উশনঃ সংহিতা অনুবাদ ।)

“শলল, বলাকা, হংস, কারণ্ডব, অথবা চক্রবাক ভোজন করিলে দ্বাদশাহ
উপবাস করিবে । কপোত, টিটিভ, ভাস, শুক, সারস ভক্ষণে দ্বাদশাহ
উপবাস করিবে । শিশুমার, মায়, মৎস্ত, মাংস অথবা বরাহ ভোজন
করিলে দ্বাদশাহ উপবাস । * * * রোগ বশতঃ মৃত পশু প্রভৃতির মাংস
যাহা মাত্র আত্মভক্ষণোদ্দেশে কৃত বৃথা মাংস বা অগ্নাদি ভোজন করিলে
তৎপাপক্ষয়ার্থ সপ্তাহ গোমূত্র সিদ্ধ যাবকাহার করিবে । কপোত * * * ক্ষুণ্ণ

(১) “তিন দিন উষ্ণ জল, তিন দিন উষ্ণ ঘৃত, তিন দিন উষ্ণ দুধ পান করিবে ও
তিন দিন উপবাস করিবে ; ইহা তপ্তকুচ্ছূ ।” “আহমুখাঃ পিবেদ পদ্মাহমুখাঃ ঘৃতং আহমুখাঃ
পয়স্বাহমুখাঃ নান্দীমাদেয তপ্ত কুচ্ছূ : ॥১১॥ ষট্চত্বাঙ্গিশোহধায়ঃ বিমুসংহিতা ।

ভোজন করিলে প্রোজাপত্য করিবে । পলাণ্ডু বা লণ্ডন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে । বার্তাকু (শ্বেত বার্তাকু বা বেণ্ডন) এবং চণ্ডলীর ভোজনে, প্রোজাপত্য দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে । * * * নরভোজনে তপ্ত-কুচ্ছু করিলে শুদ্ধ হইবে, অলাবু ভোজনে প্রোজাপত্য করিবে । স্বথা অর্থাৎ দেবোদ্দেশ্য ব্যতিরেক পক্ষ কুমার সংঘাব (গোহন ভোগ), পায়স, পিষ্টক ভোজনে তপ্তকুচ্ছু এবং তত্পরি ত্রিরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধিলাভ হইবে । ”

* * * “যাহার প্রসব দিন হইতে দশদিন অতিবাহিত হয় নাই তাদৃশ গাভীর দুগ্ধ, মহিষ-দুগ্ধ, অজা-দুগ্ধ, বিবৎসা গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ পান করিলে এক পক্ষ গোমূত্র সিদ্ধ যাবক ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে । এই সকল দুগ্ধ-বিকার দধি স্নাত ছানা মাখন প্রভৃতি পান করিলে অথবা অজ্ঞানতঃ ইহা পান করিলে সাত দিন গোমূত্র সিদ্ধ যাবক ভোজী হইয়া থাকিলে পরে বিশুদ্ধ হইবে ” । অনুবাদ—উশনঃ সংহিতা, নবম অধ্যায় ।)

বিষ্ণুসংহিতার একপঞ্চাশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই :—

“স্বরাপায়ী ব্যক্তি যজন যাজনাদি সর্বকর্মবর্জিত হইয়া এক বর্ষ কণমাত্র ভোজন করিয়া থাকিবে । মলমদ্য ও সকলের অন্যতম ভোজনে চান্দ্রায়ণ করিবে । লণ্ডন, পলাণ্ডু, গৃঞ্জন (সম্ভবতঃ গাঁজর) এতদগন্ধী (অর্থাৎ লণ্ডনাদি গন্ধযুক্ত দ্রব্য) বিড়, বরাহ, গ্রাম্য কুক্কট এবং গো (এতদন্যতমের) মাংস ভোজনেও ঐ চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত । গণ (হোটেলাদির অন্ন) ভোজনে ৭ দিন দুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করিবে । ভৃগুর (ছুতারের) অন্ন, চর্ম্মকারের অন্ন, কুসীদজীবী, দাস্তিক, চিকিৎসা-জীবী, লুক্ক, ক্রূর, * * * পুর্ব্বকার, শত্রু, পতিত, পিণ্ডন (অসাক্ষাতে পরনিন্দাকারী), মিথ্যাবাদী, ধর্ম্মভ্রষ্ট, সোমবিক্রয়ী, নট, তন্তুবায়, কৃতঘ্ন, রজক, কর্ম্মকার, নিষাদ, বেণুজীবী, লৌহবিক্রয়ী, শৌণ্ডিক, তৈলিক, মন্ত,

কুক্ক, আতুর ইহাদের প্রত্যেকের অন্ন, অথবা বৃথা মাংস ভোজন করিলেও ৭ দিন ছুফ্ফ আহারে জীবনধারণ করিবে। * * * রোহিত, রাজীব, শকুণ ভিন্ন সকল প্রকার মৎস্য ভোজনেই তিন দিন উপবাস করিবে। অপর সকল জলজ প্রাণীর মাংস ভোজনেও ঐ প্রায়শ্চিত্ত। মাংস ও শুষ্ক মাংস ভোজন করিলেও ঐ চাক্ষায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে”। ব্রাহ্মণ শূদ্র আপামর প্রায় সকলেই এখন গো বিক্রয় করিয়া থাকে কিন্তু শাস্ত্রকার গো বিক্রয়ীর জন্ত তপ্তকচ্ছ ব্রত ব্যবস্থা করিয়াছেন।

শাস্ত্রকারের মতে—বক, হাঁস, চক্কা, কপোত, মৎস্য, মাংস ও শূকর ভোজন সমান অপরাধ—প্রায়শ্চিত্ত ১২ দিন উপবাস। কপোত ও কুক্কট ভোজন, সাদা বেগুন ও লাউ ভোজন তুল্যাপরাধ; দণ্ড প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত। দেবোদ্দেশ্য ব্যতিরেকে প্রস্তুত মোহন ভোগ, পায়স, পিষ্টক ভোজনে তপ্তকচ্ছ এবং তদুপরি তিন রাত্রি উপবাস। পেঁয়াজ, রসুন এবং এতদঙ্গকযুক্ত দ্রব্যাদি বিড়্ বরাহ গ্রাম্য কুক্কট গোমাংস এবং বধ্যস্থানস্থিত কশাইএর মাংস ভক্ষণ তুল্যাপরাধ, দণ্ড চাক্ষায়ণ প্রায়শ্চিত্ত। হোটেলের অন্ন, ছুতার, চামার, স্নদখোর মহাজন, ডাক্তার কল্লিরাজের অন্ন, স্তবর্ণ-কারের অন্ন, মিথ্যাবাদী, ধর্মভ্রষ্ট, তন্তবায়, রজক, কর্মকার, ব্যাধ, লৌহ-বিক্রয়ী, সূঁড়ি, তৈলিক প্রভৃতির অন্ন এবং বৃথা মাংস ভোজন—তুল্যাপরাধ। দণ্ড ৭ দিন ছুফ্ফ আহারে জীবনধারণ করা। রাই শোল ভিন্ন অল্প সর্ষ প্রকার মৎস্য ভোজনে—সকল প্রকার জলজ প্রাণীর মাংস ভক্ষণে তিন দিন উপবাস।

যম বলেনঃ—সূর্য্য ভিন্ন অপর মদ্য (খারজুর পান্যাদি) পান বা গোমাংস ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ তপ্তকচ্ছ করিবে, তাহা হইলেই সেই পাপ বিনষ্ট হইবে।” (১১শ শ্লোক)

বঙ্গীয় হিন্দু সমাজে সদা অমুষ্ঠিত ও সর্বত্র প্রচলিত প্রায় সমুদয় পাপ

কার্যগুলির তালিকা ও উহার প্রায়শ্চিত্ত বিধি উদ্ধৃত হইল । এই মহাপাতক, উপপাতক, সঙ্করীকরণ পাতক, অপাত্রীকরণ এবং মলিনীকরণ পাতকগুলির প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা লিখিত হইল । বাঙ্গলার হিন্দু সমাজপতিগণ এই সমস্ত পাতকীগণকে শাস্ত্রকথিত প্রায়শ্চিত্ত করাইতে পারিতেছেন কি ? তাঁহাদের সে ক্ষমতা আছে কি ? এ সমুদয় শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত চালাইতে গেলে হিন্দু সমাজ তাহা গ্রহণ করিবে কি ? হিন্দু সমাজ গ্রহণ করে বা না করে, আপনারা নিজেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন কি ? সমাজে জোর করিয়া ব্যবস্থা চালাইতে চান, জোর জবরদস্তি করিয়া বাঙ্গলার হিন্দু সমাজে মনুসংহিতা-কথিত ধর্মবিধি প্রতিষ্ঠা করিতে বাসনা এবং রঘু-নন্দনের স্মৃতি চালাইয়া বাঙ্গলাদেশ ধর্মের মহাবল্ল্য ভাসাইতে চাহেন, জিজ্ঞাসা করি আপনারা নিজেরা কি শাস্ত্রকথিত বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলেন ? শাস্ত্র মানিয়া চলিবার ক্ষমতা রাখেন কি ? নিজে না মানিয়া মানাইতে চাহেন, নিজে বিধিনত না চলিয়া অন্তের উপর চালাইতে চাহেন ? নিজেরা ধর্ম না করিয়া অন্তকে জোর করিয়া ধার্মিক করিতে চাহেন ? ধর্মে তাহা সহিবে কেন ? মাথা দিতে পারেন না, মাথা নিতে চাহেন ? আদেশ প্রতিপালন করিতে চাহেন না, আদেশ চালাইতে চান ? হুকুম তালিম করিতে পারেন না, হুকুম দিতে চাহেন ? সেবা করিতে কাতর—নেতা হইতে সাধ ? বাঙ্গলা দেশ বলিয়া এত অত্যাচার নীরবে—সহ্য হইয়াছে । আর না,—আর আপনাদের জারি জুরি খাটিতেছে না । ইংরাজ রাজত্বে অবাধ বিদ্যা প্রচারে আপনাদের আধিপত্যের এখন মরণ কাল উপস্থিত । এক টুকরা সূতা সম্বল করিয়া গুরুগিরি করিবার সাধ—নেতৃত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা ? আপনাদের বাসনাকে ধন্যবাদ ! মনে করিয়াছেন এইভাবেই পূর্বপুরুষগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছেন । ভুল, আপনাদের বড় ভুল । তাঁহারা শুধু পৈতা-সর্বস্ব ছিলেন না ।

শুধু পৈতাদ্বারা অমিতপরা ক্রম ক্ষত্রিয় রাজগণকে করতলগত করিতে পারেন নাই । পৈতাব সঙ্গে আরও কিছু ছিল, তাহা অধ্যাত্মবিদ্যা, ধর্ম-বল, স্বার্থত্যাগ, বিশ্বপ্রেম । আকাশের হ্রায় তাঁহাদের বুকখানা ছিল, সাগরের হ্রায় হৃদয়খানা ছিল—সূর্য্যের হ্রায় জগতের কল্যাণকামী আচঞ্চল সমদৃষ্টি প্রাণখানা ছিল । বায়ুর হ্রায় সর্বত্রগমনখানা ছিল । কত ছিল । সমাগরা ধরিত্রীর কল্যাণ সাধনাই জীবনের চরম সাধনা ছিল । সাধে কি ক্ষত্রিয় বাজা ধনবান্ বৈশ্য দাসের মত পদ সেবা করিত—বাধ্য থাকিত ।

আর আপনাদের এখন আছে কি ? অমন সব দেবপ্রতিম বিশালহৃদয় মহাপুরুষগণের আশ্রয়ে থাকিয়াই না তাঁহারা পৃথিবীর সম্রাট হইয়াছিলেন ? অমন সব ত্রিকালদর্শী তত্ত্বজ্ঞ নেতার নেতৃত্বের ফলেই না ভারতের সম্রাটগণের এত উন্নতি ? অমন সব সমাজ পরিচালকগণের চালনাশক্তিতেই না ভারতের চতুর্দর্শের অত উন্নতি, ভারতের অত সৌভাগ্য, অত গৌরব ? আর আপনাবা ? আপনাদের কথা আর কি বলিব, যখন আপনাদের হ্রায় পাত্রেয় গদায় ভারত সমাজচতুরাশ্রমসংবদ্ধ হিন্দুসমাজরূপ মুক্তার মালা উঠিল, অমনি ভারতের চির উজ্জল ভাস্কর অবনতির কাল আস্তাচলে চিরতরে ডুবিয়া গেল । মালা ছিল বিচ্ছিন্ন হইয়া ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে । যদি কেহ সহায়ভূতি বশে ঐ বিচ্ছিন্ন যুক্তাংশগুলি একত্র করিয়া পুনরায় মালা গাঁথিতে যায় অমনি আপনারা আপনাদের উচ্চ চীৎকার-ধ্বনিতে সে কার্য্যে বাধা দিতে অগ্রসর হইতেছেন । আপনারা গাঁথিয়াছেন কি ? গুরু পুরোহিত পবিত্র পূর্ণ সিংহাসন ক্রিমি বিষ্ঠায় কলঙ্কিত হইয়াছে, ভারত সমাজরূপ পবিত্র দেবমণ্ডপে পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে । সোণার হিন্দুসমাজ ছারখার হইয়া গিয়াছে । আরও কি ক্লেশ আছে ? এত করিয়াও কি সাধ মিটে নাই ?

অথগু মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং ।

তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

এই না গুরুর লক্ষণ ছিল ? অথগু মণ্ডলাকার চরাচর বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ভগবান্ হরির চরণ-দর্শন-দানের অধিকারী আপনাই কি বঙ্গের গুরু সম্প্রদায় ? চরাচর ব্যাপ্ত প্রেমময় বিশ্বপিতা শ্রীভগবানকে নিজে দেখিয়াছেন কি ? নিজে না দেখিলে অন্তকে—শিষ্যকে দেখান কি করিয়া ? দেখাইতে পারেন না ত গুরুপূজা গ্রহণ করেন কিরূপে ? অধম হইয়া সর্বোত্তম গুরুকপী নারায়ণের পূজা গ্রহণ করিতে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে না—বুক দূর দূর কবিয়া উঠে না ? অপরাধ স্বৰ্ণ করিয়া বিন্দুগাত্র ভয়ে ভীত হন না ? ধন্য আপনাদের হৃদয়কে, ধন্য আপনাদের ব্যবসাকে । ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদিত মন্তকে কেমন করিয়া পা উঠাইয়া দেন ভাবিতে পারি না ।

আর পুরোহিত ! পুরের হিতসাধন ত দূরের কথা, আপনাদের দ্বারা অহিতই সাধন হইতেছে । চরিত্র দোষে নিজেরা ডুবিয়াছেন, সঙ্গ গুণে অন্তকেও ডুবাইতেছেন । আপনাদের প্রাণপণ হিত চেষ্টায় হিন্দুসমাজ চৌদ্দ আনা ডুবিয়াছে । আর কেন ? যথেষ্ট হইয়াছে, এখন দয়া করিয়া অবশিষ্টটুকুর লোভ ত্যাগ করুন । এটুকু ডুবাইবার চেষ্টাব ক্রটি হয় নাই, কিন্তু ভগবানের করুণায় একটু বাঁচিয়া আছে । দেবতাব প্রিয় লীলাস্থল সহস্র সহস্র ঋষির পদব্রজে পবিত্রীকৃত ভারতে হিন্দু সমাজ বিনষ্ট হইবার নহে । ইহা দ্বারা জগতের অনেক কল্যাণ সাধিত হইবে । তাহার পরিচয় রামমোহন রায়, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র, মহাত্মা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, স্বামী রামতীর্থ, স্বামী বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, প্রেমানন্দ ভারতী, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশ বসুদ্বারা ধরিত্রীর বৃক্ষ মণ্ডলী কিঞ্চিৎ অনুভব করিতেছেন । জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারে ভারতীয় আৰ্য্য হিন্দু সমাজের কিছু দিবার আছে ।

তাই সে এত অত্যাচার, এত বিপ্লব, এত নিপীড়ন সহ্য করিয়া আজিও জীবিত আছে। বর্তমান কালের সমাজপতিকণ কুচিকিৎসকগণের কুচিকিৎসা অনবরত বিষ-প্রয়োগে হিন্দু সমাজ যুগ্মযুগ্ম দশায় উপনীত হইয়াছে। তবে নাই, বিষ-ক্রিয়ায় হতচেতন হইয়া আছে মাত্র। বর্তমান যুগের কতকগুলি সূচিকিৎসক উহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন আশা জন্মিয়াছে, বর্তমান যুগাচার্যগণের সূচিকিৎসা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বহুদিন নিয়মিতভাবে চলিলে আবার মৃতপ্রায় হিন্দু সমাজ জাগিবে, উঠিবে, রোগমুক্ত হইয়া মেঘমুক্ত দিবাকরের আয় ভারতগগনে শোভমান হইবে। পুরোহিত,—কি মঙ্গলপ্রদ নাম। শুনিতে কণকুহর শীতল হয়। পুরোহিত কে? “বেদ, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, সঙ্গুজাত, সম্পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন, তপোনিষ্ঠ” ব্যক্তিই পুরোহিত। যে সে কি পুরোহিত হইতে পারে? যাকে তাকে কি পুরোহিত নির্বাচন করা উচিত? শাস্ত্রকার পুরোহিত নির্বাচন সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

“বেদেতিহাসধর্মশাস্ত্রার্থকুশলং কুপোননব্যঙ্গং তপস্বিনং পুরোহিতঞ্চ বরয়েৎ ।”

৪৯। তৃতীয়োহধ্যায়ঃ, বিষ্ণুসংহিতা ।

বাঙ্গলা দেশে কোটী কোটী হিন্দু মন্তান কি উপরি লিখিত গুরুনম্পন্ন পুরোহিত দ্বারা দৈনন্দিন শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ নির্বাহ করিয়া থাকেন? বাঙ্গলায় এমন পুরোহিত কমটী আছে বলিয়া দিবে কি? কেবল যে শাস্ত্র শাস্ত্র করিয়া চীৎকার কর, শাস্ত্র-নির্দিষ্ট পথে চলিবার তোমাদের ক্ষমতা আছে কি? বর্তমান কালের যাহারা পুরোহিত, তাহারা পুরোহিত নহেন—পুরোহিত নামের কলঙ্ক। ছই চারি জন ভাল লোক থাকিতে পারেন কিন্তু তাহাদের মিকট বিরাট হিন্দু সমাজের কি প্রত্যাশা! এই অযোগ্য শাস্ত্রবিরোধী পুরোহিতগণ দ্বারা কিরূপে ক্রিয়া নির্বাহিত হইতে পারে?

শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াকলাপ—বিবাহ, শ্রাদ্ধ, শান্তি স্বেস্তয়ন—অশাস্ত্রীয় পুরোহিত দ্বারা কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে ? পবিত্র গঙ্গাজল গোমাংস সংমিশ্রণে কি অপবিত্র হয় না ? তোমাদের শাস্ত্রকারই তাহা অনুমোদন করিতেছেন না । তারপর বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শান্তি, স্বেস্তয়ন, পূজা, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের পর ব্রাহ্মণ ভোজনের কথা । দীন হীন দরিদ্র, অধম, ক্ষুৎক্ষাম, জ্যোতির্হীন চক্ষু শূদ্রকে ভোজন করান অপেক্ষা ব্রাহ্মণ-ভোজনই প্রশস্ত ও পুণ্যজনক বলিয়া তোমরা বিশ্বাস কর । তোমাদের ব্যবস্থাপকগণও তোমাদিগকে তাহাই বুঝাইয়াছেন । কিন্তু ক্রিয়া হস্তে তোমরা যে সব ব্রাহ্মণ ভোজন করাও, সে সব ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে ত তোমাদের শাস্ত্র অনুমোদন করিতেছেন না ।

ব্যবস্থাশাস্ত্রকার-শ্রেষ্ঠ-মন্ত্ৰ বলিতেছেন (তৃতীয় অধ্যায়) :—

* * * “এই শ্রাদ্ধে যে যে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হয়, যে যে ব্রাহ্মণকে পরিতোষ করাইতে হয়, যতগুলি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয় এবং যেরূপ অন্ন দ্বারা ভোজন করাইতে হয় দ্বিজোত্তমগণ ! আমি সেই সমুদয় সম্যকরূপে বলিতেছি । ১১৪। দৈবকার্য্যে দুই ও পিতৃকার্য্যে তিনজন ব্রাহ্মণ অথবা দেবপক্ষে এক ও পিত্রাদি পক্ষে একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয় । সমৃদ্ধিশালী হইলেও ইহা অপেক্ষা বিস্তর ব্রাহ্মণ ভোজনে প্রসক্ত হইবে না । ১২৫। ব্রাহ্মণ বাহুল্য হইলেও তাঁহাদের সেবা, দেশ, কাল-শুদ্ধাশুকি এবং পাত্রাপাত্র বিচার,—এই পাঁচটী সম্বন্ধে কোন নিয়ম থাকে না । এ কারণ ব্রাহ্মণ-বাহুল্য করিতে চেষ্টা করা উচিত নয় । ১২৬। * * * পূজ্যুত্তম বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে দেব-পিতৃসম্বন্ধীয় হব্য কব্যাদি অন্ন সকল প্রদান করা দাতাগণের উচিত । এইরূপ ব্রাহ্মণে দান করিলে মহাফল জন্মে । ১২৮। বিজ্ঞ, দৈব এবং পিতৃকার্য্যে এক একটী বেদবিদ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন । ইহাতেও তাঁহার পুষ্টতর ফললাভ হইবে ; কিন্তু

বেদানভিজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও কোন ফল নাই । ১২৯।
 বেদ-পারগ ব্রাহ্মণের অতিদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান লইবে অর্থাৎ তাঁহার পিতা
 পিতামহাদি পূর্বপুরুষগণেরও কিরূপ আভিজাত্যাদি গুণ তাহা নিরূপণ
 করিবে । এইরূপ বংশপরম্পরাগুচ্ছ, বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ হব্যকব্য বহনে তীর্থ-
 স্বরূপ । এইরূপ ব্রাহ্মণকে দান করিলে অতিথিকে দানের স্থায় মহাফল প্রাপ্ত
 হওয়া যায় । ১৩০। বেদানভিজ্ঞ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ যথায় ভোজন করে, সেই
 শ্রাদ্ধে বেদবিৎ একজন ব্রাহ্মণও যদি ভোজনাদি দ্বারা প্রীত হন, তাহা
 হইলে ঐ দশ লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল ধর্ম্যতঃ একা ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারা
 নিষ্পাদিত হইয়া থাকে । ১৩১। জ্ঞানোৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণকেই হব্য কব্য প্রদান
 করা উচিত । রক্তাক্ত হস্ত রক্ত দ্বাবা প্রক্ষালিত হইলে কখন শুদ্ধ হয় না ।
 অর্থ এই যে, মুখপাপী লোকদিগকে ভোজন করাইলে পাপ কখন বিদূরিত
 হয় না । ১৩২। অজ্ঞ ব্রাহ্মণ হব্য কব্য যে কয়েকটী গ্রাস ভোজন করেন,
 মৃত হইলে পর পরলোকে তাঁহাকে ততগুলি উত্তম লৌহপিণ্ড ভোজন করিতে
 হয় । ১৩৩। দ্বিজগণের মধ্যে বা কেহ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কেহ কেহ তপস্তাপরায়ণ,
 কেহ কেহ বা তপস্তা ও অধ্যয়ন—উভয় নিষ্ঠ এবং আর কতকগুলি কর্মনিষ্ঠ ।
 ইহার মধ্যে পিতৃলোকের উদ্দেশে যে কব্য, তাহা আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণেই
 যত্নপূর্বক স্থাপন করিতে হয় ; কিন্তু দেব সম্বন্ধীয় হব্য সকল যথাশ্রায়
 —ঐ চারি প্রকার ব্রাহ্মণকেই দেওয়া যাইতে পারে । ১৩৪। * * * শ্রাদ্ধ
 কার্যে মিত্রতা নিবন্ধন ভোজন করাইবে না ; ধনাত্তর বা বারণাত্তর দ্বারা
 মিত্রের প্রতি মিত্রতা প্রদর্শন করা উচিত । কিন্তু যিনি শত্রুও নহেন, মিত্রও
 নহেন এমন ব্রাহ্মণকেই শ্রাদ্ধে ভোজন করান কর্তব্য । ১৩৫। যাহার শ্রাদ্ধ
 অথবা দৈবকার্য্য মিত্রপ্রধান অর্থাৎ প্রধানতঃ যাহার শ্রাদ্ধাদিতে মিত্রগণই
 ভোজন করেন, তাঁহার সেই কার্য্যে পারলৌকিক কোন ফল নাই । ১৩৬।
 যে মনুষ্য মোহ বশতঃ শ্রাদ্ধ কার্য্য দ্বারা মিত্রতা সম্পাদন করিতে যায়,

শ্রাদ্ধগিত্র দ্বিজাধম কখন স্বর্গ-লাভের অধিকারী হয় না । ১৪০। দ্বিজগণ কতৃক মিত্রতা-সাধন যে গোষ্ঠী ভোজন, উহাকে খাঘিরা পিশাচ ধর্ম বলিয়া থাকেন । * * * লবণাক্ত ভূমিতে বীজ বপন করিয়া বপনকারী যেমন কোন ফল লাভ করে না, তজ্জপ অবিদ্বান ব্রাহ্মণকে হবি দান করিয়া দাতা কোন ফল পান না । ১৪২। পরন্তু বিদ্বান ব্রাহ্মণকে বিধিবৎ দক্ষিণা দান করিলে দাতা ও প্রতিগৃহিতা—উভয়েই ইহ পর—উভয় লোকেই ফলভাগী হন । ১৪৩। * * * শ্রাদ্ধে অতি যত্নের সহিত বেদপারগ ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণকে অথবা সমুদায় শাখাধ্যায়ী বজ্রুর্বেদী ব্রাহ্মণকে কিংবা সমাপ্তাধ্যায় সামবেদী ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে । ১৪৫। এই তিন ব্রাহ্মণের একজনও যাহার শ্রাদ্ধে অর্চিত হইয়া ভোজন করেন, তাঁহার পিত্রাদি সপ্ত পুরুষের চিরস্থায়িনী তৃপ্তিলাভ হয় । ১৪৬। হব্য কব্য প্রদানে পূর্বোক্ত শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণই মুখ্যকল্প জানিবে । তদভাবে সাধুজনাস্থিতি বক্ষ্যমান অশুকল্প বিধি এই যে, মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, স্বশুর, শুর, দৌহিত্র, জামাতা, মাতৃশ্বশ্রু পিতৃশ্বশ্রুপুত্রাদি, বন্ধু, পুরোহিত ও শিষ্য ইহাদিগকে ভোজন করাইবে । ১৪৭-১৪৮। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি দৈবক্রিয়ায় ভোজনীয় ব্রাহ্মণগণের তত পরীক্ষা করিবেন না । কিন্তু পিতৃকার্য্যে তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত পরীক্ষা করিবেন । ১৪৯।

“যে সকল ব্রাহ্মণ পতিত, বেদাধ্যয়ন-শূন্য ব্রহ্মচারী, চর্ম্মরোগগ্রস্ত, দূত্যক্রীড়াপরায়ণ এবং বহু যাজনশীল ব্রাহ্মণ, ইহাদিগকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না । ১৫১। চিকিৎসক ব্রাহ্মণ, প্রতিগা-পরিচারক দেবল ব্রাহ্মণ, যে সকল ব্রাহ্মণ নিন্দিত—বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, গ্রামের বা রাজার সুরকারী ভৃত্য, কুৎসিত নথ রোগ বিশিষ্ট শুরুর প্রতিকূলাচরণকারী, শ্রোত স্মার্ত অগ্নি পরিত্যাগকারী, কুসৌদজীবী, যক্ষ্মাযুগ্মী জীবিকার জন্ত ছাগ গো প্রভৃতি পশুপালক, * * * পঞ্চ-

মহাযজ্ঞানুষ্ঠান-রহিত, গণার্থ অর্থাৎ সাধারণের জন্ত উৎসৃষ্ট ঘঠ বা ধনাদিজীবী—এই সকল ব্রাহ্মণকে হব্য কব্যে ভোজন করাইবে না । ১৫৪।

যিনি শূদ্র-শিষ্য, যিনি শূদ্রকে অধ্যয়ন করান, যে সর্বদা নিষ্ঠুর-ভাষী * * * যে ব্রাহ্মণ পিতামাতা বা গুরুগণকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছে, যে পতিত লোকের সহিত অধ্যয়ন ও কল্যাণাদি সম্বন্ধ দ্বারা মিলিত হইয়াছে - যে স্তুতিবাদ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, যে পিতার সহিত বিবাদ করে, যে ব্রাহ্মণ মদ্যপায়ী, যে পাপ রোগী, যে অপবাদযুক্ত এবং যে ইক্ষু প্রভৃতির রস বিক্রয় করে তাহারা হব্য কব্য গ্রহণে উপযুক্ত নয় । ১৫৯।

যাহার অপস্মার রোগ আছে, যাহার গণ্ডমালা আছে, যাহার শ্বেত কুষ্ঠ আছে, যে ব্যক্তি দুর্জ্ঞান, উন্মত্ত, অন্ধ বা বেদ নিন্দক, নক্ষত্রাদি গণনা দ্বারা যাহাব উপজীবিকা, * * * যে ব্রাহ্মণ যুদ্ধের আচার্য্য (দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি) ইহাদিগকে হব্য কব্যে নিমন্ত্ৰণ করিবে না । ১৬২।

যে বাস্তববিদ্যাজীবী অর্থাৎ জীবিকার জন্ত বাটী নির্মাণাদি করে (ওভার-সিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি), যে দৌত্য কর্ম করে, যে বেতনভোগী হইয়া বৃক্ষ রোপণ করে, যে ব্রাহ্মণ হিংসাবৃত্তি করে, যে শূদ্রসেবাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, যে নানাজাতীয় লোকের যাজক, যে ব্রাহ্মণ আচারহীন, ধর্মকার্য্যে নিরুৎসাহ, যে সর্বদা যাচঞা দ্বারা অপরের বিরক্তি জন্মায়, যে স্বয়ংক্রম কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, ব্যাধির দ্বারা যাহার চরণ স্থূল হইয়াছে এবং সাধুদিগের নিন্দিত, তাহাদিগকে হব্য কব্যে নিমন্ত্ৰণ করিবে না । ১৬৫। * * * এই সকল নিন্দিতাচারী পংক্তি প্রবেশের অযোগ্য দ্বিজাধমদিগকে দ্বিজপ্রবর বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ, দৈব ও পৈতৃক উভয় কর্মেই পরিত্যাগ করিবেন । তৃণের অগ্নি যেমন শীঘ্র উপশম হইয়া যায়, বেদাধ্যয়নশূন্য ব্রাহ্মণও তদ্রূপ ; তৃণের অগ্নিতে যেমন কেহই স্থিতাছতি প্রদান

দৈব ও পিতৃকর্মে অপাণ্ডিত্যে ব্রাহ্মণকে হব্য কব্য প্রদান করিলে, দাতার পরলোকে যে ফলোদয় হয়, তাহা আমি অবশেষে বলিতেছি, শ্রবণ কর । ১৬৯। শাস্ত্রাচারবর্জিত, পণ্ডিতদুষণ প্রভৃতি এবং অপরাপর চৌরাদি দ্বিজগণ কর্তৃক যে হব্য কব্য ভুক্ত হয়, তাহা রাক্ষসেরা ভোজন করে । ১৭০। * * * শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ যে যে পণ্ডিতে উপবেশন করে, সেই সেই পণ্ডিগত শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হইতে দাতা বঞ্চিত থাকেন । ১৭৮। ব্রাহ্মণ বেদবিৎ হইলেও যদি লোভবশতঃ শূদ্রযাজীর নিকট প্রতিগ্রহ করেন, অপক শরাবাদি পাত্রে জল প্রবেশ করিলে তাহা যেমন শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ তিনিও শীঘ্র নষ্ট হইয়া থাকেন । ১৭৯। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে যাহা দেওয়া যায়, তাহা পুষ ও শোণিতবৎ ত্যাজ্য ; দেবল ব্রাহ্মণকে যাহা দান করা যায়, তাহা নিষ্ফল এবং বুদ্ধিজীবীকে (শূদ্রখোর) যাহা দেওয়া যায়, তাহা দেবাদি সমীপে স্থান লাভই করিতে পারে না । ১৮০। বণিক-বৃত্তিজীবী * * * দ্বিজকে যে হব্য কব্য দান করা যায়, ইহলোকে বা পরলোকে তাহার কোন ফল হয় না। উহা ভস্মাহুতির স্থায় নিষ্ফল হইয়া যায় । ১৮১। পূর্ব পূর্ব কথিত অসাদু ও অপরাপর অপাণ্ডিত্যে ব্রাহ্মণকে যে হব্য কব্য প্রদান করা যায়, পণ্ডিতেরা বলেন যে, তাহা মেদ, মাংস, রক্ত, মজ্জা ও অস্থি স্বরূপ । ১৮২। আবার যে দ্বিজোত্তমগণ কর্তৃক অপাণ্ডিত্যে তন্ত্রাদি দ্বারা দুষিত পুংক্তিও পবিত্র হয়, সেই পুংক্তিপাবন দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের কথা সমগ্রভাবে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ১৮৩।

“সমুদায় বেদে যাহারা অগ্রগণ্য, সমুদায় বেদাঙ্গেও যাহারা সমধিক বুৎপন্ন এবং দশপুরুষ পর্য্যন্ত যাহাদের বংশে বেদাধ্যয়নের বিশ্রাম নাই, সেই ব্রাহ্মণগণকেই পণ্ডিতপাবন বলিয়া জানিবে । ১৮৪। যজুর্বেদের প্রথ্যাত ভূগ ত্রিণাটিকেত যিনি ব্রত সহকারে অবলম্বন করিয়াছেন, যিনি

পঞ্চাগ্নিবিশিষ্ট, প্রখ্যাত ত্রিসুপর্ণ যিনি ব্রত সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন, ছয়টি বেদাঙ্গে যাহাব বিশেষ ব্যুৎপত্তি, যিনি ব্রাহ্ম বিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভজাত এবং যিনি সামবেদের আরণ্যক গান করিয়া থাকেন, এই ছয়জন সকলেই পণ্ডিত্তিপাবন ব্রাহ্মণ । ১৮৫ । বেদার্থের বেত্তা, বেদার্থের প্রবক্তা, ব্রাহ্মচারী, বহু দানশীল, শতবর্ষায়ুষ্ক ব্রাহ্মণ—ইহাবা সকলেই পণ্ডিত্তিপাবন বলিয়া জানিবে । শ্রাদ্ধ কৰ্ম্ম উপস্থিত হইলে তাহার পূৰ্ব্ব দিনে অথবা শ্রাদ্ধ দিনে ন্যূন সংখ্যায় অন্ততঃ তিনটি পূৰ্ব্বকথিত ব্রাহ্মণকে যথোচিত সম্মান সহকারে নিমন্ত্রণ করিবে । ১৮৭ ।

নিমন্ত্রিত সেই ব্রাহ্মণ-শরীরে পিতৃগণ অদৃশ্যরূপে অনুপ্রবেশ করেন ; তাঁহারা যথায় গমন করেন, বায়ু-প্রমাণ পিতৃগণ তাঁহাদের অনুগমন করেন এবং তাঁহাবা আসীন হইলে পিতৃগণ উপবিষ্ট হন” । ১৮৯ ।

অত্রি বলেন :—“যাহাবা অঙ্গহীন, রোগী, বেদ ও ধর্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, মিথ্যাবাদী, হিংসক, কপটচারী, আত্মগোপন পূৰ্ব্বক বেদান্ত্যাসকাবী সেবাজীবী, কপিলবর্ণ, কাণ, শ্মিত্ররোগী, শীর্ণকেশ (যাহার ঝাঁকড়া চুল) পাণ্ডুরোগী, বুথাজটাধারী, ভারবাহী, ক্রুদ্ধস্বভাব, দ্বিভাষ্য এবং বুঘলী-পতিকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না । যে ব্যক্তি ভেদকাবী (পরস্পরের বন্ধুত্বনাশক) অনেকের পীড়াজনক, অঙ্গহীন বা অধিকান্ধ হইবে, তাহাকেও অপনীত করিবে (শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না) । ৩৩৮—৩৪০ । বহুভোজী, মৎসরী ইহাদিগকে পাত্রীয়ান বা ধনাদি দান করিবে না । ব্রাহ্মণদিগের দুইটি চক্ষু, এক হীন হইলে কাণা, এবং দুই বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলে অন্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় । যাহার প্রতি শ্রুতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা, সচ্চরিত্রতা নাই, সেই অন্ধাধমকে শ্রাদ্ধে অন্ন দিবে না । বেদ এবং ধর্মশাস্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব,—কেবল বেদদ্বারা নহে—ভগবান্ অত্রি ইহা বলিয়াছেন । যিনি যোগজনিত দিব্য-দর্শন প্রভাবে পাদাঙ্গ নিক্ষেপ

(সৎপথে বিচরণ) করেন এবং লোক ব্যবহার জ্ঞান, ধর্মশাস্ত্র, বেদ ও পুরাণোক্ত বিধি নিষেধ দর্শন করেন, তিনিই উত্তম দৃষ্টিশালী এবং সর্বশাস্ত্রজ্ঞ। সর্বদা শ্রুতি স্মৃতিপরায়ণ ব্রতী (নিয়মী) এবং সদ্বংশজাত তাদৃশ ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইলে পিতৃলোক চিরস্বর্গবাসী হন। এবংবিধ ব্রাহ্মণে যে সময়ে দীপ্ততেজাঃ (বসু-রুদ্রাদিকপী) পিতা পিতামহ প্রপিতামহ উদ্দেশে প্রদত্ত অন্নের গ্রাস ভোজন কবেন, (পূর্বে) ঐ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, নরকে থাকিলেও (সেই সময়ে) নরকমুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করেন। এই জন্ত শ্রাদ্ধকালে যজ্ঞপূর্বক ব্রাহ্মণেব বিচার করিবে”। (অনুবাদ—উনবিংশ সংহিতাস্তর্গত অত্রিসংহিতা)

উপরে দৈব ও পৈতৃকাকার্য্য অপাঙক্ত্যের অযোগ্য বা পতিত ব্রাহ্মণ-গণের বিস্তৃত তালিকা উদ্ধৃত হইল। শাস্ত্রকার বলিতেছেন, এইরূপ পতিত ব্রাহ্মণ ভোজন নিষ্ফল হয় ও পিতৃপিতামহগণ নরকে গমন করেন। আমরা ত শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রকৃত ব্রাহ্মণ একটীও দেখিতেছি না। প্রত্যেকেই কোন না কোন কার্য্য, আচরণ, ব্যবহার ও ব্যবসায়াদি দ্বারা পতিত—অপাঙক্ত্যের। কৈ আপনাদের শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণ, কোথায় আপনাদের গুরু পুরোহিত! ইহাদের কেহই ত ব্রাহ্মণ নহেন, ইহা আমার কথা নহে, আপনাদেরই শাস্ত্রের কথা। কৈ ব্রাহ্মণ, কোথায় ব্রাহ্মণ? যাহা দেখিতেছি তাহার প্রায় সকলগুলিই ত কেবল নামমাত্র পৈতামসর্বস্ব ব্রাহ্মণ। বেশী দেখিতে চাই না, আপনাদের মনু যাজ্ঞবল্ক্য যম আপস্তম্ব কথিত, আপনাদের বিষ্ণু অত্রি পরাশর ঘ্যাস নির্দেশিত, আপনাদের সংবর্ত কাভ্যায়ন, বৃহস্পতি শঙ্খ, লিখিত দক্ষ, আপনাদের শাতাতপ বশিষ্ঠ উশনঃ অঙ্গিরঃ ব্যবস্থিত একটী, দশকর্ম্মস্থিত একটী পুরোহিত, একটী ব্রাহ্মণেব নাগ করুন। বেশী নয় একটী, সমগ্র বঙ্গে—সমগ্র ভারতে একটী শাস্ত্রনির্দিষ্ট ব্রাহ্মণের নাম করুন। ব্রাহ্মণ,

কৈ ব্রাহ্মণ, কোথায় ব্রাহ্মণ, এ বঙ্গে কোথায় ব্রাহ্মণ ? ব্রাহ্মণ নাই । ৪৮ বৎসর, না হউক ২৪ বৎসর, না হউক অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচারী বেশে ব্রহ্মচর্যাশ্রম গুরুগৃহে অধ্যয়নাদি করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছেন এমন ব্রাহ্মণ এদেশে কেহ আছেন কি ? তাই বলিতেছিলাম ব্রাহ্মণ নাই । শাস্ত্র আছে ব্যবস্থা আছে, গুরু আছেন পুরোহিত আছেন, আড়ম্বর আছে বাক্য আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ নাই । বেদ আছে বেদান্ত আছে, পুৰাণ আছে সংহিতা আছে, সাক্ষ্য আছে পাতঞ্জল আছে, মনু আছে স্মৃতি আছে, ব্রাহ্মণ নাই । ব্রত আছে উপবাস আছে, পূজা আছে অর্চনা আছে, মন্ত্র আছে তন্ত্র আছে, ক্রিয়া আছে কৰ্ম আছে, ব্রাহ্মণ নাই । উপনয়ন আছে যজ্ঞোপবীত আছে, যোগী আছেন যতি আছেন, ব্রহ্মচারী আছেন সন্ন্যাসী আছেন, ধার্মিক আছেন দিব্যদর্শী আছেন, ব্রাহ্মণ নাই । মঠ আছে আশ্রম আছে, ধর্ম আছে পুণ্য আছে, ব্রাহ্মণ নাই । আপনাদেরই হিন্দুশাস্ত্র, আপনাদেরই মনু—স্মৃতি বলিতেছেন ব্রাহ্মণ নাই । আপনাদেরই শাস্ত্র ব্রাহ্মণের যে সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন, আপনাদেরই ব্যবস্থাকার যীহাদিগকে ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা দিয়াছেন—তেমন ব্রাহ্মণ—হিন্দুসমাজের এই ঘোর দুর্দিনে তেমন ব্রাহ্মণ একটিও নাই, একটিও থাকিতে পারে না । আপনাদেরই দিবারাত্র কথিত স্লেচ্ছ (?) অধিকৃত ভূমিতে ব্রাহ্মণ থাকিবে কিরূপে ? অর্থের লালসায়, ধনের প্রলোভনে আপনাদেরই ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতগণ যদি ব্রাহ্মণের জাতির বেতনভোগী হইয়া কার্য্য করিতে পারেন—তথা কথিত শূদ্রগণের দান গ্রহণ করিতে পারেন, মদ্যপায়ী মহাপাতকীর সংসর্গে মহাপাতক অর্জন করিতে পারেন, * অর্থের লোভে শূদ্র শিষ্য শূদ্র যজ্ঞমান রাখিতে পারেন, পুত্রকে শাস্ত্রবিগর্হিত অসৎশাস্ত্র (?) (ইংরেজী প্রভৃতি) অধ্যয়ন করাইতে পারেন, তবে ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু সমাজের এই ঘোর দুর্দিনে—সমাজ ও জাতির মঙ্গলের

জন্তু, দেশের স্বার্থ ও কল্যাণের জন্তু—জাতিক্ষয় নিবারণের জন্তু সর্ব বর্ণের মধ্যে জলচল, আহাৰাদি, সমুদ্রযাত্রা এবং বালিকা বিধবা বিবাহাদি কি চলিতে পারে না ? বোঝার উপর শাকের আঁটিটা কি উঠিতে পারে না, বহিতে পারেন না ? মহা মহা পাপ যে ক্ষেত্রে অনায়াসে হজম করিতে পারেন সে ক্ষেত্রে কি এই সব সামান্য অপরাধ হজম করিয়া লইতে পারিবেন না ? অর্থের কুহকে ভোগবাসনার মোহে পাপ ইঞ্জিয় সেবায় যদি ধর্মশাস্ত্র পদদণ্ডিত হইতে পারে তবে দেশের কল্যাণের জন্তু জাতীয় উন্নতির জন্তু হিন্দুজাতিকে মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্তু কি এক আধটুকু শাস্ত্রবিরুদ্ধ কাজ করা যাইতে পারে না ? অবশ্য পারা যাইবে—অগন শাস্ত্রাদেশ বন্ধোপসাগরে ডুবাইয়া দিয়া আমাদিগকে উত্তিত হইতে হইবে । বাংলাদেশে ছোঁয়াছোঁয়ীর ব্যাপারের বড়ই বাড়াবাড়ি । অমুকে অমুকের হাতে খাইয়াছে ত উহার জাতি গিয়াছে । কায়স্থ সন্তান কি একটা সৎগোপ সন্তান যদি গুণে প্রকৃত ব্রাহ্মণও হয়—এবং ব্রাহ্মণ সন্তান যদি তদভাবে চণ্ডাল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয় এবং যদি সেই ব্রাহ্মণের ছেলে ঐ কায়স্থ বা সৎগোপের অন্ত আশ্রয় করেন তবেই ব্রাহ্মণ পুঙ্গবের জাতি নষ্ট হইল । আজকালকার সমাজের কর্তারা তাহার উপর খড়্গহস্ত ও তাহাকে সমাজ-চ্যুত করিতে উদ্যত । কিন্তু গুণবিদ্যাহীন, ব্যভিচারী চণ্ডাল অপেক্ষাও হীন ব্রাহ্মণের হস্তে থাইতে কাহারও আপত্তি নাই । এই ত হিন্দুসমাজের অবস্থা । বস্তুতঃ পাপরোগগ্রস্ত চরিত্রহীন অধাৰ্ম্মিক ভ্রামসভাবাপন্ন জাতির প্রস্তুত অন্ন সত্যব্রত ধাৰ্ম্মিক সৎগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জাতির গ্রাহ্য নহে, তাহাতে স্বাস্থ্য শারীরিক ও মানসিক শক্তি নষ্ট হয় । কিন্তু নাগে মাত্র ব্রাহ্মণ এমন চরিত্রহীন কুৎসিত কদাচারী ব্যক্তির অন্নগ্রহণ করিতে বর্তমান সময়ে শাস্ত্র কোনই বাধা প্রদান করিতেছে না । শাস্ত্র বাধা না দিলেও যুক্তি উহা সর্বথা পরিহারযোগ্য বলিয়া নির্দেশ করে । আহারীয় সামগ্রী প্রিয়, প্রাণতৃপ্তিকর,

হৃদা, পরিস্কৃত এবং স্বাস্থ্যের অনুকূল হওয়ার প্রয়োজন, তাহা না হইলে ব্রাহ্মণতনয়া বা ব্রাহ্মণতনয়ের পাকেও শরীরের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না, মনের পুষ্টি জন্মিবে না বরং আরও স্বাস্থ্যহানি হইবে। ঘৃণিত ব্যাধিগ্রস্ত বা পাপী ব্যক্তির স্পর্শে খাদ্যদ্রব্যে অসংগুণবর্জক বৈদ্যাতিক শক্তি সম্ভার হইতে পারে। নামে ব্রাহ্মণ ও কর্মে চণ্ডাল এমন এক ব্যক্তি অন্য স্পর্শ কবিলে ক্ষতি নাই, আর নামে ক্ষত্রিয় বা শূদ্র, কামস্ব বা গোপ, গুণে ব্রাহ্মণ এমন ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্ত্র অগ্রাহ্য, ইহা শাস্ত্রের আদেশ কিছুতেই হইতে পারে না। ইহা হিন্দু সমাজের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ-ক্রিয়া মাত্র। আর্য্য শাস্ত্রকারগণ অধৌক্তিক প্রথার প্রস্তর দিবেন ইহা কখনই মনে করিতে পারি না। ইহা পরবর্তী যুগের ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্য স্থাপনের অন্তর চেষ্টার ফলমাত্র। যাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুপথ্য, এমন খাদ্য সচ্চরিত্র ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত হইলে তাহা অবশ্য গ্রহণযোগ্য। বংশ গৌরব সেইখানেই গ্রাহ্য যেখানে বংশধর পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষের বংশোচিত গুণসম্পন্ন। নতুবা যুক্তিবৃদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে ইচ্ছা করিলে গুণেরই সম্মান ও আদর করিতে হইবে। বংশ গৌরবে সে যতই বড় ও গৌরাববিত হউক না কেন, যাহাকে দেখিলে তাহার হাতের খাদ্য গ্রহণ করিতে অপ্রবৃত্তি অনিচ্ছা বা ঘৃণার উদ্বেগ হয় তাহার প্রদত্ত বা প্রস্তুত খাদ্য চিকিৎসা-শাস্ত্রমতে স্বাস্থ্যহানিই নহে তাহাতে ধর্মহানিও কবিবে। যুক্তিসিদ্ধ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ত্যাগ করিয়া অপর মতে খাদ্য নির্বাচন করিলে তাহা যে মরণ কানন হইবে তাহাতে সন্দেহ কি ? বৈদিক যুগে খাদ্যগ্রহণ বিষয়ে যে একপ আঁটাআঁটী নিয়ম ছিল না তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

বর্তমান সময়ে আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি যে, • এমন শত শত ব্রাহ্মণ আছেন যাহারা মুখে একরূপ মনে অন্য রকম। গোপনে তাঁহারা

যথা ইচ্ছা ভাবে চলিয়া থাকেন—সমাজ তাহা দেখে না, দেখিলেও কিছু বলে না । আমি এমন অনেক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেখিয়াছি, যাহারা প্রকাশে নিম্নজাতীয়া রক্ষিতা নারী রাখিয়াছেন । কেহ বা লজ্জা ও সঙ্কোচের মাথা খাইয়া নিজ বাড়ীতেই পৃথক ঘর করিয়া দিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে আবার অনেকে বেষ্ঠাসক্ত মদ্যপায়ী । শ্রীক্ষেত্র নিমন্ত্রণেব দধি ক্ষীর বাতাসা সন্দেশ চিনি প্রভৃতি কোন কোন দিন বা সম্পূর্ণই প্রণয়িনীর ঘবে উঠে, কোন দিন বা উহার অর্দ্ধভাগ পরিমাণ স্বীয় গৃহে আইসে । গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—“তেমন কিছু ছিল না তবে জলখাবার ও খাবার জন্ত যাহা কিছু প্রদত্ত হইয়াছিল ভোজনান্তে উহাই বন্ধ করিয়া তুলিয়া থোকা খুকিদের জন্ত আনিয়াছি ।” এই সমস্ত ব্রাহ্মণের কাহাবও পেয়া গুরুগিরি, কাহারও যাজনিক, কাহারও বা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত । যাজনিকগণকে পদ্মাপূজা কালীপূজা দুর্গাপূজাদি করাইতে এবং মেঘাদি উৎসর্গ ও বলি দিতে হয় স্তূতরাং তাঁহাদের অধিকাংশ শক্তিগত্বের উপাসক । মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুন পঞ্চমকার-সাধনে তাঁহাবাই অনেকেই তৎপর । গুরু ঠাকুর পরম বৈষ্ণব, শিষ্যগিরি ব্যবসা, মাঝে মাঝে ভাগবৎ পাঠ করেন—সুখে ধর্ম কথার বিরাম নাই, মোটা মালা গলায়, হাতে হরিনামের মালা, সর্বদা তিলক চন্দনের হবিনাগাঙ্কিত ছাপ, শিষ্য ও শিষ্যাগণকে মধুব রস ব্যাখ্যা করিয়া শুভান—পদকীর্তনে ঘন ঘন মুচ্ছা-যান । অথচ অন্তরে পাপ পরিপূর্ণ, ছাগ-প্রবৃত্তি, ভয়ঙ্কর ব্যভিচারী । নিজে নিম্নজাতীয়া রমণী বা কোথাও শিষ্যা লইয়া ব্যভিচারে প্রবৃত্ত—পাপ সমুদ্রে নিমজ্জিত, গোমনে অম্পর্শীয়া পাপিষ্ঠার প্রস্তুত খাদ্য ভক্ষণে অভ্যস্ত, নারকী লীলার অভিনেতা অথচ বাহিরে তিনিই—অমুকে ত্রিরাত্রি অশৌচের স্থানে দুই রাত্রি অশৌচ স্পালন করিয়াছে বলিয়া তাহাকে সমাজচ্যুত করিতেছেন, অমুকের মৃত শিশু পুত্রকে পুতিয়া ফেলার পরিবর্তে দাহ করিয়াছে জন্ত

দাহকারীগণকে দণ্ডাই করিয়া চাঙ্গায়ণ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেছেন। শুনিয়াছি অমুকে যবনের সংস্পর্শ করিয়াছে, শুনিয়াছি অমুকে যবনার গ্রহণ করিয়াছে, শুনিয়াছি অমুকের পিতার অমুক সাম্বৎসরিক সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ বাদ গিয়াছে, স্মৃতরাং এই সব অহিন্দু ব্যবহারে ও গুরুতর অপরাধে আমি ইহাদিগকে সমাজচ্যুত করিলাম। অমুকে দেশের কল্যাণের নিমিত্ত বিদ্যাচর্চার জন্ত সমুদ্রপথে বিদেশে গিয়াছে—তা যাউক, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রনিষিদ্ধ, অমুককে সমাজচ্যুত করা গেল। গ্রামের সকলে বলিতেছে, অমুক মাঝি হিন্দুর অথাদ্য ঘেড়ে মাছ খাইয়াছে স্মৃতরাং সে পতিত হইল—৮।১০ টাকা ব্যয় করিয়া যদি প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে তবে উহাকে তোলা যাইতে পারে, ইত্যাদি। একজন লোক মারা গেল—স্বজাতীয়গণ শবদাহ করিয়া আসিল, ইতিমধ্যে একজন শত্রু প্রতিবাসী আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে সংবাদ দিল—ঐ মৃত ব্যক্তির পায়ে এক থানা খারাপ যা ছিল। আর যাইবে কোথায়, অমনি শববাহক, দাহকারী কাষ্ঠবহনকারী প্রত্যেকের এক একখানি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। মৃত ব্যক্তির পুত্রেরা দরিদ্র, শ্রাদ্ধই হয় না—তার উপর আবার এতগুলি লোকের প্রায়শ্চিত্তের ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। কেবল কি এইখানেই শেষ, এইরূপ শত শত বিবরণ লেখা যাইতে পারে।

—ব্যারাম পীড়া নাই, হিন্দু গৃহস্থ সন্ধ্যাবেলা গোয়ালে গরু তুলিয়াছেন, পরদিন প্রভাতে দেখা গেল গরু মরিয়া আছে। আর কি, ব্যবস্থাপক পণ্ডিতের অর্থাগমের দ্বার উন্মুক্ত হইল, বান্ বান্ করিয়া পাতির টাকা পড়িয়া গেল। এমনও জানি ৪।৫ বৎসরের শিশু, নবনীত-কোমল হাত দিয়া সন্ধ্যাবেলা ক্ষুদ্র মূর্তিকা খণ্ড লইয়া এদিক ওদিক লক্ষ্যশূন্য মনে টিল ছুড়িতেছে, ঘটনাক্রমে উহার একখণ্ড নিকটবর্তী একটা বৎসের গাত্র স্পর্শ করিল কিন্তু উহাতে বৎসের কি হইবে? যথাকালে গৃহস্থ অচ্যাত্ত গরুর সহিত বৎসটীকেও

ঘরে তুলিল । পরদিন দেখা গেল, বৎসটি মৃতাবস্থায় মাটিতে পড়িয়া আছে । পাড়ার সোর গোল পড়িয়া গেল—বৈকাল বেলা ছেলেকে টিল ছুড়িতে কে নাকি দেখিয়াছিল, কথা ক্রমশঃই ছড়াইয়া পড়িল ও অবশেষে পণ্ডিত ঠাকুরের কাণে এই কথা গেল । আর কথা কি, অমনি একজন লোক পাঠাইয়া ছেলের পিতাকে ডাকিয়া আনিয়া বলা হইল, তোমার ছেলেই গো-হত্যাকারী । সে শিশু স্মৃতরাং তোমাকে এজন্ত প্রায়শ্চিত্তাই হইতে হইতেছে । আর কত লিখিব, আপনাদের এই সব পণ্ডিত ও সমাজ-পতিগণের ব্যবহারের কথা লিখিতে বসিলে একখানা স্বতন্ত্র দীর্ঘ পুস্তক হইয়া পড়ে । হায় ! বঙ্গের সমাজপতিগণ ! আপনারাই আবার পণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রাহ্মণ, বিধি-ব্যবস্থা-দাতা ! “নিজের বেলা লীলা খেলা, দোষ লিখেছেন শূদ্রের বেলা,”—আপনারা নিজেরা নরক সমুদ্রে হাবু ডুবু খাইতেছেন, কিন্তু শূদ্রদের মস্তকের উপর যত বিধি-ব্যবস্থা শাস্ত্র-তন্ত্রের গুরুভার চাপাইয়া উহাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে কুণ্ঠিত নহেন, উহাদিগকে মাথা তুলিবার সুযোগ দিতেছেন না, হাঁপ ছাড়িবার অবসর দিতেছেন না । কপটতার এই সব মহা মহা পাপের জন্ত আজ তাকাইয়া দেখুন—ব্রাহ্মণ জাতির কি শোচনীয় পরিণাম । ঋষির বংশধর আজ গাড়োয়ান মুটে মজুর (উত্তরপশ্চিম প্রদেশে প্রচুর দেখা যায়) দারোয়ান—আদালতের পেয়াদা । এক মুষ্টি অনের জন্য কাঙ্গাল বেশে ঘারে ঘারে ঘূর্ণ্যমান । এ দৃশ্য—এই শোচনীয় অবস্থা দেখিবার নহে, লিখিয়া বুঝাইবার নহে ।

আপনারা ভিতরে ভিতরে যা তা পাপের অভিনয় করিতেছেন আর মুখ দু'ছয়া বাহিরে আসিয়া সমাজের শীর্ষস্থান সমাজপতির পবিত্র আসনে উপবেশনপূর্বক শূদ্রদের দণ্ডমুণ্ড বিধান করিতেছেন । বাহিরে কতকগুলি সামাজিক রীতিনীতি যথাযথ পালন করিতেছেন, কিন্তু হায় ! জানেন নাকি বাহিরের রীতিনীতিই ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অটুট রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে।

এমন দেখিতে পাওয়া যায় যে কায়স্থ গোপ তত্ত্ববায় বৈদ্য প্রভৃতি বন্ধু-
দিগের সহিত আপন গৃহে বসিয়া অনেক ব্রাহ্মণ সম্ভান একই পাত্রে আহার
করিতেছেন । রেলপথে গাড়ীর মধ্যে লুচি তরকারি পক্কান মিঠাই মোড়া
প্রভৃতি কিনিয়া স্বচ্ছন্দে আহার করিতেছেন ; পাশেই লাগালাগি ভাবে
শুঙ্গ ও মুসলমান আরোহী উপবিষ্ট । আহার হইয়া গেল—পানিপাঁড়ে কে
ডাকিয়া ঘটিতে জল লইলেন, পান করিলেন, হাত মুখ ধুইয়া কন্মালে মুখ-
খানি মুছিয়া দিয়া মশলার তাম্বুল একটী মুখে ফেলিয়া দিয়া চুরুট পানে
প্রবৃত্ত হইলেন এবং গম্ভীয়া ষ্টেশনে নামিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ সাজিয়া যথাস্থানে
চলিয়া গেলেন । ইহাতে তাঁহার জাতিও গেল না, নিন্দাও হইল না, শাস্ত্রও
বাধা দিল না । ষ্টিমারে গেলেই দেখা যায়—সমাজপতি জমিদার বাবুগণ
প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাগরাতে মুসলমান বাবুর্জিকে ডাকিয়া
খাবার কিনিয়া স্বচ্ছন্দে খাইতেছেন । বলবান্ ও ধনবান্ বলিয়া স্বত্তি ও
সংহিতা এ জায়গায় নীরব । ষ্টিমারের কেবলীগণের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু
সম্ভান, বেতন ত পনর, কুড়ি, পঁচিশ টাকা পরিমাণ । তাঁহাদের ত মুসলমান
বাবুর্জি ভিন্ন গতিই নাই । অথচ ইহাদের মধ্যে কয়জন লোক সমাজচ্যুত
হইতেছেন ? সমাজচ্যুত হওয়া ত দূরের কথা, ইহারাই বাটীতে আসিয়া
অন্যকে সমাজচ্যুত করিতেছেন । সভা সমিতিতে হিন্দুধর্মের মাত্ত্বিক
—আহারের ও স্পর্শদোষের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেছেন । ইহাদের অভি-
ভাবকগণ শাস্ত্রের বচন দ্বারা উহা সমর্থন করিতেছেন । কেহ যদি এক সঙ্গে
আহারের কথা উল্লেখ করেন ত নাসিকা কুণ্ঠিত করিয়া তাঁহার প্রতি
তীব্র ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন । এ সব কপোতকম্বিত ঈশ্বরী
গল্প নহে—সদা দৃষ্ট ঘটনা এবং এইরূপ ঘটনা দিবারাত্র অসংখ্য অসংখ্য
সংঘটিত হইতেছে ।

বর্তমান সময়ে যুবকগণের মধ্যে নবজীবনবাদের সহিত জাতিগত পার্থক্য

ভুলিয়া গিলিয়া মিশিয়া এক হইবার একটা ইচ্ছা কোন কোন স্থলে যেন দেখিতে পাওয়া যায় । সে ইচ্ছা বাহিরে প্রকাশ করিবার কাহারও সাহস হয় না । সমাজ তাহা বুঝিতে পারিতেছে কিন্তু কিছু বলিতে পারিতেছে না । সমাজের এমনিই অধঃপতন হইয়াছে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি বাহ্যিক সামাজিক রীতিনীতি মানিয়া চলিবে—ততক্ষণ তুমি গোপনভাবে যাহা কিছু কর না কেন, তাহাতে তোমার কিছুই হইবে না । রায় বাহাদুর লাল বৈজনাথ এই সব লক্ষ্য করিয়াই এইরূপ লিখিয়াছেন :—

“As it now stands, you can defy caste by eating, drinking, worshipping or occupying yourself in any manner you choose, so long as you outwardly observe your caste-rules. A Brahman, a Kshatriya or a Vaisya may take the most prohibited food or associate with women outside his caste without being outcasted, if he only outwardly observes his caste-rules.”

(Fusion of Sub-castes in India).

বর্তমানকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জন্য যে সকল ভিন্ন ভিন্ন অনুশাসন শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় উহা যথার্থভাবে পালন করিবার শক্তি এখন কাহারও নাই । রাজা ভিন্নধর্মী বলস্বী, বিশেষকরু—
কাল-ধর্মেরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । আমরা কেহই আর সে বিধি ব্যবস্থা পালন করিয়া চলিতে পারিতেছি না । আমরা কেবল মুখেই শাস্ত্রের দোহাই দিতেছি কিন্তু ভিতরে ভিতরে শাস্ত্রকে বিলক্ষণই অবমাননা করিতেছি । এইরূপ ক্রমাগত করাতে আমরা ধীরে ধীরে ক্রমেই কপটাচারী হইয়া পড়িয়াছি । মন মুখ এক করাই ধর্ম এবং এই ধর্মই সমুদয় কল্যাণের আশ্রয়রূপ । “মুখে এক মনে আর” করাতে আমরা সত্য হইতেও ভ্রষ্ট

হইয়াছি । এই সত্য ও ধর্ম্য হইতে পরিত্রষ্ট হইয়া আমরা রাসাতলে যাইতে বসিয়াছি, অবনতির চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি । যেখানে আমি আমার নিজ ইচ্ছামত সত্যের অপলাপ করিতেছি সেখানেও অণ্ডের কিছু বলিবার অধিকার নাই । কেননা বাহ্যিক নিয়ম রক্ষার কোনই ক্রটি পরিলক্ষিত হইতেছে না । এখন এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে একটা অত্যাধিকার্য্য করিবার পূর্বে আমরা মনে করি “না হয় প্রায়শ্চিত্ত করিব” । প্রায়শ্চিত্তেই সব শেষ হইয়া যায়, এ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক । এই ধারণা দ্বারাই অনুমান করা যায় যে শাস্ত্রোক্ত বিধি নিয়মের উপর আমাদের আদৌ আস্থা নাই । তবে লোকাচার ও সমাজের ভয়ে প্রকাশ্যভাবে সে কথা বলিতে পারিতেছি না । আমি যাহা করি—তুমি তাহা জান, এবং তুমি যাহা কর আমি তাহা জানি, এবং আমাদের উভয়ের কথা সমাজেরও সকলে জানে । আমার কথাও তুমি বল না—তোমার কথাও আমি বলি না এবং আমাদের উভয়ের কথা সমাজ জানিলেও কিছু বলে না । চোরে চোরে গাস্তৃত্ব তাই সাজিয়া আমরা পরস্পরের দোষ পরস্পরে ঢাকিয়া লইয়াছি । এইরূপ ভাবে দীর্ঘকালগত আমাদের ব্যষ্টির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ও পাপ তিল তিল করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিশাল পর্ব্বতাকার ধারণকরতঃ হিন্দুসমাজরূপ বিরাট সমষ্টির উপর চাপিয়া পড়িয়াছে । সে চাপনে সমাজ-শরীর বিকল অচল অবশ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সোজাভাবে উঠিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই, নড়ন চড়নের শক্তি নাই,—সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে ।

এই কথায় কথায় প্রায়শ্চিত্ত করা সম্বন্ধে মাননীয় এন্, জি, চন্দ্র-ভারকর মহোদয় মাস্তাজে সমাজ-সংস্কার সমিতির চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

“I have heard many say—‘I shall violate a caste-rule and then take *Prayaschitta*’. I do not think that

those of us who are sincerely anxious for the welfare and progress of Hindu society—who think that morality is a greater cementing bond of society than anything else—ought to be practised to a theory which teaches men that they have a license to sin freely, for every time they sin they can do penance and pass for sinless men. And a *Prayaschitta* has already become licentious, so to say, for many a sin and many a flagrant departure from the path of Virtue.”

এই ত প্রায়শ্চিত্তের অবস্থা। আবার সেই প্রায়শ্চিত্তেরই বা কত রকমারি ভাব। দোষী ব্যক্তি যদি মস্তক মুগুন করে, পূর্বদিন নির্জলা উপবাসী থাকে ত কথিত কয়েক কাহন দণ্ডাই হইবে। আর যদি সে একটু বাবুগোছের হয় ও মস্তক মুগুন করিতে অস্বীকৃত হয় তবে তাহাকে নির্দিষ্ট কয়েক কাহনের দ্বিগুণ ব্যয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এবং দোষী ব্যক্তি যদি আরও উচ্চতর ধনাত্ম্য ব্যক্তি হয়, তবে তাহাকে নির্দিষ্ট কাহনের চতুগুণ কাহন ব্যয় করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু চতুগুণ কাহন ব্যয় করার জন্য তাহাকে আর মাথা মুগুন করিতেও হইবে না—উপবাসীও থাকিতে হইবে না। তার পরিবর্তে তার একজন প্রতিনিধি কর্মচারীকে উপবাসী থাকিতে হইবে এবং মস্তক মুগুন করিতে হইবে অর্থাৎ টাকার উপরই প্রায়শ্চিত্তের লঘুত্ব ও গুরুত্ব নির্ভর করিয়া থাকে।

কিন্তু ইহাই কি সত্য? টাকা কি কখন পাপ হইতে মুক্তিদান করিতে সমর্থ? এরূপ হইলে ত রাজা মহারাজা ও জমিদারগণই সর্বাপেক্ষা নিষ্পাপ! গ্রামকুন্টার রামচৌধুরী যেন জমিদার, গরুর মাথায় আঘাত করিয়া একটা গোহত্যা করিয়াছেন, তাহার প্রচুর টাকা। রামকুন্টার দে তাহার একজন

বেতনভোগী সামান্য কর্মচারী । ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয় ব্যবস্থা করিলেন—
 এই সম্ভ্রান্ত গোহত্যারূপ মহাপাপের জন্য চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে ও
 উহাতে ২৫ টাকা আদায় ব্যয় করিতে হইবে এবং ইহাতে শ্রামকুমার
 বাবুকে ২৫ টাকা ব্যয়, মাথা মুণ্ডন করিতে এবং উপবাসী থাকিতে
 হইবে ! শ্রামকুমার বাবু বড়লোক—জমিদার, তিনি কি মাথা মুণ্ডন
 করিতে পারেন ? লোকে দেখিয়া বলিবে কি ? আর উপবাস ! তাঁর কি
 আর উপবাস করিবার শক্তি আছে ? যে অন্নপিত্তের পীড়া, সকালে স্নান
 করিয়া চারিটা আহার না করিলেই অন্ন উঠে । কাজেই স্থির হইল কর্মচারী
 শ্রামকুমারই মাথা মুণ্ডন করিবে এবং উপবাসী থাকিবে তবে সেজন্য বাবুর
 কিছু বেশী টাকা (১০০) ব্যয় করিতে হইবে । ২৫ দণ্ড কিন্তু মাথা
 মুণ্ডন না করার জন্য দ্বিগুণ দণ্ড ৫০ লাগিল, এবং উপবাস না করার
 জন্য চতুর্গুণ দণ্ড অর্থাৎ মোট ১০০ লাগিল । নির্দিষ্ট দিনে শ্রামকুমার
 উপবাসী রহিল, ক্ষৌরকার আসিয়া মাথা মুণ্ডন করিয়া দিয়া গেল—পুরোহিত
 ঠাকুর মহাশয় প্রায়শ্চিত্ত করাইতে আসিলেন । ওদিকে বাবু সকালে
 চারিটা আহার করিয়া দিব্য ছুফফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া সুখে
 নিজের কোলে গা ঢালিয়া দিলেন । অপরাধ করিল একজন, মাথা মুণ্ডন
 ও উপবাস করিয়া মরিল আর একজন—এবং ইহাতেই বাবু গোহত্যা
 জনিত মহাপাতক হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন ! বলিহারি হিন্দুসমাজের
 এবম্বিধ ব্যবস্থা দান করাকে ? এ দেখিতেছি “আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ
 পশুতি সঃ পণ্ডিতঃ” এর মত অদ্ভুত ঘটনা । একটা ছোট শিশুকে গুরু
 মহাশয় বলিয়াছিলেন সর্ব প্রাণীকে যে আপনার মত দেখে সেই পণ্ডিত ।
 ‘য মাস ত্রীপঞ্চমীর দিন পিতা বলিলেন, “থোকা যাও স্নান ক’রে এস,
 রত্নতীর পদে অঞ্জলি দিতে হবে” । থোকা পুকুরের ঘাটে স্নান করিতে
 গেল, মাঘ মাস দারুণ শীত, জল যেন বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে ;

অদূরে ঐ খোকাদের বাটীর একটা বাগ্দি বালক ঢাকর কি করিতেছিল, ঐ বাগ্দি বালককে দেখা মাত্র খোকার গুরুমহাশয়ের শ্লোক মনে পড়িয়া গেল,—তখন তাড়াতাড়ি যাইয়া সে তাহাকে টানিয়া আনিয়া পুকুরে চুবাইয়া হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া দেবী-মণ্ডপের দ্বারের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া পুরোহিত ঠাকুর মহাশয়কে ডাকিয়া বলিল—‘ইহারই হাতে ফুল বেগপাতা দিন এবং মল্ল পড়ান—এ অঞ্জলি দিলেই আমার অঞ্জলি দেওয়া হইবে, পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় আমাদের সেদিন উপদেশ দিয়েছিলেন ‘আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশুতি সঃ পণ্ডিতঃ’ ।

বাল্লার প্রায়শ্চিত্ত সমস্তাও কি বন্ধিমবাবুর এই রহস্যময় গল্পের দ্বারা কোতুকজনক ও হাস্যোদ্দীপক নহে? তবে এই যে ব্যাপার ইহার মূলে স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছু নাই । কোনরূপে একটা প্রায়শ্চিত্তের যোগাড় করিতে পারিলেই ব্রাহ্মণগণের বেশ ছুপয়সা লাভ আছে । তাঁহা মূল্যের সমান অর্থ ব্যবস্থাদাতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পুরোহিত এবং অগ্রদানী পৃথক পৃথক ভাবে প্রাপ্ত হইবেন । অর্থাৎ কথিত পরিমাণ তাহদের মূল্য ১৮ হইলে পণ্ডিত, পুরোহিত ও অগ্রদানী প্রত্যেকে ৬ পাইবেন । কাজেই যত টাকা বাড়িবে এ তিনজনের ততই সুবিধা । এই জন্তই শূদ্রের উপর প্রায়শ্চিত্ত দানের এত বোঁক ও আগ্রহ । হায় স্বার্থপর সমাজপতিগণ ! নিরক্ষর সরলপ্রাণ শূদ্রগণের পরিশ্রমলব্ধ অর্থ কি এমনি করিয়া ধর্মের নামে—শাস্ত্রের নামে শোষণ করিতে হয় ?

সমাজপতিগণ ! আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি জাতীয় অর্ণবপোতের তলদেশে যে সব বড় বড় ছিদ্র রহিয়াছে উহা বন্ধ না করিয়া আপনারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র লইয়া অত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন,—না, সাহসে কুলায় না বুঝি? খুঁটি নাটি লইয়া ব্যস্ত ; কিন্তু বড় বড় দোষগুলি চোখে দেখিতে পান না । রাজ রাজরা হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদার

তালুকদার এবং উকীলের মুছরী ও সামান্য কস্মচারী পর্যন্ত কয়েকজন
 আপনাদের বয়ুনন্দন মানিয়া চলেন ? জানেন না কি শতকরা কতজন
 লোক মদ্যপায়ী ব্যাভচারী । চিকিৎসক ও সুরাবিক্রেতা ও মাংসবিক্রেতা
 কসাইর ন্যায় পাপভাগী, তারপর যাহা বা প্রকাশ্য ভাবে অর্থ নইয়া
 মিথ্যা মাফ্য দান করেন, স্ত্রী নইয়া টাকা ধাও দেন, বাহারী রক্ষিতা
 রমণী রাখেন ইহাদের সম্বন্ধে কি বলিতে চাহেন । ব্রাহ্মণগণের ত মেচ্ছ (?)
 রাজ্যে বাস করার কথা নাই, শূদ্রের দান গ্রহণ করার বিধি নাই; দাসত্ব
 করা ত ব্রাহ্মণের পক্ষে সম্পূর্ণ অবৈধ । দেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অস্তিত্ব
 যে স্বীকার করিতে চাহেন না, জিজ্ঞাসা করি ক্ষত্রিয় বৈশ্য ভিন্ন ব্রাহ্মণের
 চলিবার উপায় কি ? এই সব ক্ষরতর, পাতক সম্বন্ধে ত কৈ একটি কথাও
 বলিতে পাই না । এই সব অপবাদের জন্য কৈ কাহাকেও ত কোনদিন
 প্রায়শ্চিত্ত করাইতে এবং প্রায়শ্চিত্ত করিতে দেখিলাম না । কলিকাতা
 মহানগরীতে এমন শত শত হিন্দু আছেন, বাহারী প্রতিদিন ইংরাজদিগের
 হোটেলে হিন্দুর অস্পর্শীয় অভ্যাস খাদ্যদ্রব্য সকল আহরণ করিতেছেন ।
 অগতঃ সমাজে তাহাতে উচ্চবাচ্য নাই, শুধু তাহাই নহে - ইহাই আবার
 অনেক স্থলে সমাদ্রপতি ও দলপতি বলিয়া পরিচিত । শুধু কি ইহাই,
 আমরা প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছি, ভ্রমুক সাহেব বাড়ীতে
 ভ্রমুক তারিখে বিরাট ভোজ ইহঁরা গেল, উহাতে সমাজের কত গণ্যমান্য
 ব্যক্তি আনন্দেব সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, বিনাতি খানায় যুবকটি
 সম্পাদন করিয়াছেন; ইত্যাদি ইত্যাদি । ইহাদের বানিতে নিয়মিত
 ভাবে ক্রিয়া কাণ্ড নির্বাহ হইতেছে, নিয়মিত ভাবে ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যগণ
 আসিতেছেন, থাইতেছেন, বিদায় গ্রহণেছেন, একটুই উচ্চবাচ্য নাই ।
 ইহাদের কি জাতি যাইতে পারে না ? না, সেখানে রৌদ্রায়ুজের চাকটিকা
 অধিক । আর শাসনই বা করিবে কে, ব্রাহ্মণ পাণ্ডিত্যগণ ত বিঘ্নরক্ষক

নগেন্দ্র দত্তের শ্রায় রাজা মহারাজা ও জমিদারগণের হস্তের ক্রীড়ণক মাত্র ।
তঁাহাদের প্রদত্ত বৃত্তি বিদায় প্রভৃতিই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের জীবিকার প্রধান
উপায় । হায় হিন্দু সমাজ ! হায় রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত !!

সমাজ শরীরের বড় বড় ব্যাধির দিকে আপনাদের আদৌ দৃষ্টি নাই,
দৃষ্টি শুধু তুচ্ছাতুচ্ছ বিষয়ে । প্রথমতঃ ‘Oil your own machine’
নিজের চরকায় তৈল দিন, পরে অন্যের ভাবনা ভাবিবেন । পূর্বে নিজেদের
ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কার করুন, তারপর অন্যান্য সমাজের উপর আধিপত্য
করিতে অগ্রসর হইবেন । শাস্ত্রের কঠিন বিধি কি শুধু নিরীহ শূদ্রদের জন্ত ?
নিজেদের জন্ত নহে ? নিজেরা শাস্ত্র মানিবেন না, ব্যবস্থা মানিবেন না কিন্তু
অন্যকে মানাইবার জন্ত জোর জবরদস্তি করিবেন । এ যে দুর্বলের প্রতি
অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নহে । কিন্তু অত্যাচারিগণ, আপনারা কি জানেন
না অত্যাচারীর অত্যাচার দমনের জন্ত উপরে একজন আছেন । তাঁহাকে
ফাঁকি দিবার উপায় নাই । সহস্র বৎসরের মহা শিক্ষাতেও কি এ জ্ঞান
হয় নাই ? আপনাদের অত্যাচারী পূর্বপুরুষগণের মহাপাপের ফলই যে
আপনাদের বর্তমান হীনাবস্থার কারণ তাহা কি আজও উপলব্ধি করিতে
পারেন নাই ?

“সৰ্ব্ব শাস্ত্রে পুরাণেষু ব্যাসস্ত বচনং ঐবৎ ।

পরোপকারস্ত পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্” ॥

এইটী তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন । পাপ বিনা সাজা মিলে কি ?
আপনারা কি বলিতে চাহেন হিন্দুরা চিরকালই ধার্মিক—চিরকালই ন্যায়-
পথবর্তী, কিন্তু ভগবান্ অত্যাচারকে তঁাহাদিগকে এই কঠোর অবস্থার মধ্যে
ফেলিয়া ছুঃখ দিতেছেন ? তাঁহার ন্যায়-তৌলদও সম্বন্ধে অন্যায় দোষারোপ
করিবেন না । যতদিন হিন্দুজাতির মধ্যে ন্যায়, সত্যপরায়ণতা, ধর্ম, দয়া
প্রভৃতি গুণ ছিল, যতদিন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের মধ্যে পরস্পর গম্ভীর

শ্রীতি প্রণয় ছিল, যতদিন চারি শ্রেণীর মধ্যে অঞ্চল ভ্রাতৃত্বাব অক্ষুণ্ণ ছিল—
যতদিন প্রাণী মাত্রকে হিন্দুগণ নিজ স্বরূপের প্রতিবিম্ব স্বরূপ অবলোকন
করিতেন—ততদিন হিন্দুর সিংহাসন জগতের সর্বোপরি স্থানে সমাসীন
ছিল—কিন্তু তার পর—আহা! তার পর যখন ন্যায় তুল্যদণ্ডের অসত্যের দিক
কিঞ্চিৎ হেলিয়া পড়িল—অমনি ন্যায়ের প্রতিমূর্তি ভগবান্ ভারতবর্ষকে ছঃখ
শোক ও পরাধীনতার ঘনাবর্তে ফেলিয়া দিলেন ।

হৃদয়হীন ব্রাহ্মণ মন্ত্রাগণের কুমন্ত্রণাবলে যখন স্বার্থপর পশুবলদৃগু
স্নেহমমতাহীন হিন্দুরাজগণ অত্যাচারে নিরীহ প্রজাকুলকে জর্জরিত ও ক্ষত
বিক্ষত করিয়া তুলিল, অমনি শ্রীভগবানের ন্যায়ের সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল,
অত্যাচারের মধ্য হইতে ভগবানের বরাভয় হস্ত উত্তোলিত হইল, ভগবান্
মুসলমানের হাত ধরিয়া ভারত-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ; ব্রাহ্মণের গর্ব
পূর্বেই ধ্বংস হইয়াছিল এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের গর্ব যাহা কিছু ছিল, সেটুকুও চূর্ণ
বিচূর্ণ হইয়া গেল । এইরূপে ভারতবর্ষে মুসলমান প্রতিষ্ঠা লাভ করিল ।
ইহাই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম । ভগবান্ অনেক সহ্য করেন, কিন্তু
প্রকৃতিপুঞ্জের অত্যাচার যখন নিতান্ত দুর্ভিক্ষসহ হইয়া উঠে, যখন মানবপুঞ্জ
কেবল কোথায় ভগবান্, কোথায় ভগবান্ বলিয়া কাতর ক্রন্দনে গগনমণ্ডল
প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলে, তখন আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন না, অমনি
মাইভেঃ বাণীতে ভূগণ্ডল কাঁপাইয়া তিনি স্বয়ং মর্ত্যভূমে অবতীর্ণ হন ।
অত্যাচারীগণের হৃদয়-রক্তে ধরাতল অভিষিক্ত, প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয় গগনে
আবার শান্তির বিমল চন্দ্রমা উদ্ভিত এবং ধরা আবার সুশীতল হয় ।

ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই অবগত আছেন যে, সামাজিক অত্যাচার যখন
নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে এবং সেই ভীষণ অত্যাচারে নিরীহ নরনারীর প্রাণ
যখন পিষিয়া যাইবার উপক্রম হয় তখন সেই দারুণ অবস্থার মধ্য হইতেই
উহার প্রতিকার পথ বাহির হইয়া পড়ে । শেষে পদদলিত নিপীড়িত

জনগণের প্রতিহিংসা বহি দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠে এবং ঘোরতর সামাজিক বিপ্লব উপস্থাপিত হয়। এইরূপ সময়ে প্রায়শঃই দেখা যায় এক একজন অসীম প্রতিভাশালী মহাত্মার আবির্ভাব হয়। লক্ষ লক্ষ লোকে যে বিরলে নয়নজল বর্ষণ করিতেছিল, তাহা ইহারা দর্শন করেন, সহস্র সহস্র মানব হৃদয়ে যে ক্রোধবহি ধূমায়মান হইতেছিল তাহা ইহাদের হৃদয়ে ভয়ানক দাবাঘির আকার ধারণ করে, শত শত অন্তঃকরণে যে কামনা জাগিতেছিল তাহা ইহাদের প্রাণে পুঞ্জীভূত হয়। ইহারা নিপীড়িত পদদলিত বুদ্ধিক্রান্ত নিগৃহীত প্রকৃতিপূজের নেতৃস্বরূপ হইয়া সিংহ গর্জনে জগৎকে কম্পিত করিয়া আবিভূত করেন, জগতের সমুদয় শক্তিপুঞ্জকে অগ্রাহ্য করিয়া সত্য ও ন্যায়ের বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া দেন এবং বজ্রদৃঢ় করে অত্যাচারীর পাপ-সিংহাসন এক আছাড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেন। ইহারা মানবকুলে বীর সদৃশ। রোমীয় পোপদিগের অত্যাচার ও নির্যাতন হইতে প্রজাবৃন্দকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইউরোপের বীরবর মার্টিন লুথারের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ফরাসী বিদ্রোহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা এইরূপই দেখিতে পাই। ধনশালীগণের অত্যাচার যখন নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল; এক পক্ষে ফ্রান্সের দীন দরিদ্র প্রকৃতিপুঞ্জ সাগাণ্ড এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালারিত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, অপর পক্ষে ধনীগণ নিজেদের অট্টালিকায় বিলাসিনী প্রণয়িনী-গণের সহিত আমোদ আহ্লাদে মত্ত রহিয়াছেন, এক পক্ষে প্রজাকুল ক্ষুধার্ত কুকুরের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও অনশন যন্ত্রণায় পথে ঘাটে ছট্‌ফট্ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, অপর পক্ষে ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত ধনিগণ তাহাদের দুঃখ দৈন্যের প্রতি বিন্দুগাত্রও সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া বরং অবজ্ঞা-হৃচক ভাষায় দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেছেন। এই ভীষণ বৈষম্য ভাব, এই ঘোর দুঃখ দুর্দশা, এই ভয়ানক সামাজিক

অত্যাচার যখন নিতান্ত ছুর্কিসহ হইয়া উঠিল তখন আকাশ-মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধরিত্রী বিকম্পিত হইয়া ভগবদ্বাণী প্রচারিত হইল “অভ্যুত্থান কর, অভ্যুত্থান কর” । ঠিক এইরূপ ভাবে পরবর্তী আর্য্য সমাজে স্বাধীনামধেয় ব্রাহ্মণগণের প্রবল প্রতাপে নিম্নজাতি সকল যখন নির্য্যাতিত হইতে লাগিল, রাজাদের শক্তি পর্য্যন্ত যখন নামমাত্র অবশেষ রহিল, আধ্যাত্মিকাদি সর্বপ্রকার দাসত্বে যখন সাধারণ প্রজাবৃন্দের মনুষ্যত্ব গতপ্রায় হইল, অধিকাংশ প্রকৃতিপূজা যখন পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইল—তখন ঈশ্বর বজ্রনাদে আদেশ করিলেন “উত্থান কর” ; অমনি রাজপুত্র প্রেমাবতার শাক্যসিংহ সত্যের বিমল উজ্জ্বল আলোক হস্তে ধারণ করিয়া ভারতের ঘনাকার মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন । কে আসিল বলিয়া ভারতময় ছলছুল পড়িয়া গেল । সিদ্ধার্থ একদিকে রাজৈশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিলেন, অন্য দিকে ব্রাহ্মণগণের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার উপর খড়্গাঘাত করিলেন । তিনি সকলকে প্রেমের আহ্বানে ডাকিয়া বলিলেন, “হে পদদলিত নিপীড়িত জাতি সকল, আগার নিকট আগমন কর । আমি তোমাদিগকে আলিঙ্গন দান করিতেছি । আগার ধর্ম্ম আকাশের ন্যায় বিস্তৃত, ইহার নিম্নদেশে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পুরুষ রমণী, ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ সকলে সমভাবে বাস করিবে” । এই মহাবাণী সর্বত্র ঘোষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল । সহস্র সহস্র বৎসরের গুরুভার যেন মস্তক হইতে খসিয়া পড়িল । প্রজাবৃন্দের দক্ষ মরুতুল্য হতাশ প্রাণে আশার অমৃতধারা সিঞ্চিত হইল । মহাপ্রাণ লুথারের অভ্যুদয়ে ইউরোপে যেমন চারিদিকে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, বুদ্ধের অগমনে ভারতবর্ষেও সেই দশা ঘটিল । বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণগণের প্রভুত্বের প্রতিবাদ করিয়া প্রতিবাদের পস্থা খুলিয়া দিলেন । সেই হইতে ভারতবর্ষের সর্বত্র স্বাধীন চিন্তার প্রবল বহা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল এবং ঐ সঙ্গে ভারত

সমাজ বহুবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িল। তার পর বৌদ্ধধর্মের প্রচারের দিবস হইতে নিম্নজাতীয় লোকদিগের উন্নতির স্বচনা আরম্ভ হইল। দলে দলে নিম্নশ্রেণীর লোক সকল মহাগতি বুদ্ধের শরণাপন্ন হইতে লাগিল। ক্রমে শ্রমণ শব্দ ব্রাহ্মণ শব্দের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। এই স্থানে জাতিভেদের মূলে প্রথম আঘাত পড়িল।

জাতিভেদের উপর দ্বিতীয় আঘাত করিলেন মুসলমান রাজারা। ইঁহারা জাতিভেদ ও পুতুল পূজার অত্যন্ত বিদেষী ছিলেন। ইঁহারা বলিলেন— ‘আমরা ব্রাহ্মণ শূদ্র বুঝি না, যে আমাদের কার্য্য করিবে আমরা তাহাকেই পুরস্কৃত করিব। ব্রাহ্মণগণ বংশমর্য্যাদায় গর্বিত হইয়া এই সব যবন রাজাদিগের অনেক তফাতে রহিলেন, ওদিকে দলে দলে কায়স্থ ও বৈদ্যাগণ এবং নিম্নজাতীয় হিন্দুসন্তানগণ অগ্রসর হইয়া রাজসরকারে প্রবিষ্ট হইতে ও কাজ কর্ম্মের সুবিধার জন্য মুসলমান বাদসাহগণের ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাতে এই হইল যে মুসলমান সহবাসে আসিয়া, তাঁহাদের রাজনীতি চাল চলন দেখিয়া শুনিয়া এবং মুসলমানি সাহিত্যাদি পাঠ করিয়া, অনবরত পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধ কথা শুনিয়া শুনিয়া এই সকল হিন্দু কর্ম্মচারীগণের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা অনেকটা কমিয়া গেল, ব্রাহ্মণের জাতির হৃদয় হইতে “ব্রাহ্মণে দেবতা জ্ঞান” ভাব অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। কেবল ইহাই নহে, মুসলমান আগমনের পর কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণের জাতিগণের হস্তে প্রচুর ধন সঞ্চয় হইতে লাগিল। ইঁহারা মুসলমান বাদসাহগণের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া জমিদারী লাভ করিতে লাগিলেন। একদিকে এই সমস্ত শূদ্রগণের পদমর্য্যাদা, ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব বর্দ্ধিত হওয়ায় তাঁহারা সমাজের সর্ব্ব সর্ব্বা হইতে লাগিলেন, অপর দিকে পারশু ভাষার বহুল প্রচার ও শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় এবং হিন্দুরাজগণের প্রতাপ খর্ব্ব হওয়ায় সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চাভাবে

ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণগণ মূর্থ ও শাস্ত্রজ্ঞানহীন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ অর্থ সম্পদে সাধারণতই দরিদ্র, সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ বিদ্যাবুদ্ধি-বিহীন হইয়া ব্রাহ্মণের জাতীয় কায়স্থ বৈদ্য শূদ্র বৈশ্য প্রভৃতি ধনিগণের বিদ্যাপ্রার্থী ও ভাগ্যোপজীবী হইতে বাধ্য হইলেন। কাজেই তখন তাঁহারা সাধারণকে পরিতুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

“The Brahmins lost the patronage of enlightened Hindu kings, and became more dependent than ever for their living on the gifts of the lower castes they had now to please the mob more than ever.”

(*Hindu Civilisation under British Rule.*)

ইহার কিছু পূর্ব হইতেই আস্তে আস্তে হিন্দুদিগের শাস্ত্রসমূহ অত্যন্ত জটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে বিদ্যাচর্চা এবং শাস্ত্রালোচনার অমনোযোগী হইতে লাগিলেন। কেবল শাস্ত্র কথিত কতিপয় ক্রিয়াকর্মবিধিই তাঁহাদের শিক্ষণীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় হইতেই অনেক ব্রাহ্মণ উপনিষদাদি বেদের জ্ঞান কাণ্ড এবং দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় জলাঞ্জলি দিয়া রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের স্মৃতিই একমাত্র জীবিকোপযোগী করিয়া লইলেন।

এইরূপে হে বঙ্গের সমাজপতি ব্রাহ্মণগণ! আপনাদের দশা মলিন হইয়া আসিল। আপনাদের পূর্বপুরুষগণ শূদ্রগণকে যে ঘৃণা করিয়া বেদবিদ্যার অধিকারলাভে বঞ্চিত করিয়াছিলেন—ইহা তাহারই বিষময় ফল। মানুষ হইয়া মানুষকে যদি অমন করিয়া ঘৃণা না করিতেন, তবে কি এই ভারতবর্ষ মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত হইত? দেশের বার আনাই বৈশ্য শূদ্র, তাহাদিগকে সর্বপ্রকার বিদ্যাদানে বঞ্চিত রাখাই ত এ অনর্থ সৃষ্টির একমাত্র মূল। যদি আপনাদের পূর্বপুরুষগণ ইহাদিগকে নানা বিষয়ে

শিক্ষাদান করিতেন—ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতেন ও কনিষ্ঠ সহোদরের
 ছায় তাহাদিগকে ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন, যদি তাহাদের স্মৃতি হৃৎথে
 সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে বৈদেশিক আক্রমণের সময়
 তাহারা (বৈশ্য শূদ্রেরা) কি কখন দূরে নিশ্চেষ্টমনে দাঁড়াইয়া থাকিত ?
 তাহারা কি ক্ষত্রিয় ভাইদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে বুকের রক্ত দিতে পরাভূত
 হইত ? তাহারা কি নিশ্চল নিথর নিষ্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিদেশীর
 দাসত্বপাশ গলে তুলিয়া লইত ? তাই বলিতেছিলাম, আপনাদের দোষেই
 ভারতের যা কিছু সর্বনাশ সব সাধিত হইয়াছে ।

ভগবান্ বুদ্ধ আসিয়া পথভ্রান্ত তোমরা, তোমাদিগকে পথ দেখাইয়া
 দিয়া গেলেন, অমানিশার অন্ধকার অপসারিত করিয়া দিয়া চাঁদের
 জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত করিয়া দিলেন । “কিন্তু উল্টা সমঝিলি রাম” ; তাহার
 অন্তর্দ্বানের পরেই তোমরা কোথায় তাঁর পথানুসরণ করিয়া চলিবে, তাহা
 না করিয়া কি না আরও প্রচার করিতে লাগিলে—ও পাষণ্ড নাস্তিক
 ধর্ম্মধ্বংসী, বেদ লুপ্ত করিতে উহার উৎপত্তি—উহার কথা হিন্দুগণের
 শোনা উচিত নয় ।” তখন ভ্রান্ত হিন্দুরাজগণের হৃদয়ে অগ্নি ভগ্নে এই
 বিষ প্রবেশ করিতে লাগিল । বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির সময় ব্রাহ্মগণ
 মূর্খ হিন্দুরাজার সহায়তায় দেশের সর্বত্র পুনরায় বৈদিক, পৌরাণিক ও
 তান্ত্রিক কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত যাগ যজ্ঞাদি চালাইতে আরম্ভ করিলেন ।
 কাজেই দেখিতে দেখিতে কতিপয় বৎসরের মধ্যেই বিদ্যাহীন বৈশ্য
 শূদ্রগণ আবার বর্তমান হিন্দুধর্ম্মের বেড়াজালের মধ্যে আসিয়া আবদ্ধ
 হইয়া পড়িল । আবার দেশে নানা প্রকার পীড়ন ও অত্যাচার আরম্ভ
 হইল । মুসলমানের আগমনে এই অত্যাচারের অনেকটা দমন হইলেও
 সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইয়াছিল না । ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের ভীষণ বৈষম্যানলে ভারত
 যখন আবার দগ্ধ হইতে লাগিল, যখন নীচজাতি সকল কুকুর শৃগালের

ত্ৰায় আবার ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে বিতাড়িত হইতে লাগিল, যখন ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতি সকল নীচজাতিগণকে নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতে লাগিল ; আবার যখন সমাজের কঠিন শাসনে সমাজবন্ধন কেবল যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠিল ; যখন গুহ তার্কিকতায় স্নেহ প্রেম ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইল, তখনই অগ্নি ঘৃণা বিদ্বেষেব তিমিরাবরণ অপসারিত করিয়া—পরম প্রেমাবতার চৈতন্যচন্দ্র শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন । তিনি মানবকুলের সুখ শান্তি পরিবর্দ্ধনার্থ স্বীয় পারিবারিক সুখ বিসর্জন করিলেন । দক্ষ দক্ষ অনাথ অনাথিনীর নয়ন জল মুছাইবার জন্ত প্রিয়তমা পত্নী বিকুপ্রিয়াকে শোক-সিন্ধুতে ডালাইলেন, বিশ্বপ্রেমে জগৎ মাতাইবার জন্ত মাতৃসুখা ধারা পরিত্যাগ করিলেন । গোরাঙ্গের প্রেম সংকীৰ্ত্তনে বঙ্গভূমি উথলিয়া উঠিল, ভারতবর্ষ প্রাবৃত হইল, জগৎ মুগ্ধ হইল । নিদাঘের সূর্য্যরশ্মি-সস্তপ্ত মৃত্তিকায় যেন বারি-বর্ষণ হইল । সেই আছবানে সেই সংকীৰ্ত্তনে হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ, ধনী দরিদ্র একই সাম্যক্ষেত্রে আসিয়া একই পতাকা তলে দণ্ডায়মান হইল । খোল করতালের মধুর বঙ্কারে ভারতবর্ষ আলোড়িত হইয়া উঠিল । গৃহে গৃহে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে সঙ্কীৰ্ত্তন হইতে লাগিল—“আমরা সব এক পিতার সন্তান—এক ভগবানের দাস, আমরা সব ভাই ভাই, আমরা সব ভাই বোন ।” মহা সাম্যভাবের মহা বন্যার ভারতবর্ষ ভাসিয়া গেল । ইহাই ভেদ বৈষম্যে তৃতীয় আঘাত ।

যাহাদিগের এক একজনের উৎপত্তিতে সমাগরা ধরিত্রী কৃতার্থ এবং ধন্য হইয়াছে সেই বুদ্ধ সেই শঙ্কর সেই রামানুজ সেই চৈতন্য একে একে আসিয়া তোমাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক উন্নতির দিব্যপথ দেখাইয়া দিয়া গেলেন, কিন্তু তাহাতেও তোমাদের চক্ষুর অন্ধতা দূর হইল না,

নয়ন উন্মোচিত হইল না । হইবেই বা কেন, বিধাতা তোমাদের অদৃষ্টে যে অনেক দুঃখ লিখিয়াছেন, কার সাধ্য বিধাতার লিপি খণ্ডন করে ?

কিন্তু আর অধিক বিলম্ব নাই । ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তোমাদের শেখ প্রভুত্বটুকু নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার জ্বাল সমধিক দীপ্তিমান বোধ হইলেও উহার মরণ কাল উপস্থিত ! শত চেষ্টা করিলেও আর উহাকে তোমরা সজীব রাখিতে পারিতেছ না । বুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত তোমাদের প্রভুত্বের উপর ক্রমাগত যেরূপ আঘাতের উপর আঘাত পড়িতেছে তাহাতে মনে হয় ইহার মরণের আর অধিক বিলম্ব নাই । সামান্য আঘাত নহে,—পূর্ববর্তী সংস্কারকগণের পবেও, মহাত্মা রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি আধুনিক সংস্কারকগণ ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বের উপর যেরূপ গভীর ও গুরুতর আঘাত দিয়াছেন, (চতুর্থ আঘাত) তাহাতে আমরা উহার মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুতেই সন্দ্বিগ্ধচিত্ত হইতে পারিতেছি না । ইহা ভিন্ন স্বামী দয়ানন্দ প্রবর্তিত পঞ্জাবের আর্য্যসমাজ, ত্রীপ্টিয় গিণনারী-সমাজ, থিয়সফি-সম্প্রদায়, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতির প্রচারকগণ ইহার উপর দিবারাত্র আঘাত করিতেছেন । বাপ, আর কত সহ্য হইবে । একেই ত ব্রাহ্মণ্যশক্তি হিন্দুরাজার সহায়তা বিনা আজ সহস্র বৎসর অনাহারে অনাদরে জীর্ণা শীর্ণা, তাহাতে আবাব হিন্দু ক্ষত্রিয়-শক্তি ও বৈশ্য-শক্তি কর্তৃক পরিপুষ্টিতা-বিরহিত । কাজেই এই সমস্ত স্মৃতীত্র আঘাত গড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র জ্বাল অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া পড়িয়াছে ।

৫ম আঘাত । ইহার উপর ইংরাজ গবর্ণমেন্ট জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জন্ত শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন । বিদ্যাদানে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বিচার নাই । চির পদ নিষ্পেষিত জাতি সকল নানা ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদিতে বিশেষতঃ ইংরাজী ভাষায় লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে মানুষের মনুষ্যত্ব ও মহত্বের বিবরণ পাঠ করিতেছে । পুস্তকে নানাদেশের নানা জাতির

স্বাধীনতাব সংগ্রাম, মানবজাতির সর্বদেশস্থ সামাজিক ইতিবৃত্ত, পৃথিবীর শৈশব ও পরবর্তী অবস্থা, নানা জাতির সভ্যতার বিবরণাদি পাঠ করিয়া তাহাদের অন্তঃকরণে এক নব ভাব নব আশা জন্মিয়াছে। তাহারা কত রাজ্যের উত্থান পতনের ইতিহাস পাঠ করিয়া পূর্বপুরুষগণের ভ্রমপ্রমাদ বুঝিতে শিখিতেছে। তাহারা শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইয়া সামাজিক জীবনেব এক নূতন রাজ্য স্থাপনেব আশা মনে মনে পোষণ করিতেছে। ছুতার, গোয়াল, সুবর্ণবণিক, মাঝি, সাহা, কৈবর্ত, নমঃশূদ্র, বারুই, তিলি, মালি, কামার, কুমারগণ, বিদ্যালয়ে নিজ নিজ সন্তানগণকে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলের সন্তান একসঙ্গে খেলা করিতেছে ও পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইতেছে। উচ্চশ্রেণীর কথা ছাড়িয়া দিই। তারপর শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া এই সব লাঞ্ছিত নিম্নশ্রেণীর সন্তানগণ কেহ জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী, সবজজ, মুনসেফ, হাইকোর্টের উকীল, ব্যাবিষ্টাব, বড় বড় ডাক্তার, মোক্তার, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, সংবাদ পত্রের সম্পাদক, লেখক, বাগী প্রভৃতি হইতেছেন এবং আপন আপন সমাজেব মধ্যে আপনাদের বিদ্যা ও জ্ঞান বিতরণ করিয়া দিতেছেন। ইহাদের বাটীতে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি উচ্চবর্ণীয়গণ বিদ্যা অভাবে অদৃষ্টক্রমে বেতনভোগী পরিচারকরূপে পরিচর্যায় নিযুক্ত হইতেছে।

ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণীয়গণকে এইরূপ নিম্নতর কার্যে ব্যাপ্ত ও হীনাবস্থায় দেখিয়া দেখিয়া শূদ্রসন্তানগণের মন হইতে ব্রাহ্মণের প্রতি দেবভাব বহুল পরিমাণে দিন দিন অপসৃত হইতেছে। এখন ব্রাহ্মণকে দেখিবাগাত্র তাহারা আব পূর্বের ছায় ভূমিষ্ট হইয়া প্রশংসা কবে না। ইহাতেও ব্রাহ্মণপ্রাধান্ত দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।

৬ষ্ঠ আঘাত। তারপর পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞানের চর্চা দেশে যতই প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে, ততই লোকের হৃদয় হইতে সঙ্কীর্ণতা দূরে পলায়ন

করিতেছে । দেশে যতই জ্ঞান বিদ্যার আলোচনা, শিল্প বিজ্ঞানের চর্চা, ইতিহাস পাঠের আগ্রহ, প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের প্রবৃত্তি, বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে—ততই প্রাচীন কুসংস্কারগুলি আশু আশু মন হইতে অপসারিত হইতেছে । ভগবান্ একজনকে ব্রাহ্মণ, একজনকে শূদ্র করিয়াছেন, এখন একথা একজন বার বৎসরের বালকও বিশ্বাস কবে না ।

৭ম অঘাত । আর এক কারণে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য নষ্ট হইতেছে । সেটী মুদ্রাবন্ধের প্রচার । মুদ্রাযন্ত্র হওয়ায় সমুদয় প্রাচীন শাস্ত্র মুদ্রিত হইয়া স্বল্পমূল্যে দেশের সর্বসাধারণের হস্তে পড়িবার সুযোগ হইয়াছে । শূদ্রগণ এখন অবলীলাক্রমে বেদ বেদান্তের মর্ম্মার্থ পুরাণ সংহিতার দৌড় ভালরূপই বিদিত হইতে পারিতেছে । যে শাস্ত্ররূপ তীক্ষ্ণ শাণিতাস্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণগণ এতকাল শূদ্রগণকে ভয় দেখাইয়া শাসনে রাখিয়াছেন, এবং তাহাদের উপর প্রভুত্ব খাটাইয়াছেন, এক্ষণে উহা ঐ হীনজাতীয় শূদ্রগণের হাতে আসিয়াছে এবং তাহারা সে অস্ত্র কিদূশ ধারাল বিলক্ষণই বুদ্ধিতে পারিতেছে । প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছিলেন—শূদ্রের বেদাধিকার নাই । এখন দেখিতেছি শূদ্র ত দূরের কথা, শ্লেচ্ছগণ (!) বেদের উদ্ধারকর্তা, বেদ সংগ্রহকার—বেদ প্রকাশক ।

এই সমুদয় কাবণে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছে । সাধারণ শিক্ষা বিস্তৃতিই ইহার তলে ঘুণ হইয়া লাগিয়াছে । স্মরণ্য ইহার আর বিনষ্ট হইবার অধিক বিলম্ব নাই । শূদ্রগণ মাথা তুলিবার অবসর পাইয়াছে । এই কালস্রোতকে ফিরাইবার শক্তি কাহারও নাই, বৃথা উদ্যম ত্যাগ করুন । পূর্বে নিম্নজাতীয় কেহ ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার চেষ্টা করিলে, যত অধিবর্ণ করিয়া মুখে ঢালিয়া দিয়া সেই শূদ্রকে বিনষ্ট করা হইত । আর এখন শূদ্র অধ্যাপকগণ ব্রাহ্মণ সন্তানগণকে

ধর্মোপদেশ দান করিতেছেন—ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণসন্তানগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন ।

বঙ্গীয় সমাজপতিগণ ! বড়ই দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আপনারা সময়ের অপ্রতিহত স্রোত আদৌ বুঝিতে পারিতেছেন না । কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণাশ্রম বিভাগ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মনুষ্যকুলের প্রকৃতি,—তাহাদের শক্তি সামর্থ্য, শারীরিক গঠন প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ের পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । আপনারা নিজেদের মধ্যেই না কত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইতেছে ! পূর্বে ব্রাহ্মণগণ যাজ্ঞন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা, যোগ তপস্বী, ধ্যান ধারণা, বেদ বেদান্ত চর্চা প্রভৃতি সাংঘিক ক্রিয়াকলাপে সময় অতিবাহিত করিতেন । এখন তাঁহাদের বংশধর আপনারা কি করিতেছেন ভাবিয়া দেখুন দেখি ? ব্রাহ্মণনির্দিষ্ট কার্য্যকলাপের কোন একটাও ঠিকভাবে পালন করিবার শক্তি এখন আপনারা নাই । বর্তমান সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণের সংখ্যা প্রায় সাক্ষি এক কোটি, ইহাদের মধ্যে কয়জন শাস্ত্রনির্দিষ্ট নিয়মে জীবন অতিবাহিত করেন ? উত্তরপশ্চিম প্রদেশে শতকরা ২০।২৫ জন ব্রাহ্মণ সন্তান ধর্মচর্চা ও পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন, অবশিষ্টগণ পৌরোহিত্য বা অধ্যয়ন অধ্যাপনা কিছুই করেন না । তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ বা দোকান, কেহ বা ছদ্মবিক্রেতা, পাঁচক রাখাল, গাড়োয়ান মুটে জলবাহক গায়ক বাদক নর্তক এবং কেহ বা কুস্তিগীর । উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ সহস্র কার্য্য সম্পাদন দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকেন । বাংলা দেশেও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই । তাহার কিঞ্চিৎ অভাস পূর্বে দিয়াছি ।

শ্রীযুক্ত লালু বৈজনাথও এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিতেছেন :—

“In fact there is no trade in which a Brahman will

not now engage and the statistics of crime of the sea-ports show that there is no crime which he will not commit. What a fall for those, who profess to act as mediators between man and god."

(Fusion of Sub-castes in India)

শুধু কি ব্রাহ্মণদিগের অবস্থাই এইরূপ হীন হইয়াছে ? তাহা নহে, কালপ্রবাহে ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরও এইরূপ হীনদশা উপস্থিত । ক্ষত্রিয়গণের বিষয় পর্যালোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই—পূর্বে যাহারা আপন আপন ভূজবলে বীর্য্য ও পরাক্রমে দেশ রক্ষা করিতেন, অগণ্য প্রকৃতিপুঞ্জ শাসন করিতেন, যাহারা মণিমাণিক্যমণ্ডিত মুকুট ধারণ করিয়া রাজছত্রশোভিত চারুচামরসেবিত স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিতেন, এখন তাহাদের কি হীনাবস্থা । সে যুদ্ধ নাই, সে যুদ্ধক্ষেত্র নাই, সে সাহস সে শক্তি সে অগ্নিবিসর্জন কিছুই নাই । এখন তাহাদের অধিকাংশ কৃষিজীবী । পূর্ব্বকাল সে উন্নত চরিত্র বিলুপ্ত হইয়াছে—এখন অনেকেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ, হীনমতি এবং অলস । সেই ক্ষত্রিয় জাতির কঙ্কালবশিষ্ট স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ যে এক কোটি রাজপুত এখন ভারতে অধিবসতি করিতেছে তাহাদিগের নৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে । বল্লময়গণই বাঙ্গলার বালমাল ক্ষত্রিয় ; কি ছিল আর কি হইয়াছে । লাল বৈজনাথ ক্ষত্রিয়দের সম্বন্ধেও এইরূপ লিখিতেছেন :—

"Now a days they chiefly concern themselves with agriculture or engage in petty quarrels, or pass their time in indolence on debauchery or take to menial occupations".

(Fusion of Sub-castes in India)

তুমি আমি রাম শ্রাম এই ২৪ জন লইয়া সমাজ নহে, দশজনের সমষ্টিই সমাজ । কালের পরিবর্তনে যেমন বহির্জগতের পরিবর্তন হয়— তেমনই সমাজেরও পরিবর্তন সাধিত হয় । কাল সমাজের অধীন নহে বরং সমাজকেই কালের অনুবর্তী হইয়া চলিতে হয় । এইজন্য এক সময়ের রীতিনীতি আচার ব্যবহার আইন কানুন বিধি ব্যবস্থা অন্য সময়ের উপযোগী হয় না,—হইতেও পারে না । সেই স্মরণাতীত সত্যযুগের বৃক্ষ তৃক পরিহিত অরণ্যাচারী পর্বত গুহাবাসী মৃগমাংসভোজী প্রাচীন আৰ্য্যগণের কথা একবার কল্পনা করুন আর আপনাদের নিজেদের দিকে চাহিয়া দেখুন । কি পরিবর্তন ! আকাশ পাতাল প্রভেদ ! এখন ভাবিয়া দেখুন যদি কেহ আপনাকে সেই বেশে সেইরূপ খাদ্য ও পানীয় দিয়া সেইরূপ ভূষায় সজ্জিত করিয়া বর্তমানকালের কোন সভ্য জাতির মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে, তাহা হইলে কি আপনি লজ্জায় সঙ্কোচে মরিয়া যাইবার উপক্রম হন না ?

সময়ের পরিবর্তনে সমাজের অবস্থাও পরিবর্তিত হইয়াছে—আর সমাজের পরিবর্তনে আপনার আমার এবং আমাদের সকলেই অবস্থা, মতিগতি আকাজক্ষা কামনা চালচলন প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে ।

সত্য যুগের সেই পুণ্য দিনে, সেই সরল শান্ত অকপট সত্যবাদী শুদ্ধচিত্ত হিংসা ঘৃণা অজ্ঞাত ধীর ধর্মপরায়ণ বেদ অধ্যয়নশীল মুনীযোবৃন্দের সময়ে যে নিয়মে যে ভাবে সমাজ চলিত, রাজ্য চলিত, জনপদ শাসিত হইত, এখন আর সে নিয়মে চলিতে পারে না । এখন নীবার ধাত্তোরু ষষ্ঠাংশ লইয়াই রাজা অব্যাহতি দেন না, অনায়াদপ্রাপ্য ফলমূলে গিরিনিশ্চন্দিনী স্রোতস্বিনীর শীতল স্নিগ্ধ সুস্বাদু সলিলে বৃক্ষ বন্ধলে এখন আমাদের আর চলে না । অভাব বোধ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে । প্রাচ্য প্রাশ্চ্য

নানাবিধ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে সহবাসে আমাদের এই পরিবর্তন। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত জীবন সংগ্রাম দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর হইতেছে। সুতরাং বর্তমান সময়ে শাস্ত্রসম্মত বিধি ব্যবস্থার মধ্যে থাকিয়া তদনুমোদিত জীবিকোপযোগী ব্যবসার বিচার সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া চলা প্রত্যেকের পক্ষেই অসম্ভব! মনুসংহিতা মানিয়া চলিয়া পেটের দুই মুষ্টি ভরের সংস্থান করা একালে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শাস্ত্র মানিয়া চলিলে এখন চলে কই? তাই ব্যবস্থাদাতা সমাজ নিরোমণি মহা মহা পণ্ডিতগণও পেটের দায়ে মনু ও রঘুনন্দনের ব্যবস্থা অগ্রাহ্য করিয়া স্কুল কলেজে বেতনভোগী অধ্যাপক নিযুক্ত হইরাছেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—ব্রাহ্মণের পক্ষে চাকরি করার বিধি কোন্ সংহিতার কোন্ পৃষ্ঠায় লেখা আছে? আর কোন্ ঋষিই বা শূদ্র প্রতিগ্রাহী ছিলেন? নিজেদের দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়া বিধিব্যবস্থার কঠোর প্রাণঘাতী বন্ধন শিথিল করিয়া দিন। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক দাসত্ব হইতে সর্বসাধারণকে অব্যাহিত দান করুন। “* * * * চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতাই জীবন, উন্নতি এবং সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের একমাত্র সহায়। যেখানে তাহা নাই সেই জাতির পতন অবশ্যস্তাবী। * * * যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বা বর্ণ বা জাতি বা সম্প্রদায় অপর কোন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও কার্যে বাধা দেয় তাহাই পৈশাচিক ভাবাপন্ন এবং পতন অবশ্যস্তাবী” (১)। “স্বাধীনতা না দিলে কোনরূপ উন্নতিই সম্ভবপর নহে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাহাতেই আমাদের এই অপূর্ব ধর্ম দাঁড়াইয়াছে কিন্তু তাহারা সমাজের পায়ে অতি গুরু শৃঙ্খল পরাইলেন। আমাদের সমাজ, ছুঁচার কথায় বলিতে গেলে, ভয়াবহ পৈশাচিকতাপূর্ণ। পাশ্চাত্য দেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ

করিয়াছে—তাহাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ । আবার অপরদিকে তাহাদের ধর্ম ক্রমপ, তাহার দিকেও দৃষ্টিপাত করিও ।” * * * “ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নবনাবীত অধিক যথার্থ ধার্মিক লোক নাই, ইহা মানিতেই হইবে । এই মুষ্টিমেয় উন্নতিব জন্ত ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে এবং না থাইয়া মরিতে হইবে ?” * * * “পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার এক বিন্দুও যাহাতে না থাকে তাহা করিতে হইবে । * * * আমাদের নির্বোধ যুবকগণ ইংরাজগণের নিকট হইতে ক্ষমতা লাভের জন্ত সভা সমিতি করিয়া থাকে—তাহারা হাশ্র করে । যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোন মতেই স্বাধীনতাব উপযুক্ত নয় । * * * দাসেবা শক্তি চায়, অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্ত । তাই বলি, এই অবস্থা ধীবে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া । প্রাচীন ধর্ম হইতে এই পুরোহিতের অত্যাচার ও অনাচার ছাটিয়া ফেল—দেখিবে, এই ধর্মই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ! * * * ভারতের ধর্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মত করিতে পার ? আমার বিশ্বাস ইহা কার্যো পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে !” (১) বঙ্গের ও ভারতবর্ষের সমাজপতি পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত হইয়া হিন্দুশাস্ত্ররূপ কামধেনু হইতে যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থারূপ ছন্ধ দোহন করিয়া নূতন ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণয়ন করুন এবং উহা দেশীয় ধনাঢ্য ও রাজহরন্দের অর্থ সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় পুস্তক এবং পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে স্বল্প মূল্যে ও বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া দিন । সামাজিক অত্যাচারের বিষময় ফলে প্রতিদিন শত শত হিন্দুসন্তান, খৃষ্টধর্মী, মুসলমানধর্মী

(১) স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত “পত্রাবলী” প্রথম ভাগ ।

আবিষ্করণ কবিত্তেছে । এইরূপে বোটা বোটা হিন্দুভ্রাতাকে আমবা বিসজ্জন দিয়াছি । কয়েক শত বৎসবে হিন্দু জনসংখ্যা বহুমান্যত শোচনীয় ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে । প্রাচীন ঐতিহাসিক কেরিষ্টাব্দ ৮ত মুসলমান আগমনের পূর্বে হিন্দু জনসংখ্যা ৬০ কোটি ছিল । এই কয়েক শত বৎসবে ৩৮ কোটি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে ! আবও কি আপনাদের হিংসা বিদ্বেষের বহির্নিখা প্রদর্শিত রাখা সম্ভব ? ভ্রাতৃত্বের প্রেমামৃত ধান্য ইহা নির্দোষিত কবিয়া ফেলুন, অনাদৃত ভ্রাতৃগণকে বাহ্যপাশে টানিয়া লউন—২২০০০০ হিন্দুসমাজ বঙ্গপ্রাপ্ত হউক ।

সমাজ দুই প্রকারের লোক দেখা যাইতেছে । এক নিবাসবাদীর দল, আর আশান্বিতের দল । প্রাচীনগণ প্রায়ই প্রথম দলভুক্ত, তরুণগণ দ্বিতীয় দলের অন্তর্গত । নিবাসবাদী অচলাবলন, প্রাচীনগণ বলেন—সমাজ ত দিন দিন বসাতলে যাইতে বসিয়াছে । ১০ টাকা মণ চাউন, ৫০০০ টাকা জোড়া কাপড়, চিনি, গুড়, মণসা, ডাল তরকাবী জতা ছাতি বাসন পত্র সবই অগ্নি-মূল্য । নিত্য ছুর্ভিক্ষ, ম্যালেরিয়া, ইন্ফ্লুয়েন্সা, কালাজ্বর, ক্ষয়—বসন্ত গোণে লক্ষ লক্ষ লোক যমালয়ে যাইতেছে । পূজা অর্চনা, দোল দর্গোৎসব, শ্রাদ্ধ শাস্তি, বিধি ব্যবস্থা লোপ প্রায় ; দেব দ্বিজে গুণক গাণাও ভক্তি নাই, কানী বৃন্দাবন গয়া প্রয়াগ—তীর্থ সাহায্য, গজাগানে শিখাস নাই । জাতির বিচার, খাদ্যাখাদ্য বোধ, লজ্জা সন্মান, ভয় ভক্তি নাই । জাতি স্বাধীনতা ;—মেয়েছেলের দেখাপড়া, বিধবা বিবাহ, সমুদ্রযাত্রা প্রচলিত হইতে চলিয়াছে । আর কি সমাজের কল্যাণ আছে ; যোব কলির সূত্রপাত ; একাকারের আর বিলম্ব নাই ; ইত্যাদি ইত্যাদি । অত্র দলের তরুণগণ বলিতেছে—কবি গত হইয়া সত্য যুগের আবির্ভাব ! দীর্ঘ শতাব্দী বৎসবের দাসত্ব ভোগের পর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পবাসিত্ত্ব নিপীড়িত দাসত্বে অভ্যস্ত নরনারী স্বর্ণশাসি পিপীলিকা আদিরা উঠিয়াছে । ভারতের এক প্রান্ত হইতে

অপর প্রাপ্ত পর্যন্ত আব্রহ্ম পেশোয়া আসিদ্ধি হিমাচল বন্দে মাতবম্ ধ্বনিত্তে
 নিনাদিত ও মুখরিত হইয়া উঠিতেছে । যে রাজভয়, কারাভয় ও মৃত্যুভয়ে
 পরাধীন জাতি সতত ভীত, সম্ভ্রান্ত ও অসহায় থাকে—সেই ত্রিবিধ ভয়
 অগ্রাহ্য করিয়া সহস্র সহস্র দেশভক্ত অস্মান বদনে হাসিমুখে সর্ব প্রকার নিগ্রহ
 বরণ করিয়া লইতেছে । শিশু, বালক ও পুরুষীগণ পর্যন্ত প্রফুল্ল বদনে
 কারাগার বরণ করিয়া লইতেছে । মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দেশভক্ত বীরের শরীরের
 ওজন বন্ধি হইতেছে । প্রাচীন ভারত কেন, পৃথিবীর কোন ইতিহাসে এরূপ
 কথা কেহ কখন পড়িয়াছে কি ? এমন অপূর্ণ কাহিনী কেহ কখন শুনিয়াছে
 কি ? নরকুল মুকুটমণি—ধরিত্রীর শ্রেষ্ঠ রত্ন মহাত্মা গান্ধির বিশ্বপ্রেম বিশ্বে
 এক অভিনব তরঙ্গ—বিপুল কলরব তুলিয়াছে । সমস্তই বিশ্ববাসী নরনারী,
 রাজা প্রজা, জেতা জিত—উচ্চনীচ ভাব তুলিয়া প্রেমের স্বর্ণশৃঙ্খলে পরস্পর
 আবদ্ধ ও মিলিত হইবে । ভারত—জগদ্বাসী নবনারীর তীর্থক্ষেত্র,—ভারতের
 পবিত্র তপোবন বিশ্ববাসীর শান্তি নিকেতন হইবে । ভারত হইতে জাতি-
 বিদ্বেষ সম্প্রদায়-ভেদ—দিন দিন তিরোহিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে প্রেম
 ভালবাসা, শ্রীতি মমতার সঞ্চার হইতেছে । প্রাচীনগণের সর্ব প্রকার
 অভিযোগের কারণ—রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা এবং তাহারই অবশ্রুতাবী ফলস্বরূপ
 নানাপ্রকার কুসংস্কার, আভিজাত্য, নারী নির্যাতন প্রভৃতি ।

যদি শ্রীভগবান্ । উপায় ও দেশভক্তগণের নিগ্রহভোগে, আত্মত্যাগে পুণ্য
 ও সাধনাবলে পরাধীনতা রূপ ব্যাধি দূরীভূত হয়, তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার
 সর্বপ্রকার উপসর্গও ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে । মূল ব্যাধি আরোগ্য হইলে
 তাহার উপসর্গ কতক্ষণ থাকিতে পারিবে ? চারি মহাভাবে ভারত উজ্জীর্ণ—
 নারী ও নিম্নশ্রেণীর প্রতি অবজ্ঞা, অনাদর ও নির্যাতন ; একই ভগবানের
 বিভিন্ন উপাসকগণের মধ্যে মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা ঘৃণা এবং বিভিন্ন
 প্রহরদের মধ্যে প্রাদেশিক অনৈক্য । তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটাই প্রধান,

ভয়াবহ ও মারাত্মক । শ্রীভগবানের রূপায় বাতাস অনুকূলে বহিতেছে । ভারতবর্ষের অসংখ্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া বঙ্গদেশের কথাই বলি—এখানে ৫০ বৎসরের শিক্ষায়, ধবরের কাগজ, সভা, সমিতি, আলোচনা, আন্দোলন, ব্রাহ্ম সমাজের উদ্ভব ও প্রচার ফলে—স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলীতে, সমাজে নব জাগরণ আসিয়াছে । বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক সমাজ—জাতীয় সমিতি স্থাপন ও অনেকে সংবাদপত্র বাহির করিয়া আপন আপন সমাজ-সংস্কারে এবং সকলে সম্মুখ হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে—ইহা অতিশয় শুভ লক্ষণ । ব্রাহ্মগণ—বঙ্গীয় ব্রাহ্ম সভা, বৈদ্যগণ বৈদ্য সম্মিলনী, কায়স্থগণ কায়স্থ সমিতি স্থাপন করিয়াছেন এবং এইকণ ভাবে, তত্ত্বাবগণ কুস্তকারগণ, তিলিগণ, বারুজীবী, গন্ধবণিক, স্তবর্ণ বণিক, কংস বণিক, স্বর্ণকার, মাহিষ্য (চাষী কৈবর্ত ও আদি কৈবর্ত) তাম্বুলি, মোদক, সূত্রধর, পাটনী মাহিষ্য, শঙ্খবণিক, চাষা ধোপা বা সচ্চাষী, কপালী, তেলী (কাম্পিল্য দেশাগত বৈশ্য), সাহা প্রভৃতি জাতিগণ বৈশ্বত্রেব দাবী করিয়া এবং পরিচয় দিয়া সভা সমিতি স্থাপন করিয়াছেন । কায়স্থ, কর্মকার, গোপ, রাজবংশী, বালমাল, পোদ (পোণ্ড্র ক্ষত্রিয়) পুরো, হুদি (হৈহয় ক্ষত্রিয়) কোচ বা শঙ্কর দাস (খশ্ ক্ষত্রিয়) বাগদী (ব্যগ্র ক্ষত্রিয়) গণ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া এবং পরিচয় দিয়া সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । বৈদ্য, যোগী, নাপিত প্রভৃতি জাতিগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া নিজদিগকে পরিচিত করিতেছেন । অবশিষ্ট অনেক জাতি স্পষ্টতঃ উচ্চ জাতিত্বের দাবী না করিলেও সর্ব প্রকার সামাজিক সম্মানজনক অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন করিতেছেন । যুগযুগান্তের পর নির্গোড়িত নর-নারায়ণগণের যোগ-নিজা ভাঙ্গিয়াছে এবং ভাঙিতেছে । সমাজপতি যুটিগেয়ে ১৩ লক্ষ ১৪ হাজার ৪৩০ জন ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণত্বের প্রায় ২ কোটি বঙ্গীয় হিন্দু সম্মানকে মানুষ্য ও উন্নয়ন করিবার জন্য আর বেগ পাইতে হইতেছে না । তাহারাই নিজেরাই নিজেদের পথ পরিষ্কার করিয়া

লইতে উদ্যত ও বজ্রবান্ হইয়াছে । ব্রহ্মই যখন অজ্ঞানতাব আচরণে আবৃত হইয়া জীবনায় ধাবণ করেন, তখন এই সমস্ত জীবন্ত সচন ব্রহ্ম একেবানে নিজেদিগকে ব্রহ্ম না বলিয়া এমন কি ব্রাহ্মণও না বলিয়া ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলিতেছেন—ইহাতে ভাগ্য মনে কবিতো হইবে । চটিয়া জ্ঞানহারা হইবাব কি আছে । আমবা ত মানুষ্য কবিবই না, তাহারা নিজেবাই যদি মানুষ্য হইতে চেষ্টা কবে—সে ত ভান কথা, স্বেপন কথা ।

সমাজপতি পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট আমার কবষোড়ে শেষ নিবেদন, তাঁহাবা কিছুদিন দর্শন পাশ্বেৰ আলোচনা ত্যাগ কবিয়া পানোদেব অতি প্রয়োজনীয় সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন । ঘটক পটভেব বাদানুবাদ, বজ্জুতে সৰ্পভ্রমেব গভীর গবেষণা, প্রকৃতি পুঙ্খমেব সম্বন্ধ নিকপণ, দ্বৈতবাদ বিচাৰ, অদ্বৈতবাদ খণ্ডন, টিকটিকি পতন হইতে আবস্ত করিয়া দৈনন্দিন জীবনেব প্রত্যেক খুঁটীনাটীৰ নূতন বৈজ্ঞানিক যুক্তি পরিতাগ কবিয়া কাজেব কথাৰ আলোচনাৰ প্রবৃত্ত হউন । যে দেশেৰ কোটি কোটি লোক অমশানে ও অর্ধাশনে দিবারাত্র ছটফট্ কবি'তছে, যে দেশেৰ ভূভিক্ষে ম্যাগেরিয়াৰ বনন্তে প্লেগে অজীর্ণ বক্তৃতাশয্যে লক্ষ লক্ষ অধিবাসী প্রতি বৎসৰ মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, যে দেশেৰ কোটি কোটি লোক মূৰ্খতা ও অজ্ঞতাৰ অন্তঃস্পৰ্শ জন্মে ডুবিয়া হাবু ডুবু খাইতেছে, যে দেশে কোটি কোটি খাবিব বংশধর ভ্রাতৃনন্দক ভুলিয়া গিয়া পৰম্পৰেব বক্তৃতা পান কবিতোছে, সে দেশেৰ পক্ষে বড়দর্শনেব আলোচনাৰ সমাতিবাহিত কবা নিতান্তই অশোভনীয় । হে বজ্জেব বড় বড় মাথাওয়ালা সমাজপতিগণ ! আপনাবা আব ও সব অপ্রয়োজনীয় বিষয় লইবা খানেনে কৰিয়েন না । শ্রীমতী বিবেকানন্দ বলিতেন, “ধর্মাকর্ম কি জানিন্, আগে কূর্ম অবতাবেব পূজা চাই—কূর্ম হচেচন এই পেট, এণ্ড পূজা না হ'লে কোন কিছু হয় ন।” বাহ্যিক আপনাদেব ভাইবা দুইটা খাই'ত পান, আগে তাহাবই পূজা

বাহিব করুন । আপনাদেব ষড়দর্শনের আলোচনা—আপনাদেব শাস্ত্রা
পাতঙ্কলের চর্চা, আপনাদেব টীকা টিপ্পনীর অপূর্ণত্বের কথা ত যুগ যুগান্তর
হইতে শুনিয়া আসিতেছি । উহাতে আর নূতনত্ব কি আছে ? উহা কিছু
দিন বন্ধ থাকুক । হিন্দু শাস্ত্র একেই ত সমুদ্রের ত্রায় অসীম অনন্ত,
তাহাতে আবার ভাষ্যকাবগণের সুবিস্তৃত ভাষ্য ও ব্যাখ্যার সম্মিলনে উহা
অসীমত্ব আরও ভীষণতর হইয়া উঠিয়াছে । ভাষ্যে ভাষ্যে তত্ত্ব ভাষ্যে
টীকা টিপ্পনীতে হিন্দুশাস্ত্রসমূহ “বামেব চেয়ে কঞ্চি দড়”ব ত্রায় জটিলতর ও
হাস্তোদ্ধীপক হইয়া উঠিয়াছে । অথচ ঐ ভাষ্যসমূহ সর্বসাধারণকে পাঠ ও
স্পর্শ করিবার অধিকার দিতে আপনাবা নাবাজ । ঐ ভাষ্য পড়িতেছেই
বা কে, আর বুঝিতেছেই বা কে—তদনুসাবে জীবন গঠন করা ত দুবের
কথা । দেশের প্রায় পনের আনা লোকই নিরক্ষর, যে এক আনা অবশিষ্ট
আছে, উহার মধ্যে কয়জন সংস্কৃত জানে—এবং কয়জনেবই বা সংস্কৃত
ভাষ্য বুঝিবার ক্ষমতা আছে ? সুতরাং বাহা পৌনে যোন আনা লোক
বুঝিতে অক্ষম এবং বুঝিলেও তদনুযায়ী জীবন গঠন করিতে প্রায় অসমর্থ,
সেইরূপ সামাজিক অপ্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন
কি ? যাহাতে সমাজেব কল্যাণ হয়, যাহাতে দেশের উপকার হয়, যাহাতে
হিন্দুজাতি পুনরায় বিগতশ্রী দুগ্ধগৌবর লাভ করিতে পারে তৎসম্বন্ধে গ্রন্থ
বচনা করুন, শাস্ত্রীয়যুক্তি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ঐ গ্রন্থ পবিশোভিত করুন,
সর্বসাধারণকে ডাকিয়া ঐ গ্রন্থ তাহাদের হস্তে এবং গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়
মুখে মুখে ঘটটা পারেন বুঝাইয়া দিন । গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে প্রচার
কেন্দ্র—শিক্ষানয় প্রতিষ্ঠা করুন । আধ্যাত্মিক বস্তায় দেশকে ভাসাইয়া
ফেলুন । “প্রথমতঃ বেদে উপনিষদে পুরাণে তন্ত্রে সংহিতায় যে সব সত্য
সিহিত আছে তাহা ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বাহিব করিয়া, ভাবতর্ক্যের বিভিন্ন
মঠ হইতে ধাঘিব আশ্রম হইতে সম্প্রদায় বিশেষের অধিকার হইতে বাহিব

করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া দিন ।” ঐ সকল সত্যের মহা স্রোত হিমালয় হইতে কুমারিকা, পেশোরা হইতে আসাম পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া যাউক । সমগ্র হিন্দুজাতি আচণ্ডাল ঐ সকল শাস্ত্রনিহিত উপদেশ শ্রবণ করুক । আপনাদেরই ভগবান্‌ মনু লিখিয়াছেন :—

তপঃ পরং কৃত যুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে ।

দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহঃ দানমেকং কলৌ যুগে ॥

মনু সংহতা ১ম অধ্যায়, ৮৬ শ্লোক ।

তপস্বাই সত্যযুগের, জ্ঞানচর্চা ত্রেতাযুগের, যাগ যজ্ঞ দ্বাপর যুগের ধর্ম ছিল কিন্তু এই কলি যুগে দানই একমাত্র ধর্ম কর্ম ।” আবার দানের মধ্যে ধর্ম দান আধ্যাত্মিক জ্ঞানদানই সর্বশ্রেষ্ঠ, দ্বিতীয় বিদ্যাদান, তৃতীয় প্রাণদান, চতুর্থ অন্নদান । প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-জ্যোতি দান করিয়া জড়প্রায় হিন্দুজাতির চক্ষুর ধাঁধা ঘুচাইয়া দিন । তারপর ধর্ম-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই লৌকিক এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিদ্যাদানে উঠিয়া পড়িয়া লাগুন । ব্রাহ্মণের জাতিগণকে ধর্ম ও বিদ্যাদানে বঞ্চিত করার দরুণই ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের কারণ । শত শত শতাব্দীর সঞ্চিত কুসংস্কারের স্তূপে জ্ঞানের অগ্নিকণা ধরাইয়া দিন দেখিতে দেখিতে উহা পুড়িয়া ভস্মমাৎ হইয়া যাইবে । আমাদের কৃতযুগের ধ্বংসগণ যে অপূর্ব অধ্যাত্ম-বিদ্যারূপ ধনরাশি সঞ্চিত করিয়াছিলেন—সেইগুলি বাহির করিয়া আচণ্ডালের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিন । যে সর্প দংশন করিয়াছে সেই আবার তাহার বিষ উঠাইয়া লউক । যাহারা সর্বসাধারণকে বিদ্যায় বঞ্চিত করিয়া দেশকে বিষ-জর্জরিত করিয়াছিলেন—তাহারাই, সেই ব্রাহ্মণগণই আবার আচণ্ডালের গৃহে গৃহে যাইয়া বিদ্যা বিতরণ করুন—পূর্ব বিষ উঠাইয়া লউন । বেদ বেদান্তরূপ ধন ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিন, যাহা যত ইচ্ছা লইয়া যাউক । স্মৃতির টোল উঠাইয়া দিয়া বেদান্ত পাঠের টোল

স্থাপন করুন । বেদান্তের অদ্বৈতবাদ শ্রবণে আচণ্ডালের হৃদয় আত্ম
মহিমায় উদ্ভুদ্ধ হইয়া উঠুক—সুপ্ত-ব্রহ্মশক্তি জাগরিত হউক । জাতিবর্ণ
সম্প্রদায় নির্কিংশে—ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সকলের গৃহে সমভাবে প্রচার করুন :—
'হে অমৃতের অধিকারীগণ ! তোমরা পাপতাপ জর্জরিত হীন অপদার্থ মানুষ
নও—তোমরা দেবশিশু—ভগবানের সন্তান—লীলাচ্ছলে মর্ত্তে নরদেহ ধারণ
করিয়া আসিয়াছ মাত্র । তোমরা যে সচ্চিনানন্দ মহাসাগরের এক একটি
তরঙ্গস্বরূপ ।'

ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চণ্ডাল পুত্রকে বেশী করিয়া গুনাইতে হইবে, কেননা
সে জীবনে ইহা গুনিবার কখন সুযোগ পায় নাই । ব্রাহ্মণ সন্তানের
গুনিবার অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে । সত্যে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি
ছিলেন, আবার সকলকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে । নিজেরা ধায়ি হউন এবং
প্রত্যেককে ধায়ি হইবার জন্য উপদেশ ও সাহায্য করুন । নবযুগের স্বর্ণ
করোজ্জল শিক্ষালোক সারা বিশ্ব আলোকিত করিয়া ঐ যে প্রকাশমান হইয়া
পড়িয়াছে । শান্তি ও জয় উচ্চারণপূর্বক উহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া লউন ।

